IANABA TATTWA

OR

ATISE ON THE SOCIAL, MORAL & INTELLECTUAL POSITION OF MAN,

BY

I'ESHWAR PANDE.

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত।

২৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাঁড়ে ব্রাদাস আর্য্যপুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৫৪।২।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট আর্য্যযন্ত্রে,

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

আশ্বিন, ১ ৯৮ সাল।

১২৯৮

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার বিক্রয় নিতাই অল্প। সহস্র খণ্ডমাত্র পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল, অথচ ৮ বৎসর পরে পুনঃমুদ্রাঙ্কণ হইতেছে। সুতরাং ইহাতে অর্থলাভের আশা কিছুমাত্র নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও, যে অভিপ্রায়ে মানবতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলাম, সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়াই আমি যথেষ্ট সুখী হইয়াছি, শিক্ষিতগণের মতিগতি এক্ষণে অনেক ফিরিয়াছে, এমন কি মানবতত্ত্ব প্রকাশের পূর্ব্বসময়ের সহিত এ সময়ের তুলনায় এক্ষণে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলা যায়। আমার চেষ্টায় এ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই বটে, কিন্তু মানবতত্ত্ব প্রকাশিত হইবার পর হইতেই যে সকলের চিন্তা সেই দিকে ধাবিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং মানবতত্ত্ব আমার ও বঙ্গবাসীর বড় আদরের ধন। তাই এবারে ইহাকে উত্তমরূপ বাঁধাই করা হইল। অথচ মূল্য কিছুমাত্র বৃদ্ধি করা হইল না।

আমি বলিয়াছিলাম, অন্যান্য আলোচ্য বিষয় স্বতন্ত্র গ্রন্থে আলোচনা করিব তদনুসারে আমি তিনখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম ও জাহ্নবী নামক পত্রে সে সকলের আলোচনা করিতেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আর্থিক অবস্থা ভাল নহে, পোষ্যও অনেকগুলি, আবশ্যক ব্যয়ের সঙ্কুলান না হওয়ায় কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইতে হইল। সেই জন্য ও শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ আর সে চেষ্টা করিতে পারি নাই। পরিশেষে ধর্ম্মবিজ্ঞান নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কিয়ৎপরিমাণে প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, এই দ্বিতীয় সংস্করণে কতক-

গুলি প্রবন্ধ বাড়াইয়া দিব। কিন্তু কি দৈব বিড়ম্বনা! এই সংস্করণ আরম্ভ হইবার পর, প্রিয়তম শিশুসন্তানগণের একমাত্র আশ্রয়-আমার পত্নী অকালে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, এক্ষণে আমি শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার কষ্ট পাইতেছি শিশুসন্তানগণের জন্য অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়াছি। কো প্রকারে সংস্করণকার্য্য সম্পন্ন করিলাম। এ অবস্থাতেও অনে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

পত্নীর ইদানীন্তন মঙ্গলের জন্য মানবতত্ত্ব তাঁহার না উৎসর্গীকৃত হইল এবং ইহার বিক্রয়ফল--অর্থ মাতৃহীন শি সন্তানগণের জন্য স্থির করিলাম। পাঠকগণ এই শোকদুঃখ-সন্ত সময়ে লিখিত বিষয়ের দোষভাগ গ্রহণ না করিলে বাধিত হইব

কলিকাতা, ১৯এ আশ্বিন ১২৯৮। } শ্রীবীরেশ্বর শর্ম্মা।

মানবতত্ত্বসম্বন্ধে সম্পাদকগণের মত।

The best philosophical work published in Bengali Bireswara Pande's Ma.abatatiwa, in which abstruse meta cal questions concerning God and his existence, cre transmigration, the eternity of the universe, conscience, liberty and equality are discussed with great abilit dialectic skill, and with a zest, energy, and earnestness, show that the author really loves the class of subject with by him. His style of treatment is plain, direct and gorical. His language is simple, clear and incisive. I apparently a faculty for the study and discussion of phil cal questions. REPORT ON THE BENGAL LIBRARY FOR

It is seldom that we come across a work like this in Bengali iterature. The abstruse questions of creation, creative power, he soul element in man, nan's past and future states of existence of God, the criterion of human duty, liberty and equality &c., are discussed by the author with great power of thought, great ingenuity, and great boldness and enthusiasm. What is written on these subjects seems to embody the result of careful study and deep meditation. The style in which the essays are written, really challenges admiration. It is remarkably clear, pertinent and impressive, indicating clear thought and deep and earnest conviction. It is bold and vigorous, but beautifully plain and simple. The author appears to revel in the subjects which are dwelt upon in this work, and to enjoy keenly the indescribable luxury of discussing them. His work is really an admirable performance, an exceedingly valuable and interesting contribution to Bengali literature.

CALCUTTA REVIEW 5th October 1888.

The author has tried his best to render the subjects interesting by the feicitity of his style. The papers on social subject such as politeness, marriage &c, come home to the ordinary readers and these embody a great deal of suggestive remarks which the modern socialists would do well to ponder over. The views enunciated may not be readily accepted by all, but there can be no doubt, that the author has spent a good deal of thought upon the subjects and given them a presentable, albeit crude shape. INDIAN MIRROR, 21st. December 1883.

It shews nuch thought and original research.

HINDOO PATRIOT, November 36th 1883.

It is not a translation but au original work, and appears to contain the fruit of a thoughtful mind. The style is pungent and the reasoning accurate, but what is still more to be admired is the strait-forward manner with which the author has come forward to defend the customs and laws of our fore-

fathers from the attacks of our so called young reformers. We welcome the appearance of the work and we hope the public will come forward to patronize the author, who deserves encouragement and support at its hands.

AMRITA BAZAR PATRIKA, 6th December 1883.

We do not exaggerate, when we say that the book has been written with an accuteness of reasoning and pungency of style, very rare among modern authers. The author has started some very original and startling views, the ability with which they have been brought forth has excited our greatest admiration.

SAHAS, August, 20th 1883

এখনকার দিনে কোন আধ্যাত্মিক বা সামাজিক বিষয়ে কিছু লিখিতে গিয়া যিনি মিল স্পেন্সরের মাথামুণ্ডের চর্ব্বিত চর্ব্বণ না করেন, তিনি একজন অপূর্ব্ব গ্রন্থকার। মানবতত্ত্বপ্রণেতাও অপূর্ব্ব গ্রন্থকার; তাঁহার গ্রন্থও অপূর্ব্ব। ইহার সর্ব্বত্রই স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মানবের সহিত ঈশ্বরের এবং বাহ্য জগতের সম্বন্ধ জানিলে, মানবের কর্ত্তব্য কতদূর বুঝিতে পারা যায়, ধর্ম্ম কাহাকে বলে, শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত—মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি, ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ে বীরেশ্বর বাবু সত্য সত্যই চিন্তা করিয়াছেন, এবং সেই চিন্তার ফল—মানবতত্ত্বে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই পাশ্চাত্য সভ্যতার ছায়ায় প্রায় অন্ধীভূত দেশে এইরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার হওয়া আমাদের একান্ত অভিলষণীয়।

সাধারণী।

বীরেশ্বর বাবু যদি এই গ্রন্থখানা বাঙ্গালাতে না লিখিয়া ইংরাজিতে লিখিতেন ও বিলাতের কোন খ্যাতনামা যন্ত্রে ছাপাইতেন, তাহা হইলে তিনি য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইতেন। আমরা উপন্যাসের ন্যায় আগ্রহ সহকারে মানবতত্ত্ব

পাঠ করিয়াছি। তাঁহার ক্ষমতাকে অন্তরের সহিত প্রশংসা করি। যুক্তির দৃঢ়বন্ধন, ভাষার সরলতা ও চিন্তার গভীরতার জন্য মানব-তত্ত্ব বঙ্গসাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিবে। চারুবার্ত্তা।

বাঙ্গালাসাহিত্যে মানবতত্ত্বের ন্যায় গ্রন্থপাঠ সকল সময়ে হইয়া উঠে না। বীরেশ্বর বাবু বিলক্ষণ নিপুণতা দেখাইয়াছেন। হিন্দুজাতীয় বলিয়া যাঁহারা আপনাদিগের পরিচয় দেওয়া গৌর-বের বিষয় বিবেচনা করেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে আমরা মানবতত্ত্ব পাঠ করিতে অনুরোধ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। নববিভাকর। ২৭শে কার্ত্তিক ১২৯০।

মানবতত্ত্ব পাঠ করিলে পাঠকেরা কেবল যে অধিকাংশ বিষয়ের সংসিদ্ধান্ত জানিতে পারিবেন তাহা নয়। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শিক্ষা করিতে পারিবেন। রচনার বিলক্ষণ উর্জ্জস্বলতা ও প্রাঞ্জলতা আছে। সোমপ্রকাশ। ১৯শে আষাঢ়।

প্রয়োজনীয় বিষয় সকলে পরিপূর্ণ। পুস্তকখানি কাজেরই বটে। ঢাকাপ্রকাশ।

তাঁহার স্বাধীন মন ও অপ্রতিরুদ্ধ চিন্তার পরিচয় পাইয়া প্রত্যেক পাঠক পুলকিত হইবেন। ইহা সকলেরই পাঠ করা বিধেয়। আর্য্যদর্শন।

সকল দিক দেখা, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, নিজের মনের কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে পারা, এই সকল উচ্চগুণের অনেকানেক চিহ্ন ইঁহার পূর্ব্বপ্রণীত গ্রন্থ গুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই মানবতত্ত্বে ঐ সকল গুণ অতি সুন্দররূপেই বিক-শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে অনেক গুলি অতি গুরুতর বিষয়ের সমালোচনা হইয়াছে। সকল প্রবন্ধগুলি অতি সরল রীতিক্রমে

এবং স্বাধীনভাবে লিখিত। গ্রন্থখানিতে ভাক্তপাণ্ডিত্যের এবং ভাক্তভাবুকতার লেশমাত্র নাই। মানবতত্ত্বপ্রণয়নের উদ্দেশ্য অতি অপূর্ব্ব। এডুকেশন গেজেট।

গ্রন্থকার প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়েই নিজের সম্পূর্ণ স্বাধীন-চিন্তা ও প্রগাঢ় গবেষণার স্রোত ঢালিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা ইউরোপীয় সভ্যতার বিশেষ পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে বীরেশ্বর বাবুর এ গ্রন্থের উপসংহারভাগটী বিশেষ করিয়া মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি। এই অংশে গ্রন্থকার ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার সহিত আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার তুলনা করিয়া পরস্পরের দোষগুণ বিশেষ দক্ষতার সহিত ব্যব-[illegible] করিয়া পাঠকের সম্মুখে দেদীপ্যরূপে ধরিয়া দিয়াছেন। বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী।

প্রত্যেক মনুষ্যের অ[illegible] [illegible] প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। বীরেশ্বর বাবু একজন চিন্তাশীল ও সুলেখক, মানবতত্ত্ব তাহার উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত। মানবতত্ত্ব বাঙ্গালা ভাষার অনেক অভাব পূরণ করিয়াছে। রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ।

আমরা আশা করি পাঠকগণ মানবতত্ত্ব যত্নসহকারে পাঠ করিয়া লেখকের শ্রম, চিন্তাশীলতা, লিপিকুশলতার যথোচিত সম্মাননা করিবেন। সারস্বত পত্র, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯০।

আমরা এই সুন্দর চিন্তাপূর্ণ পুস্তকখানি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। ভারতমিহির ১৬ই শ্রাবণ ১২৯০।

স্থানাভাবে সকল দেওয়া হইল না।

মানব-তত্ত্ব।

উপক্রমণিকা।

মানব বলিলে আমরা দুই হস্ত দুই পদবিশিষ্ট জীবমাত্রকেই বুঝি। সুতরাং বৃহৎ অট্টালিকাবাসী উজ্জ্বল হীরকমণ্ডিত বেশধারী মহাপরাক্রান্ত সম্রাটও মানব, জীর্ণকুটীরবাসী শতগ্রন্থিযুক্ত বসন-ধারী অনাহারশীর্ণ দরিদ্রও মানব; প্রখর-বুদ্ধিসম্পন্ন চাণক্য রিসিলু প্রভৃতিও মানব, গণ্ডমূর্খ গদাধরচন্দ্র, বিদ্যাদিগ্গজ প্রভৃতিও মানব; মহাবীর ভীম, অর্জ্জুন, সেকন্দর, বোনাপার্টী প্রভৃতিও মানব, দাসত্বব্যবসায়ী মসিজীবী আধুনিক বঙ্গবাসীরাও মানব; কালিদাস, ভারবি, আর্য্যভট্ট, সেক্ষপিয়র, নিউটন প্রভৃতি মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গও মানব এবং অনক্ষর ও কুসংস্কার-সম্পন্ন ভুলু, কালুও মানব; সুসভ্য বুদ্ধিমান্ সুরূপ আর্য্য, ফরাসী, ইংলণ্ডীয়গণও মানব, নিতান্ত অসভ্য কদাকার কাফ্রি, নাগা, ভীল প্রভৃতিও মানব; জঘন্য দুর্গন্ধ ওকার-জনক-কার্য্য-ব্যবসায়ী হাড়ি, মেথর, মুদ্দফরাশ প্রভৃতিরাও মানব, অতি পরিপাটী রূপে পরিচ্ছন্ন সুগন্ধলেপী বাবুরাও মানব। এই প্রকারে দেখা যায়, যে, মানব-নামধারী জীবের মধ্যে পরস্পরের এত প্রভেদ যে, একের সম্বন্ধে অপরকে মানব বলিয়াই বোধ হয় না। প্রথমোক্তকে মানব বলিলে শেষোক্তকে পশু এবং শেষোক্তকে মানব বলিলে প্রথমোক্তকে দেবতা বলিতে হয়। অধিক কি, প্রভেদের পরি-মাণ এত অধিক যে, এক জন মানব অপর মানবের ছায়া স্পর্শ

করিবারও যোগ্য হয়। বিষ্ঠা-পূতি-গন্ধবিশিষ্ট শূকর-জনক চীর-বসনধারী অনক্ষর মেথর কি কখনও হীরকখচিত বেশধারী সুগন্ধ-দ্রব্য-চর্চ্চিত অপরিমিত বলশালী মহাপ্রাজ্ঞ নরপতির নিকট দণ্ডায়মান হইতে পারে? না সে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবার সাহস করিতে পারে? নরপতি কি মেথরকে আপনার সজাতি মনে করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন? না মেথর ঐ রাজচক্রবর্ত্তীকে আপনার ন্যায় একজন মানব মনে করিয়া তাঁহার সহিত প্রেমালাপ করিবার আশা করিতে পারে? তাহা দূরে থাকুক বরং তদ্বিপরীতে রাজা মেথরকে আপনার নিতান্ত পোষ্য ও প্রয়োজন-সৃষ্ট হস্ত্যশ্বাদির ন্যায় বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব বিবেচনা করেন এবং মেথরও রাজাকে আপনাদের প্রতি-পালন-জন্য-সৃষ্ট পরম উপাস্য দেবতা জ্ঞান করিয়া ভক্তি ও ভয়-চকিত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞার অপেক্ষা করে। অতএব আমরা কাহাকে মানব বলিব? রাজা ও মেথর উভয়কেই মানব বলিব অথবা উভয়ের একজনকে মানব বলিয়া অপরকে অন্য আখ্যা দিব? মানবের লক্ষণ কি এবং উদ্দেশ্যই বা কি? যদি দুই হস্ত দুই পদবিশিষ্ট গতিশক্তিসম্পন্ন পদার্থ মাত্রই মানবপদবাচ্য হয়, তবে অবশ্যই রাজা ও মেথর উভয়ই মানব। কিন্তু তবে তাহাদের মধ্যে এত প্রভেদ কেন? সুবর্ণ পিত্তলে প্রভেদ কেন? রাজা প্রজায় প্রভেদ কেন? পণ্ডিতে মূর্খে প্রভেদ কেন? দুর্ব্বলে বীরে প্রভেদ কেন? সুরূপে কুৎসিতে প্রভেদ কেন? আকাশ পাতালে ভেদ কেন? নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানবের সহিত পশুর এবং উচ্চশ্রেণীর মানবের সহিত দেবতার সাদৃশ্য উপলব্ধি হয় কেন? যদি মানব মাত্রই এক পদার্থ এবং তাহাদের একই উদ্দেশ্য ও

পরিণাম হয় তবে তাহাদের মধ্যে এত প্রভেদ কেন? যদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মনুষ্যের উদ্দেশ্য ও পরিণাম ভিন্ন হয়, তবে তাহাদিগকে কি প্রকারে এক পদার্থ বলা যায় এবং তাহাদের অধিকারই বা কি প্রকারে একরূপ হইতে পারে? সুরম্যহর্ম্ম্যনিবাসী রাজচক্রবর্ত্তীর সহিত জীর্ণকুটীরবাসীর, অশেষশাস্ত্রজ্ঞ দূরদর্শী পণ্ডিতের সহিত অনক্ষর ও নিতান্ত মূর্খের এবং সভ্যতা-চাক্‌চিক্যশালী সুন্দর মানবের সহিত নিতান্ত কদাকার অসভ্যের যদি একই উদ্দেশ্য ও একই পরিণাম হয়, তবে তাহাদের মধ্যে এত প্রভেদ কেন এবং সেই প্রভেদজনিত মানাপমানেরই বা বিচার কেন? ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ অশেষ জ্ঞানসাগর মন্থন করিয়া যে উদ্দেশ্য সম্পাদন ও পরিণামে যে গতি লাভ করেন, নিতান্ত অনক্ষর মদ্যপায়ী, বেশ্যারত মনুষ্যেরাও কি সেই উদ্দেশ্য সম্পাদন ও সেই গতিলাভ করিবেন! বুদ্ধ, ঈশা, মুসা, চৈতন্য প্রভৃতি স্বার্থত্যাগী পরহিতৈকব্রতী মহাপুরুষগণ যে কার্য্য সম্পাদন ও পরিণাম লাভ করেন, আত্মোদরপূরণরত নরপীড়কগণও কি সেই কার্য্য সম্পাদন ও সেই পরিণাম লাভ করিবেন? পরম দয়াবান পুরুষ পরোপকার করিয়া যে বিশ্বকার্য্য সাধন করেন, পরস্বাপহারী স্বার্থপর নরগণ পরস্বাপহরণ করিয়া কি সেই কার্য্য অনুষ্ঠান করেন? কৃষক শস্য বপন ও শিল্পী শিল্পকার্য্য করিয়া বিশ্বের যে উদ্দেশ্য সম্পাদন করেন, বাবুরা কেবল মাত্র সেই সকল উপভোগ করিয়া সেই উদ্দেশ্য সম্পাদন করিবেন? তাহা যদি হয় তবে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের প্রভেদ কি থাকিল? তাহা না হইয়া যদি ব্যক্তি বিশেষের উদ্দেশ্য ও পরিণাম ভিন্ন হয়, তবে মানব মাত্রই এক পদার্থ কিরূপে বলা যায়?

এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব সকলেরই জানিতে ইচ্ছা হয়। এ পর্য্যন্ত এই সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে কত তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু তাহার সর্ব্ববাদী সম্মত ফল কিছুই হয় নাই; কখনও যে হইবে তাহারও স্থিরতা নাই। তবে অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, মানব ঈশ্বরের ইচ্ছাকৃত সৃষ্ট বস্তু; ঈশ্বর-সেবাই মানবের কার্য্য; স্বর্গ, ঈশ্বর-সাযুজ্য-সারূপ্য বা মোক্ষলাভই মানবের মুখ্য উদ্দেশ্য; ইহকাল মানবের কার্য্য-কাল, পরকালের সুখের উদ্দেশেই কার্য্য করা কর্ত্তব্য; মানব মাত্রেই কার্য্য করিতে সমাধিকারী; তবে যে অবস্থার এরূপ প্রভেদ হয়, সে কেবল পূর্ব্ব বা ইহ জন্মের কার্য্য-ফলে। কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বর সকল মনুষ্যকে সমান করিয়াছেন ও তাহা-দিগকে স্বাধীনতা দিয়াছেন। মানব ইচ্ছা করিয়া সেই স্বাধীন-তার অপব্যবহার করাতেই পরস্পর এত ভিন্ন ও দুঃখী হইয়াছে। সুতরাং মানব সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে, অগ্রে ঈশ্বর, সৃষ্টি, পরকাল ও পূর্ব্বজন্মাদির বিষয় জানা আবশ্যক। ক্রমে সে সকল বিষয় বিবেচনা করা যাইতেছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাদের আর একটী বিষয় দেখা আবশ্যক। বিশ্ব কেবল মনুষ্য লইয়া নহে। মানব ভিন্ন এই বিশ্বে এত পদার্থ আছে যে, মানব না থাকিলেও বিশ্বের কিঞ্চিন্মাত্র পরিমাণের ন্যূনতা হইত না। অতএব সে সকল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

যাহা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়, আমরা তাহারই সত্তা অনুভব করি। তাহার কতকগুলিকে পদার্থ ও কতকগুলিকে পদার্থের শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করি। আমরা বলিয়া থাকি, যাহার সত্তা আছে, তাহা কোন না কোন প্রয়োজনোদ্দেশে সৃষ্ট হইয়াছে।

বিনা প্রয়োজনে কিছুই সৃষ্ট হয় নাই। সেই জন্ম যাহার প্রয়োজন আমাদের বুদ্ধিতে অনুভূত হয় না, তাহারও কোন প্রকারে প্রয়োজন কল্পনা করিয়া লই। অধিক কি ব্যাঘ্র, সর্প, রোগ, মৃত্যু প্রভৃতি যে সকল হইতে স্পষ্ট অপকার হয় দেখা যাইতেছে, সে সকল হইতেও কোন না কোন উপকার হয় কল্পনা করিয়া থাকি। কিন্তু কেন এরূপ কল্পনা করি, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় ঈশ্বর যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা যে অপ্রয়োজনীয় এরূপ সম্ভাবনা করা আমাদিগের নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই এইরূপ বলিয়া থাকি। ঈশ্বরকৃত পদার্থ যে বিনা উদ্দেশে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা আমাদিগের বলিতে সাহস হয় না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কাহার প্রয়োজন সাধনের জন্ম সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে? এখানে মানব বক্তা, সুতরাং মানব বলিবেন মানবের উপকারের জন্ম সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, জল, বায়ু, সর্প, ব্যাঘ্র, রোগ, মৃত্যু সমুদায়ই মানবের উপকারের জন্ম সৃষ্ট হইয়াছে। যদি বানরের হস্তে কলম থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় তাহারাও বলিত যে, মানবের সহিত সমুদায় বিশ্ব বানরের কল্যাণের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। আচ্ছা মানব! তোমারই কথায় স্বীকার করা গেল যে, তোমারই জন্ম সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে বল দেখি, তুমি কাহার উপকারের জন্ম সৃষ্ট হইয়াছ? যখন তুমি বলিতেছ, বিনা প্রয়োজনে কিছুই সৃষ্ট হয় নাই, তখন তোমারও সৃষ্টি বিনা প্রয়োজনে হয় নাই বলিতে হইবে। অপরাপর পদার্থ তোমারই প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে সৃষ্ট হইয়াছে বলিতেছ, কিন্তু তোমার সৃষ্টির প্রয়োজন কি? যদি বল, মানবগণ পরস্পর স্বজাতির

উপকারে জন্য প্রয়োজন, তাহা হইলে প্রকৃত উত্তর হইল না। মানবজাতি দ্বারা বিশ্বের বা অপর কাহারও কি প্রয়োজন সাধিত হয়, তাহা তুমি বলিলে না। তুমিই কি এই বিশ্বের সর্ব্বস্ব? তুমি কি স্বয়ম্ভূ? তুমি কি স্বাধীন? যখন তোমার জন্ম মৃত্যু তোমার ইচ্ছাধীন নহে, অপরাপর পদার্থের ন্যায় তোমারও যখন জন্ম মৃত্যু আছে, তখন তুমি কি বলিয়া বিশ্বের অপরাপর পদার্থ হইতে ভিন্ন স্বত্ব আকাঙ্ক্ষা কর? যদি অপরাপর পদার্থের সৃষ্টি প্রয়োজন-জন্য হইয়া থাকে, তবে তোমারও সৃষ্টি প্রয়োজন-জন্য হইয়াছে বলিতে হইবে। যদি তুমি বিনা-প্রয়োজন-সৃষ্ট বা অকারণসম্ভূত হও, তবে অন্য পদার্থ সকলকেও সেইরূপ অকারণসম্ভূত বলিবে না কেন? যদি বল ঈশ্বরের প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে মানবের সৃষ্টি হইয়াছে; তাহা হইতে পারে না, কেননা ঈশ্বরের আবার প্রয়োজন কি? যদি থাকে, তবে অপর পদার্থ সকলও তাঁহার প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে সৃষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। তোমার উপকারের জন্য সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে একথা বলিবার তোমার অধিকার কি? তুমি এইমাত্র বলিতে পার যে, তোমার শক্তি পৃথিবীস্থ অপরাপর পদার্থ হইতে অধিক; সেই বলেই তোমরা পৃথিবীর সকল পদার্থের উপর রাজত্ব করিতেছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ঐ শক্তি কি তোমার স্বোপার্জ্জিত? তাহা যদি না হয়, তবে তোমাদিগকে বিশ্বের অপরাপর পদার্থ হইতে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলা যায় কি প্রকারে? যাহা হউক, মানব কি, তাহার কার্য্য কি, উদ্দেশ্য কি ও পরিণাম কি তাহা জানিতে হইলে মানবের আদি দেখা আবশ্যক। সুতরাং বিশ্বের আদি দেখা আবশ্যক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—✻✻○✻✻—

বিশ্ব।

বিশ্বের আদি দেখিব, কিন্তু আমাদের তাহা দেখিবার ক্ষমতা আছে কি না? আমরা কখনও কি কোন পদার্থের আদি দেখিয়াছি? যদি না দেখিয়া থাকি, তবে বিশ্বের আদি দেখিতে আমাদিগের ইচ্ছা হয় কেন? মানব মাত্রেরই স্বভাব এই যে, তাহারা পদার্থ মাত্রেরই উৎপত্তি ও কারণ অন্বেষণ করে। ইহার কারণ কি? মানবের সম্মুখে যাহা কিছু ঘটে, তাহারই পূর্ব্বে তাহার একটী পূর্ব্বাবস্থা দেখিতে পায়, তাহাকেই তাহারা শেষোক্ত ঘটনার কারণ বলিয়া থাকে। ঘটনা বিশেষের পূর্ব্বে ঘটনা বিশেষ নাই, এরূপ অবস্থা মানব কখনই দেখিতে পায় না; সুতরাং মানবের দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, ঘটনা মাত্রেরই পূর্ব্বে ঘটনাবিশেষ বা কারণ আছে। এই সংস্কার বা জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা পদার্থ মাত্রেরই কারণ অন্বেষণ করে। কিন্তু আদি কাহাকে বলে? প্রথম অবস্থা অর্থাৎ যাহার পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, তাহাকেই ত আদি বলিতে হইবে? আমরা কি সেরূপ অবস্থাপন্ন কোন পদার্থ দেখিয়াছি? কোন পদার্থের আদি কারণ বা প্রথম অবস্থা কি আমরা কখনও দেখিয়াছি? যে সকল কারণ আমরা দেখিয়া থাকি সে সকল কি আদি কারণ? তোমার ভূমিষ্ঠ হওন কালীন অবস্থাকে কি তোমার আদি বলিবে? কখনই না। কেননা তৎপূর্ব্বে তুমি মাতৃগর্ভে ছিলে, তাহার পূর্ব্বে তোমার পিতা মাতার শোণিতে ছিলে, তাহার পূর্ব্বে গবাদি জীবদেহে ও

ধান্যাদিতে বর্ত্তমান ছিলে এবং তাহারও পূর্ব্বে মৃত্তিকা, জল বায়ু প্রভৃতিতে অধিষ্ঠিত ছিলে। এইরূপ যত অন্বেষণ করিবে, ততই তোমার অগ্রিম অবস্থা অসংখ্য প্রকার হইয়া পড়িবে; কোনমতে তোমার আদিম অবস্থার অনুসন্ধান পাইবে না। অতএব যাহাকে তোমার উৎপত্তি বলিলে, তাহা তোমার উৎপত্তি নহে, অবস্থান্তর মাত্র। পূর্ব্বে তোমার নরদেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু যে সকল পদার্থ হইতে তোমার দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই বর্ত্তমান ছিল। তুমি মেঘকে বৃষ্টির কারণ বল, কিন্তু মেঘ বাষ্প হইতে জন্মে; বাষ্প আবার জল হইতে উৎপন্ন হয়। যে জল ছিল, তাহাই হইল। যে সকল পদার্থ লইয়া তোমার দেহ গঠিত, তোমার মৃত্যু হইলে আবার তাহাই হইবে। তাই শাস্ত্রকারেরা "পঞ্চে পঞ্চ মিশে" কহেন। তুমি বীজকে বৃক্ষের কারণ বল, কিন্তু বৃক্ষই আবার বীজের কারণ। অতএব তুমি বীজ ও বৃক্ষ ইহার মধ্যে কাহাকে আদিম কারণ বলিবে? এই প্রকারে দেখিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, কোন পদার্থেরই আদি পাওয়া যায় না। যাহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ তোমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতেছে, সে উৎপত্তি বা বিনাশ নহে, অবস্থান্তর মাত্র। যেমন মৃত্তিকা ঘট হইতেছে, স্বর্ণ অলঙ্কার হইতেছে, তুলা বসন হইতেছে, সেইরূপ ভৌতিক পদার্থ মানব হইতেছে, বাষ্প বৃষ্টি হইতেছে। যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ই এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। যখন কোন পদার্থ এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই আমরা তাহার উৎপত্তি বলিয়া থাকি। সে পদার্থের সে অবস্থার সেই আদি বটে, কিন্তু তাহাকে প্রকৃত আদি বলা যায় না। যখন কিছুই

ছিল না, তখন যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই আদিম অবস্থা বলে। কিন্তু কিছুই ছিল না, অথচ কিছু হইয়াছে এরূপ আমরা কখন দেখি নাই; সুতরাং সেরূপ কল্পনা করাও আমাদিগের অসাধ্য। মনুষ্য যাহা কখনও দেখে নাই, তাহার কল্পনা করিতেও অক্ষম। দেখিয়া শুনিয়াই মানবের জ্ঞান। আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, কোটি শূন্য একত্রিত করিলেও এক হয় না এবং এককে সহস্র কোটি অংশে বিভক্ত করিলেও শূন্য হয় না। কিছু না, কখনও কিছু হয় না এবং কিছু কখনও কিছুনা হয় না (নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ)। সুতরাং পূর্ব্বে কখনও কিছু ছিল না অথচ বিশ্ব হইয়াছে এবং এক্ষণে বিশ্ব আছে, পরে কিছুই থাকিবে না, একথা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ ও মানব-বুদ্ধির অতীত। বোধ হয় এই কথার সমন্বয় করিতে আর্য্য পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, পরমাণুর ধ্বংস নাই, পরমাণু পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল, পরেও সেই রূপ থাকিবে। তাঁহারা কহেন, সেই পরমাণুপুঞ্জ হইতে বিশ্বের উৎপত্তি এবং যখন বিশ্ব ধ্বংস হইবে, তখন সেই পরমাণুপুঞ্জ রহিয়া যাইবে।

কেহ কেহ বলেন যে, কিছুনা হইতে কিছু হয় না বটে এবং কিছু কখনও কিছুনা হয় না বটে, কিন্তু যখন কিছু (বিশ্ব) ছিল না, তখন ঈশ্বর ছিলেন, এবং যখন কিছু (বিশ্ব) থাকিবে না, তখন ঈশ্বর থাকিবেন; সেই ঈশ্বর হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, যেরূপে বাষ্প হইতে জলের উৎপত্তি এবং বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি, ঈশ্বর হইতে বিশ্বের উৎপত্তি কি সেই রূপ? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে বিশ্বের পূর্ব্বাবস্থা বলিতে হইবে, সুতরাং ঈশ্বরেরও কারণ বা পূর্ব্বাবস্থা থাকা

আবশ্যক। কিন্তু তাঁহারা সেরূপ বলেন না। তাঁহারা ঈশ্বরকে বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলেন। ঘট সম্বন্ধে কুম্ভকার যেমন এবং অলঙ্কার সম্বন্ধে স্বর্ণকার যেমন, তাঁহারা ঈশ্বরকে বিশ্ব সম্বন্ধে তাহা হইতে অনেক উচ্চ বলেন। তাঁহারা বলেন পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, একমাত্র অনাদি অনন্ত ঈশ্বর ছিলেন; তাঁহার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইল, এবং সেই ইচ্ছা হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি। কিন্তু এ কথা কতদূর বিশ্বাস্য? অনাদি ব্যক্তির কার্য্য সাদি হওয়া কতদূর সঙ্গত? তুমি বিশ্বের সৃষ্টিকাল যতই অধিক বল না কেন, অনাদি কালের সহিত তুলনায় তাহা নিতান্ত অল্প। এই অনন্তকাল ঈশ্বর কার্য্যশূন্য হইয়া বসিয়াছিলেন, সেদিন অর্থাৎ কোনও একদিন কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন, একথা নিতান্ত অসঙ্গত। ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন, ইচ্ছাই ঈশ্বরের সৃষ্টির কারণ; যতদিন ঈশ্বরের সে ইচ্ছা হয় নাই, ততদিন সৃষ্টি হয় নাই, যখন ইচ্ছা হইল, তখনই সৃষ্টি হইল। কিন্তু তাহাও সঙ্গত উত্তর নয়। কারণ, জিজ্ঞাস্য এই যে, কি জন্য এতকাল ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় নাই এবং হঠাৎ একদিনেই বা সে ইচ্ছা হইল কেন? তাঁহারা যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া এই কূট তর্কের অবতারণা করেন, একথা সে যুক্তিরও বিরুদ্ধ। কেননা তাঁহাদের মূল যুক্তি এই যে, কারণ ভিন্ন কিছুই হয় না। সুতরাং বিশ্বের অবশ্যই কারণ আছে এবং সেই কারণই ঈশ্বরের ইচ্ছা। কিন্তু যখন তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেছেন, কারণ ভিন্ন কিছুই হয় না, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছার কি কারণ নির্দ্দেশ করেন? যখন বলিতেছেন, ঈশ্বর চিরকালই আছেন, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, তখন হঠাৎ কোনও এক সময় তাঁহার ইচ্ছা জন্মিল কেন?

এই ইচ্ছা জন্মিবার কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে তাঁহাদের যুক্তির মূলে কুঠারাঘাত হইল।

মানবের জ্ঞান চূড়ান্ত নহে; তাঁহারা দেখিয়াছে কার্য্য মাত্রেরই পূর্ব্বে কার্য্যবিশেষ বিদ্যমান থাকে, তদ্দর্শনে জ্ঞান জন্মিয়াছে যে, কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না। কিন্তু যখন তাহারা ঐ সূত্র খাটাইয়া কারণপরম্পরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, তখন দেখিল, সেরূপে চলিতে গেলে অনবস্থা দোষ ঘটে; তাহাতেই তাহারা শেষে অনাদিকারণস্বরূপে ঈশ্বরে অর্পণ করিল; অর্থাৎ জ্ঞান অচল হইলে ক্ষান্ত হইল। কিন্তু যদি তাঁহারা ঈশ্বরের ন্যায় বিশ্বকেও অনাদি-অনন্ত বলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যুক্তিও দুর্ব্বলা হয় না এবং সকল দিক্ রক্ষা হয়, কল্পনার সাহায্য লইতে হয় না। বাস্তবিক যখন আমরা কোনও পদার্থেরই আদি পাই না, তখন বিশ্বকে অনাদি বলিব না কেন? এ স্থলে আর একটী বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বিশ্বের অনাদিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিবে না। দেখা আবশ্যক, এই বিশ্ব ব্যাপারের যাহা কিছু আমরা অনুভব করি, সে সকল সসীম কি অসীম। যদি তৎসমস্ত সসীম হয়, তবে অসীম জ্ঞান আমাদের অস্বাভাবিক; আর যদি সে সমস্ত অসীম হয়, তবে সসীম জ্ঞান আমাদের অস্বাভাবিক। এক্ষণে দেখা যাউক আমরা কিরূপ অনুভব করি।

আমরা মোটামুটী এ বিশ্ব সম্বন্ধে কি অনুভব করি?— আধার, আধেয়, কার্য্য ও কাল। বোধ হয় এই চারিটী ভিন্ন বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের আর কিছুই জ্ঞান নাই। যাহাতে কিছু থাকে, তাহাকে আধার; যাহা থাকে, তাহাকে আধেয়; আধেয়ের

শক্তি বা গুণ প্রকাশকে কার্য্য এবং কার্য্যের ব্যাপ্তিকে কাল বলে। দুগ্ধের আধার ভাণ্ড, ভাণ্ডের আধার পৃথিবী, পৃথিবীর আধার কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, যাহাকে আমরা শূন্য বা আকাশ বলি, তাহাই পৃথিবীর আধার। আকাশ সমুদায় জগতের আধার। সুতরাং আধেয় বলিতে পদার্থ মাত্রকেই বুঝাইতেছে। জগৎ সমূহের আধার শূন্যকে আমরা 'কিছুই না' বলিয়া থাকি। কিন্তু উহা যে নিশ্চয়ই কিছু না, তাহার নিশ্চয় কি? এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আধার যে কিছুই না, তাহা কিরূপে বলা যায়? ইহাই বলা উচিত যে, উহা আমাদিগের অতীন্দ্রিয় পদার্থে নির্ম্মিত। কেননা, আকাশ ও জগৎ সমুদয় লইয়াই বিশ্ব, অথবা আধার ও আধেয় লইয়াই বিশ্ব। যদি বাস্তবিক আকাশ কিছুনা হয়, তাহা হইলে এই বিশ্বকে একটী বলিয়া পরিগণিত করা যায় না। কারণ প্রত্যেক গ্রহ বা উপগ্রহের পরে আকাশ রহিয়াছে। যে সকল পদার্থ পরস্পর কোন পদার্থ দ্বারা মিলিত নহে, তাহারা কখনও একটী বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। আকাশ যদি কিছু না হয়, তবে গ্রহ উপগ্রহাদি সকল কোনও পদার্থ দ্বারা পরস্পর মিলিত নয়; সুতরাং বিশ্বেরও একত্ব হইতে পারে না। এই জন্য আর্য্য পণ্ডিতেরা আকাশকে ভৌতিক পদার্থ বলিয়াছেন এবং পৃথিবীর উর্দ্ধতন বায়ুকে আবহ, প্রবহ, সংবহ প্রভৃতি সপ্ত নাম প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরাও ইথার নামক বায়ু স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু যাহাই হউক, বিশ্বের অংশভূত আকাশ যে অসীম, তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। মানব! তুমি কি কখনও আধেয়হীন আধার দেখিয়াছ?

অবশ্য বলিবে, না। তবে তুমি আকাশকে আধেয়শূন্য বলিবে কি প্রকারে? যখন জগৎ সকলের আধার আকাশ অসীম, তখন উহার আধেয় বিশ্বও অসীম হইবে; সুতরাং বিশ্বের সীমা নাই— পরিমাণ বিষয়ে বিশ্ব অসীম। জ্যোঃতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা কিয়ৎ পরিমাণে ইহা স্বীকারও করিয়াছেন। কেন না তাঁহারা বলেন, কোনও নক্ষত্র এত দূরে অবস্থিত যে, তাহার আলোক অদ্যাপি পৃথিবীতে আইসে নাই, অথচ আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৯৬০০০ ক্রোশ।

পদার্থের শক্তি প্রকাশের নাম কার্য্য। চুম্বক লৌহ আকর্ষণ করিতেছে অর্থাৎ লৌহ-আকর্ষণী শক্তি প্রকাশ করিতেছে, মনুষ্য গমন করিতেছে অর্থাৎ গতিশক্তি প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু কার্য্যের ব্যাপ্তির নাম কাল। উহাকে কার্য্যের আধারও বলা যাইতে পারে। যেমন যতখানি আকাশ অবলম্বন করিয়া কোন পদার্থ বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহাকে তাহার পরিমাণ কহে, সেইরূপ যতখানি কাল অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্য অর্থাৎ কোন পদার্থের শক্তি প্রকাশ হইতেছে, তাহাকে তাহার স্থিতি কহে। কাল যে অনাদি অনন্ত সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। কাল অনন্ত হইলে উহার আধেয় কার্য্য কেননা অনন্ত হইবে? সুতরাং কার্য্যের আধার পদার্থও অনাদি অনন্ত। অর্থাৎ বিশ্ব স্থিতি বিষয়ে অসীম। সুতরাং বিশ্ব সম্বন্ধে আমরা যাহা অনুভব করি, তৎসমস্তই অসীম। অতএব বিশ্বের অনাদিত্ব জ্ঞানই আমাদের স্বাভাবিক। আমরা যে পদার্থ সকলের সসীম আকৃতি এবং উৎপত্তি ও ধ্বংস দেখিতেছি, বাস্তবিক তাহা প্রকৃত সীমা বা প্রকৃত উৎপত্তি ও ধ্বংস নহে। জল ও বাষ্পের

বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই একথা স্পষ্টীভূত হইবে। অতএব বিশ্ব কখনও সৃষ্ট হয় নাই, কখনও নষ্ট হইবে না। উহা চিরকাল আছে, চিরকালই থাকিবে। উহার আদি নাই অন্ত নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সৃষ্টি।

বিশ্ব যদি অনাদি অনন্ত হইল, তবে কি জগতের উৎপত্তি ও ধ্বংস নাই? উন্নতিও অবনতি নাই? চিরকালই কি বিশ্ব সমান অবস্থায় রহিয়াছে? এক্ষণে বিশ্বের যে অবস্থা, পূর্ব্বে চিরকালই কি এইরূপ অবস্থা ছিল এবং ভবিষ্যতে অনন্ত কাল এইরূপ অবস্থা থাকিবে? এক্ষণে যে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহারা কি পূর্ব্বে চিরকালই এইরূপ ছিল এবং ভবিষ্যতে চিরকালই এইরূপ থাকিবে? না, তাহা কখনই নহে। কেন না আমরা দেখিতে পাইতেছি, জগতের কোনও পদার্থ চিরকাল এক অবস্থায় থাকে না। দেখিতেছি, সমভূমি পর্ব্বত ও পর্ব্বত সমভূমি হইতেছে; অরণ্য মরুভূমি ও মরুভূমি অরণ্য হইতেছে; জল স্থল ও স্থল জল হইতেছে; পূর্ব্বে যে খানে প্রকাণ্ড নগরী ছিল, এক্ষণে তাহা জন-সমাগম-শূন্য মরুভূমি; পূর্ব্বে যে স্থানে মনুষ্য গমন করিতেও পারে নাই, এক্ষণে তাহা মহা-সমৃদ্ধি-শালী

নগর; যে আর্য্যজাতি পূর্ব্বকালে পৃথিবীর সর্ব্বোন্নত সুসভ্য ছিল, এক্ষণে তাহারা নিতান্ত হীনদশাপন্ন; যে ইংরেজেরা কিছু দিন পূর্ব্বে আম-মাংস-ভোজী ও নিতান্ত অসভ্য ছিল, এক্ষণে তাহারা মহাপরাক্রান্ত ও সুসভ্য হইয়াছে। পৃথিবীর সকল বস্তুরই নিয়ত এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। অধিক কি, একশত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল মানব এই পৃথিবীতে ছিল, তাহার এক-জনও এক্ষণে বর্ত্তমান নাই, এবং এক্ষণে যে শতাধিক কোটী মানব বর্ত্তমান রহিয়াছে, শতবর্ষ পরে তাহার একজনও থাকিবে না। যেমন সমুদায় মনুষ্যের মৃত্যু হইতেছে, অথচ মানবের লোপ হইতেছে না, সেইরূপ বিশ্বের সমুদায় পদার্থেরই ধ্বংস হইতেছে, অথচ বিশ্বের লোপ হইতেছে না। যেমন মানবের জন্ম ও মৃত্যু আছে, সেইরূপ বিশ্বের সমুদায় পদার্থেরই উৎপত্তি ও নাশ আছে। জন্মমৃত্যু,—উৎপত্তিনাশ অবস্থান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়। অনাদি অনন্ত বিশ্ব প্রতি মুহূর্ত্তে নবরূপ ধারণ করিতেছে। এই প্রকাণ্ড পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য্য, পূর্ব্বে ইহার কিছুই ছিল না এবং পরেও ইহার কিছুই থাকিবে না। যেমন আমি ছিলাম না, কিন্তু আমার পিতা ছিলেন, সেইরূপ এই পৃথিবী ছিল না, কিন্তু ইহার উপাদান ছিল। বর্ত্তমান সূর্য্যের পূর্ব্বে অন্য সূর্য্য ছিল, বর্ত্তমান গ্রহ নক্ষত্রের পূর্ব্বে অন্য গ্রহ নক্ষত্র ছিল। যেমন শতবর্ষের মধ্যেই বর্ত্তমান সমুদায় মনুষ্যেরই মৃত্যু হইবে, অথচ কেহ তাহা বুঝিতে পারিবে না, প্রতি মুহূর্ত্তে দুই এক জন করিয়া মরিবে ও জন্মিবে; গ্রহ, নক্ষত্র ও পৃথিবী সকলও ঐরূপে ক্রমে এক একটী করিয়া লুপ্ত হইবে ও তাহাদের স্থানে নূতন গ্রহাদি উৎপন্ন হইবে। সুতরাং

বিশ্ব অনাদি অনন্ত হইলেও গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী ও জীবাদি সমস্ত পদার্থেরই উৎপত্তি ও ধ্বংশ হইতেছে।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন, পূর্ব্বে পৃথিবী বাষ্পময় ছিল, ঐ সকল বাষ্পময় পরমাণুরাশি ঘন হইয়া জল হইল, জল কঠিন হইয়া মৃত্তিকা হইল, কঠিন পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় কেবল অন্তরী-ভূত প্রস্তর মাত্র হইল, ক্রমে তদুপরি সরের ন্যায় স্তর জমিতে লাগিল। ঐ স্তরাবলীতে ক্রমে ক্রমে বৃক্ষ, লতা, মৎস্য, সরী-সৃপ, পশু, পক্ষী ও সর্ব্বশেষে মানব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বন্য মানব ক্রমে সভ্য হইতেছে। যে বাষ্পরাশি হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা যে পূর্ব্বে অন্য পৃথিবী ছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? যেমন বাষ্প হইতে জল ও জল হইতে বাষ্প জমিতেছে, যেমন বৃক্ষ হইতে বীজ ও বীজ হইতে বৃক্ষ জমিতেছে, সেইরূপ বাষ্প রাশি পৃথিবী ও পৃথিবী বাষ্পরাশি রূপে পরিণত হইতেছে। যেমন মানবের বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য ও তৎপরে মৃত্যু হইয়া থাকে, সেইরূপ পৃথিবীর বাল্য অর্থাৎ বন্য, যৌবন অর্থাৎ সভ্য, বার্দ্ধক্য অর্থাৎ স্থির ভাবের অন্তে লোপ হয়। বিশ্বের সমুদায় পদার্থেরই এই নিয়ম। পূর্ব্বে মানব জাতি নিতান্ত অসভ্য ছিল, ক্রমে সভ্য হইতেছে, পরে যখন উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইবে, তখন তাহাদের পতন হইবে। তাহার পর মানব হইতে উৎকৃষ্ট জীব পৃথিবীবাসী হইলেও হইতে পারে। পৃথিবী উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইলে ক্রমে তাহার ধ্বংস হইতে থাকিবে ও পরিশেষে পুনরায় বাষ্পময় হইবে।

ইয়ুরোপীয়গণের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পৃথিবী ছয় হাজার বৎসর মাত্র সৃষ্ট হইয়াছে। একথা বিজ্ঞান ও যুক্তির নিতান্ত

বিরুদ্ধ। এ বিষয়ে আর্য্যজাতির পৌরাণিক মত অতি চমৎকার। তাঁহারা বলেন, ৪ বৃন্দ ৩২ কোটী বৎসরে এক কল্প হয়। এক কল্প ব্রহ্মার দিবা ও তত্তুল্য সময় তাঁহার রাত্রি। ব্রহ্মার রাত্রিকালে সমুদায় পৃথিবীর লয় ও দিবাভাগে পুনরায় সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমান কল্পের প্রায় দুই বৃন্দ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ বর্ত্তমান পৃথিবীর বয়ঃক্রম প্রায় দুই বৃন্দ বৎসর অতীত হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্রহ্মার ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্রহ্মার পূর্ব্বেও অন্য ব্রহ্মা ছিলেন এবং পরেও অন্য ব্রহ্মা হইবেন। মনু বলিতেছেন—

আসীদিদন্তমোভূত মপ্র জ্ঞাতমলক্ষণং।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥
ততঃ স্বয়ম্ভু র্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥

পূর্ব্বে বিশ্বের সমস্ত উপকরণই ছিল, কিন্তু তৎসমস্ত তমোভূত, অবিজ্ঞেয় ও লক্ষণশূন্য অবস্থায় ছিল, স্বয়ম্ভু ভগবান্ সেইগুলি প্রকাশ করিয়া আপনি প্রকাশিত হইলেন। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রকারগণ স্পষ্টতঃ বিশ্বের অনাদি অনন্তত্ব স্বীকার করিয়াছেন। অদ্য আমরা যে যুক্তির অনুসরণ করিতেছি, কতকাল পূর্ব্বে আর্য্য জাতি তাহা স্থির করিয়াছেন।

বাস্তবিক যাহাকে আর্য্যেরা পঞ্চভূত বলেন তাহাই প্রকৃত বিশ্ব। তাহার হ্রাসবৃদ্ধিক্ষয় নাই, কিন্তু তাহাদের সংযোগ ও বিয়োগে নানাবিধ পদার্থ জন্মিতেছে। ঐ সকল ভূতের মিলনে জল, বায়ু, প্রস্তর, মৃত্তিকা, গ্রহ, সূর্য্য, নক্ষত্র, পৃথিবী, তাপ,

তাড়িৎ, আলোক, মেঘ, বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের উৎপত্তি হইতেছে। যেমন মিলনের প্রকার ভেদে পারদ ও গন্ধক হইতে কজ্জলী, হিঙ্গুল ও পপ্পটি হইতেছে, সেইরূপ ঐ সকল ভৌতিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন রূপ সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উৎপত্তি হইতেছে। বাস্প কণা হইতে মানব পর্য্যন্ত সমুদায়েরই মূল উপাদান এক। অতএব যদিও বিশ্ব অনাদি অনন্ত, কিন্তু পৃথিবীর সৃষ্টি, উন্নতি, অবনতি ও লয় আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মানব ও আত্মা।

যদি বাস্পকণা হইতে মানব পর্য্যন্ত সমুদায়ই মূল এক উপাদান হইতে উৎপন্ন, তবে মানব এত শ্রেষ্ঠ কেন? গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য্য প্রভৃতির সংবাদ আমরা জানিনা, তথায় শ্রেষ্ঠতর জীব থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু পৃথিবীমধ্যে মানবই সর্ব্ব প্রধান। মানবের শক্তি অতি অদ্ভুত; যে সকল কার্য্য মানবে সম্পন্ন করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। যদি জন্ম মৃত্যু মানবের ইচ্ছাধীন হইত, তাহা হইলে তাহাকে এই পৃথিবীর হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা বলা যাইতে পারিত। মানবের যে শক্তি আছে, তাহার কোটী অংশের একাংশ শক্তি অন্য জীবের নাই, তবে কি প্রকারে বলা যায় যে, অন্যান্য পদার্থের সহিত মানব এক উপাদানে নির্ম্মিত? ইহার

গূঢ় কারণ বুঝিতে না পারিয়া, অনেকে আত্মা নামক অবাঙ্মন-সোগোচর পদার্থের কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন আত্মার শক্তিতেই মানব গমন করে, চিন্তা করে, কার্য্য করে; আত্মা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের চেষ্টা করিবার শক্তি নাই। জড় পদার্থ নিশ্চেষ্ট, জড় হইতে মনুষ্য যে সকল গুণে শ্রেষ্ঠ, তৎসমুদায়ই আত্মার শক্তি। কিন্তু আত্মা কাহাকে বলে? আত্মার স্বরূপ কি? কিম্বদন্তী এই যে পদার্থ দুইপ্রকার;— জড় ও চেতন; যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও যাহার ভার আছে, তাহা জড় এবং যাহা ইন্দ্রিয়াদির অগ্রাহ্য, ভারশূন্য ও যাহার শক্তি প্রভাবে মানব সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করে তাহাই চেতন। উহা ঈশ্বরেরই অংশবিশেষ। এই সংজ্ঞা অনুসারে বায়ু এমন কি নিতান্ত লঘু ঈথারও জড় পদার্থের অন্তর্গত। ঈথার আমাদের অতীন্দ্রিয় জড় পদার্থ। পরমাণুর আকৃতি, বিস্তৃতি, অবস্থিতি প্রভৃতি গুণের অস্তিত্ব আছে বলিয়া আমরা কোনও প্রকারে তাহার সত্তা অনুভব করি ও হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি। আত্মার কিন্তু বিস্তৃতি বা ভার নাই, আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় এমত কোন গুণই আত্মার নাই, সুতরাং তাহা মানবের জ্ঞানগোচর কি প্রকারে হইবে? যাহা কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে, তাহা জ্ঞানেরও গোচর নহে; যাহা জ্ঞানের গোচর নহে, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। তবে চাক্ষুষ আকার বিহীন বায়ুর সত্বা অনুভব করিয়া থাকি বলিয়াই নিরাকার আত্মার কল্পনা করিতে সক্ষম হই; নতুবা মানব কখনও উহার কল্পনা করিতে পারিত না; যাহা হউক, আত্মার স্বরূপ যে আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাঁহা

হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না, তাহা জ্ঞানের দ্বারা কখনও উপলব্ধি হইতে পারে না। সুতরাং তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আত্মা-বাদীরা অজ্ঞেয় আত্মার কল্পনা করিতেছেন, সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে কি না। অর্থাৎ তাঁহারা যে বলিতেছেন জড় নিশ্চেষ্ট, সচেতন আত্মা ভিন্ন জড় দ্বারা চেষ্টা হইতে পারে না, একথা সর্ব্বত্র সুসঙ্গত হয় কি না। জিজ্ঞাসা করি কেবল মানবই চেতন আত্মাবিশিষ্ট, না—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা সমস্তই আত্মাবান্? যদি বলেন কেবল মানবেরই আত্মা আছে, আর কোনও জীব বা উদ্ভিদের আত্মা নাই, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, যে, যখন জড়ের চেষ্টা নাই ও যখন পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদের আত্মা নাই, তখন তাহারা গমন, মনন, ইচ্ছা, প্রেম প্রভৃতি চেতনোপযোগী কার্য্য কি প্রকারে সম্পাদন করে? অনেক ইতর প্রাণীর বুদ্ধি পরিচালনা ও শিল্প-নৈপুণ্য প্রভৃতির এরূপ পরিচয় পাওয়া যায় যে, শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাহারা কি প্রকারে ঐরূপ বুদ্ধি চালনা ও শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করে? প্রধানতঃ মানব ও জীবের প্রভেদ এই যে, মানব উন্নতিশীল ও ইতর জীব চিরকাল একভাবেই থাকে। সুতরাং চেতন ও জড়ে প্রভেদ অতি অল্পই থাকিল। আত্মা ও জড়ের প্রভেদের পরিমাণ কি এই টুকু মাত্র? যদি বল উদ্ভিদ্ ও জীবমাত্রই আত্মাবান্, তবে তাহাদের মধ্যে এত প্রভেদ কেন? ইতর জীব ও উদ্ভিদগণের উন্নতি ও ধর্ম্ম ভয় নাই কেন? আত্মা ইতর জীবদেহে মানবের ন্যায় কার্য্য করে না কেন?

এস্থলে আর একটী জিজ্ঞাস্য এই যে, আত্মা কি জড়-সংসৃষ্ট না স্বতন্ত্র, অর্থাৎ যখন শুক্রশোণিতযোগে দেহের উৎপত্তি হয় সেই সময়ে আত্মার জন্ম হয়, না আত্মার থাকিবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, যখন জড়দেহ জন্ম গ্রহণ করে, সেই সময় বা তৎ-পরে আত্মা ঐ দেহ আশ্রয় করে? যদি আত্মা জড়-সংসৃষ্ট হয় তবে আর আত্মার স্বাতন্ত্র্য কোথায় রহিল? যদি আত্মা স্বতন্ত্র হয়, তবে তাহা কোথায় থাকে, কত সংখ্যক আত্মার বিদ্যমানতা আছে, কোন্ আত্মা কোন্ শরীরে প্রবেশ করিবে তাহার নিয়ম কি এবং কিরূপে ও কোন্ সময়ে আত্মা জড় দেহে প্রবেশ করে? এ সকল কথা কে বলিয়া দিবে?

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, শুক্রশোণিতের যোগে জীবদেহের উৎপত্তি হয়; আত্মা কোন্ সময়ে সেই জড়দেহে প্রবেশ করে? আম্র মধ্যে ও বিকৃত দ্রব্য হইতে যে সকল কীট জন্মে, তাহারা যদি আত্মাবান্ হয়, তবে কোন্ সময়ে আত্মা ঐ আম্র ও বিকৃত দ্রব্য মধ্যে প্রবেশ করে? যদি আত্মার সহিত শুক্রশোণিত যোগের ও বিকৃত দ্রব্যাদির অকাট্য সম্বন্ধ থাকে, তবে কেন সর্ব্ব সময় জীবের উৎপত্তি না হয়? স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন মাত্রেই কেন সন্তান না জন্মে? বন্ধ্যা স্ত্রীর সম্মিলনে সন্তান হয় না কেন? আর এক কথা,—যদি আত্মাই মানবের মানবত্বের কারণ, যদি আত্মাই জ্ঞান বুদ্ধির হেতু, যদি আত্মাই চিন্তাশক্তির মূল, তবে সকলেরই কেন সমান মানবত্ব, সমান জ্ঞান, সমান বুদ্ধি ও সমান চিন্তাশক্তি জন্মে না? যখন সকলেরই আত্মা আছে, তখন কেহ দুর্ব্বল, কেহ বলবান্, কেহ নির্ব্বোধ, কেহ বুদ্ধিমান্, কেহ সৎ, কেহ অসৎ, কেহ বিনয়ী, কেহ অহঙ্কারী,

কেহ চিন্তাশীল কেহ চিন্তাশূন্য হয় কেন? জন্মসময়ে যখন আত্মা দেহ আশ্রয় করে, তখন কিজন্য জন্মমাত্র বালকেরা সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞানী না হয়? কি জন্য লোকে চক্ষু না থাকিলে দেখিতে পায় না, কর্ণ না থাকিলে শুনিতে পায় না? এবং শোণিতের অপগমে জীবেরই বা নাশ হয় কেন? ইহার উত্তরে আত্মাবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, আত্মা সকল কার্য্যের কর্ত্তা বটে, কিন্তু দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যেই আত্মা কার্য্য করিয়া থাকেন; সুতরাং যে শরীরে যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি আছে, সে শরীর হইতে সেইরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। অস্ত্র তীক্ষ্ণ হইলে ছেদক যেরূপ অনায়াসে ছেদন করিতে পারে ও অস্ত্রে ধার না থাকিলে যেমন ছেদনে অসমর্থ হয়, আত্মাও সেইরূপ যে দেহে যেরূপ যন্ত্র থাকে সেই দেহস্থ যন্ত্র অবলম্বন করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। এই জন্য আত্মা চক্ষু না থাকিলে দেখিতে পায় না, কর্ণ না থাকিলে শুনিতে পায় না এবং বালদেহে জ্ঞান লাভের উপযোগী ইন্দ্রিয়াদি না থাকায় বালক জ্ঞানী হইতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলে ত স্পষ্টই বলা হইল যে, আত্মার সকল কার্য্যেরই মূল জড়শক্তি, এবং আত্মার যে, কার্য্যে অশক্ততা তাহারও মূল জড়শক্তি। যখন ইহা স্বীকার্য্য যে আত্মা ভিন্ন জীবের আর সকলই জড়সম্ভূত এবং যখন বলা হইতেছে জড়ের চেষ্টা শক্তি নাই, তখন কি প্রকারে জড় পদার্থ আত্মার দর্শন, শ্রবণ, গমন, মনন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করে এবং কি প্রকারেই বা আত্মার ঐ সকল কার্য্যের বাধা প্রদান করে? যাহার চেষ্টা নাই, সে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেও পারে না, অন্যের অনুষ্ঠিত কার্য্যের বাধা প্রদান করিতে ও পারে না। জড়বিজ্ঞান এবিষয়,

বিশেষ রূপ সপ্রমাণ করিয়াছে। সুতরাং আত্মাবাদীদিগের এ উত্তর সঙ্গত হইল না। বিশেষতঃ জড়-শক্তিই যদি সকল কার্য্য সম্পন্ন করিল, তবে আত্মা কোন্ কার্য্য করিল? হে আত্মা-বাদিন্! যখন তুমি বলিতেছ,—মানবের বল, বুদ্ধি, রাগ, দ্বেষ, বিবেক, চিন্তা প্রভৃতি সমস্তেরই ন্যূনাধিক্যের কারণ মানবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় বৃত্তি প্রভৃতি এবং যখন তুমি বলিতেছ ঐ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সমস্তই জড়সম্ভূত, তখন ঐ সকলকে কি জড়ের কার্য্য বলা হইল না? তাহা যদি হইল, তবে আত্মা কি কার্য্য সম্পন্ন করেন! জন্ম লাভ করে কে? অবশ্য বলিবে শরীর; আহার করে কে? মুখ ও উদর; চিন্তা করে কে? মন; বিবেচনা করে কে? বিবেক; স্মরণ করে কে? স্মৃতি; শিক্ষা করে কে? ধারণা; ভালবাসে কে? প্রণয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ সমস্ত বৃত্তি কি জড়সম্ভূত,—না, উহারা চেতন আত্মার অঙ্গ? যদি উহাদিগকে আত্মার অঙ্গ বল, তবে মানব বিশেষে ঐ সকলের ন্যূনাধিক্যের যে কারণ নির্দ্দেশ করিলে, তাহার বিপরীত হইল; যদি ঐ সকলকে জড়সম্ভূত বল, তবে বিবেক, চিন্তা, ধর্ম্মভয় প্রভৃতি যে সকল প্রধান গুণ হেতু মানবের মানবত্ব এবং কেবল মাত্র যে সকলের কারণ স্বরূপে চেতন আত্মার কল্পনা করা হইয়াছে, তৎসমস্তই জড়জাত বলা হইল। সুতরাং তাহা হইলে আত্মার প্রয়োজনই থাকিল না। আত্মা কি কেবল সাক্ষীগোপাল মাত্র? এরূপ সাক্ষীগোপাল আত্মা কল্পনা করার প্রয়োজন কি? যখন আত্মা স্বীকার করিয়াও জড়ের চেতনোপযোগী শক্তি স্বীকার করিতে হইল, তখন আর আত্মা-স্বীকারের প্রয়োজন কি? তবে যদি কেহ বলেন যে,

যদিও জীবের চিন্তন, মনন, গমন প্রভৃতি কার্য্য শারীরবৃত্তি সমুদ্ভূত বটে, কিন্তু ঐ সকল কার্য্যের নিযোক্তা কে এবং তাহার ফলভোক্তা কে? যদি আত্মাকেই তাঁহারা ঐ সকলের নিযোক্তা ও তাহার ফলভোক্তা অর্থাৎ সুখদুঃখাদি ভোক্তা বিবেচনা করেন, তবে সকল আত্মা সমানরূপ কার্য্যে নিয়োগ করে না কেন? কেহ সৎকার্য্যে ও কেহ অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত কেন? কেহ দানে ও কেহ লুণ্ঠনে নিযুক্ত কেন? কেহ যুদ্ধ ও কেহ শান্তিস্থাপনে সচেষ্ট কেন? যদি শারীরবৃত্তি এই ইতর বিশেষেরও কারণ হয়, তাহা হইলে আর আত্মার কোনও প্রয়োজনই থাকে না। যদি এই সমস্ত কথার উত্তর স্বরূপে কেহ বলেন যে সকল আত্মা সমান নহে, যে শরীরে যেরূপ আত্মা অধিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই শরীরী জীব সেইরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে একথার প্রতি এত আপত্তি উত্থাপিত হইবে যে তাহার মীমাংসায় আত্মা জড়শক্তিরই নামান্তর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। বস্তুতঃ চেতন আত্মাকল্পনার মূল কারণ এই যে, যখন জড় পদার্থ নিশ্চেষ্ট ও জীব সচেষ্ট, তখন জীবে জড়াতিরিক্ত অবশ্য কোন পদার্থ আছে। এই যুক্তিই আত্মা স্বীকারের মূল। সুতরাং দেখা আবশ্যক যে, বাস্তবিক জড় পদার্থ নিশ্চেষ্ট কি সচেষ্ট।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, জগতে কোন পদার্থ নিশ্চেষ্ট নহে। যে সকল পদার্থ জড় নামে অভিহিত, তাহার বাস্তবিক জড় নহে। কেননা, প্রত্যেক জড়পরমাণু অপর পরমাণুকে আকর্ষণ করে, অর্থাৎ স্বাভিমুখে আনিবার নিমিত্ত বল প্রয়োগ করে, প্রত্যেক পদার্থেরই আত্মীয় বা অভীপ্সিত পদার্থ আছে; তাহারা পরস্পর মিলিত হইলে রাসায়নিক গুণে সংযুক্ত হয়। অনেক

পদার্থের শক্র অর্থাৎ অনভিমত পদার্থ আছে, সকল পদার্থের ঔদ্ধত্য বা তাপ আছে; চুম্বক প্রিয়পদার্থ লৌহকে আকর্ষণ করে; পদ্মপর্ণ বা তৈলের সহিত জলের মিলন হয় না; ক্ষার ও অম্ল একত্রিত হইলে ভয়ানক গতি ও তেজ প্রকাশ করে। বায়ু কখন মৃদু, কখন ভয়ঙ্কর বেগে প্রবাহিত হয়; জলের স্রোতঃ, জোয়ার ভাটা ও প্লাবন প্রভৃতি রূপ নানাপ্রকার গতি আছে; দীপশিখা ও ধূম উর্দ্ধে গমন করে। এ সকলই জড় পদার্থ, অথচ এ সকলেরই চেষ্টা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। আবার পদার্থ সকলকে সুকৌশলে সংযুক্ত করিলে সেই সংযুক্ত পদার্থের অতি আশ্চর্য্য চেষ্টা অনুভূত হয়! সময়নিরূপণযন্ত্র কি চমৎকার কৌশলে সময় নিরূপণ করিতেছে। বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা যে সকল অদ্ভুত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাড়িৎবার্ত্তাবহ নিমেষ মধ্যে ছয় মাসের পথের সম্বাদ লইয়া যাইতেছে। আলোকচিত্রযন্ত্র দ্বারা নিমেষ মধ্যে কেমন আশ্চর্য্য চিত্র সকল চিত্রিত হইতেছে। টেলিফোন্, মাইক্রোফোন্, ফোনোগ্রাফ্ প্রভৃতি জড়পদার্থনির্ম্মিত যন্ত্র যে সকল অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্য একত্রিত হইলেও তাহা সম্পন্ন করিতে পারে না। যদি বিশ্বাস কর, তবে আরও কয়েকটী চমৎকার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

খ্রীষ্টের জন্মের চারি শত বৎসর পূর্ব্বে টরেন্‌টম্‌নগরে আরকাইটাস্ নামক এক জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত একটী কাঠের পায়রা নির্ম্মাণ করেন, সে পায়রা উড়িতে পারিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মূলার নামক জর্ম্মন্ জ্যোতির্ব্বিদ্ একটী কাষ্ঠের চীলপক্ষী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে প্রতিদিন নগর হইতে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ

করিয়া ফিরিয়া আসিত। তিনি একটী মক্ষিকা নির্ম্মাণ করেন, সে ভোজস্থলে তাঁহার হাত হইতে উড়িয়া সমুদায় গৃহ পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিত। আল্‌বর্ট সমাগ্নস্ ও বেকন্ বাক্‌শক্তি বিশিষ্ট মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। লিড্রজ নামে সুইজরলণ্ডীয় শিল্পী একটী ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে একটী ভেড়া স্বাভাবিক ডাক ডাকিত, একটী কুকুর এক ঝুড়ি ফল চৌকি দিত, কেহ তাহা স্পর্শ করিতে আসিলে দাঁত খিচাইত ও উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত; সেই সঙ্গে কতকগুলি মনুষ্যমূর্ত্তি আশ্চর্য্য-ভাবে চলিয়া বেড়াইত। ঐ শিল্পী একটী মনুষ্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, সে নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় ধীরভাবে ক্রমান্বয়ে ৫।৬ খানি ছবি চিত্রিত করিত। কেম্পলেন্ নামক হঙ্গেরি দেশীয় এক শিল্পকর এক আশ্চর্য্য দাবা খেলোয়ার প্রস্তুত করেন, সেটী আজিও বিলাতে আছে। একটী মুসলমানমূর্ত্তি সম্মুখে একটী বাক্সের উপর দাবা সাজাইয়া বসিয়া আছে। সে বাম হস্ত দিয়া খেলিয়া থাকে। কঠিন চাল উপস্থিত হইলে গম্ভীর-ভাবে চিন্তা করে। প্রতিপক্ষ কোন অন্যায় চাল চালিলে, তখনই তাহার প্রতি কট্‌মট্ করিয়া চাহে ও বাক্সের উপর দক্ষিণ হস্তের আঘাত করিয়া রাগ প্রকাশ করে। দাবা খেলিয়া কেহ তাহাকে হারাইতে পারে না। পারিস্ বিজ্ঞানসভার ভোকন্‌সন্ একটী বংশীবাদক ও একটী বাজাদার নির্ম্মাণ করেন। বংশীবাদক বাঁশীর সাত ছিদ্রে সাতটী অঙ্গুলি দিয়া অতি পারদর্শী বাদকের ন্যায় বাঁশী বাজাইত; বাজাদার ২০ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন সুর বাজাইতে পারিত। তিনি একটী হংসী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সে স্বাভাবিক পক্ষীর ন্যায় পান ভোজন

করিত, তাহা পরিপাকও হইত। সুইজার্লণ্ড দেশীয় মেলাডাই নামক এক ব্যক্তি একটী স্ত্রী মূর্ত্তি দ্বারা পায়নাপোর্ট যন্ত্রে আশ্চর্য্যরূপে ১৮টী সুর বাজাইত। সে রমণী যেরূপ সুন্দর ভাব ভঙ্গী সহকারে শরীর আন্দোলন করিত তাহা দেখিতে অতি আশ্চর্য্য। উক্ত শিল্পকর একটী গায়ক পক্ষী নির্ম্মাণ করেন, সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া পাখা ঝাড়িয়া শিষ ধরিয়া গান আরম্ভ করিত। পক্ষীটী ৪ মিনিট করিয়া বাহিরে বসিয়া ৪ প্রকার পক্ষীর স্বর আলাপ করিত। এই শিল্পকর একটী বালকের মূর্ত্তি গঠন করিয়াছিল। সে অতি সুন্দররূপে চিত্র অঙ্কিত করিত এবং ইংরেজী ও ফরাসী অক্ষরে লিখিতে পারিত। ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইয়ের আমোদ জন্য কয়েকটী কল প্রস্তুত হয়, তাহা অতিশয় আশ্চর্য্য। তাহার একটী এই—"একখানি ছোট গাড়িতে দুইটী ঘোড়া যোড়া। তাহার উপরে একটী বিবি একটী সইস ও একটী বালকভৃত্যকে পশ্চাতে লইয়া বসিয়াছেন। একটী বৃহৎ টেবিলের উপর গাড়ী খানি স্থাপিত হইলে, গাড়োয়ান চাবুক মারিল; অমনি ঘোড়া দৌড়িল,—ঠিক প্রকৃত ঘোড়া যেমন পা ফেলিয়া চলে তেমনি চলিল। টেবিলের অপর ধারে আসিয়া গাড়ী খানি বাঁকিয়া ঠিক্ ধার দিয়া চলিল এবং যেখানে রাজা বসিয়া আছেন সেই খানে গিয়া থামিল। বালক ভৃত্য অমনি নামিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল, বিবি এক খানি আবেদন পত্র হস্তে লইয়া নামিয়া আসিলেন ও সেলাম করিয়া তাহা রাজার হস্তে দিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিবি পুনরায় সেলাম করিয়া ও ফিরিয়া আসিয়া বিদায় লইলেন গাড়ীতে চড়িলেন। গাড়োয়ান চাবুক মারিল, ঘোড়া আবার চলিল। সইস নামিয়া-

ছিল, দৌড়িয়া গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে উঠিল, গাড়ী চলিয়া গেল।" ইবান্স নামক এক সাহেব তাঁহার জুবিনাইল টুরিষ্ট পত্রে পারিস নগরে প্রদর্শিত কয়েকটী আশ্চর্য্য দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার প্রথম দৃশ্য—"একটী বনের প্রাতঃকালীন শোভা—সকল বস্তু ধূষরবর্ণ নবীন ও শিশিরসিক্ত বোধ হইল। ক্রমে সূর্য্যের কিরণ প্রখর হইয়া মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে, ঘরের ভিতর কতকগুলি সর্প চলিয়া বেড়াইতে লাগিল ও এক ছোট শিকারী বন্দুক স্কন্ধে আসিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইয়া শিকার সন্ধান করিতে লাগিল। একটী সরোবর হইতে একটী ছোট হংস উঠিয়া উড্ডীন হইল; শিকারী বন্দুক ছুড়িলে, হংসটী ঘুরিয়া পড়িল। শিকারী তাহাকে স্কন্ধে ফেলিয়া বন্দুক কোমরে বাঁধিয়া চলিয়া গেল। চারি বুরুল উচ্চ ঘোটক সকল গাড়ী টানিতেছে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ কৃষক সকল যাইতেছে; সম্মুখে নেপল্স উপসাগর, তাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ চলিতেছে। শেষে এক প্রলয় ঝড় উপস্থিত হইল, জাহাজ ভগ্ন হইল, নাবিকগণ জলে ভাসিতে ও ডুবিতে লাগিল, এক জন নাবিক ভাসিয়া পাহাড়ের ধারে লাগিল, তাহার উদ্ধারার্থে যে সকল নৌকা আসিবার চেষ্টা করিল, সমস্ত ডুবিয়া গেল। নাবিক অত্যন্ত আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; ঝড় থামিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি বাতিঘর হইতে পাহাড়ের ধারে আসিয়া দড়ি নামাইয়া দিল; ক্লান্ত নাবিক তাহা ধরিয়া খানিক দূর উঠিয়া, হাত পিছলাইয়া পড়িয়া গেল, আবার প্রাণপণে দড়ি ধরিয়া নিরাপদে পাহাড়ের উপরে উঠিল।"

জড়পদার্থ দ্বারা এইরূপ ও অন্য বহুবিধ আশ্চর্য্য যন্ত্র

নির্ম্মিত হইয়া থাকে। অধিক কি, অত্যন্ত দুরূহ গাণিতিক অঙ্ক ও প্রতিজ্ঞা সকলের প্রকৃত উত্তরও যন্ত্রবলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার কেবল জড়পদার্থের সংযোগ মাত্রেই সম্পন্ন হয়, তখন কখনই জড়কে নিশ্চেষ্ট বলিতে পারা যায় না। তবে এসম্বন্ধে এই আপত্তি উত্থিত হইতে পারে যে, জড়ের যে চেষ্টা আছে, তাহা একই প্রকার মাত্র। উপরে যে সকল যন্ত্রের উল্লেখ হইল সে সকল একইরূপ মাত্র কার্য্য সম্পাদন করে। অর্থাৎ যে যন্ত্র যে কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তদ্দারা পুনঃ পুনঃ কেবল সেই কার্য্যেরই অভিনয় হইয়া থাকে, এবং যাহার পর যাহা ব্যবস্থিত হইয়াছে তাহার পর তাহাই অনুষ্ঠিত হয়, নূতন কিছুই হয় না এবং পর্য্যায়েরও পরিবর্ত্তন হয় না। সে সকল যন্ত্রের কোন প্রকার ইচ্ছা বা সংকল্প থাকা প্রকাশ পায় না। কিন্তু জীবের চেষ্টা সেরূপ নহে, তাহাদের ইচ্ছা আছে যখন যেরূপ ইচ্ছা জীবগণ তদনুরূপ কার্য্য সম্পাদন করে, যন্ত্র সকলের ন্যায় পর্য্যায়ানুসারে চলে না। আমাদের বোধ হয় এ কথা নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। কারণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কি উদ্ভিদ্ কি জীব কাহারই স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। যদি বাস্তবিক তাহাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকিত, তবে অবশ্য তাহারা সেই স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনা করিত সুতরাং তাহারা কখনই চিরকাল একরূপ ইচ্ছা করিত না। তাহা হইলে আম্র বৃক্ষ অন্ততঃ একদিনও ইচ্ছা করিয়া নারিকেল ফল প্রসব করিত এবং চম্পক পুষ্প এক-দিনও পদ্ম পুষ্প প্রস্ফুটিত করিত; তাহা হইলে ব্যাঘ্র অবশ্য এক দিন জীবহিংসা পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষ ভোজন করিত এবং মেষের মনে অবশ্য এক দিনও পশু সংহার করিয়া

ভোজন করিবার ইচ্ছা করিত। যখন তাহা না করিয়া সকলেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ইচ্ছা ও কার্য্য করে, তখন তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহা করে কি প্রকারে বলা যায়? বরং উহারা যে যন্ত্র সকলের ন্যায় পর্য্যায়ানুসারে চলে ইহা দ্বারা তাহাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। দেখ, সকল বৃক্ষই প্রথমে অঙ্কুরিত, পরে পল্লবিত, তৎপরে শাখান্বিত হয়; বয়োবৃদ্ধি হইলে সকল উদ্ভিদ্ই পুষ্পিত ও ফলবান হয়; যাহার যে সময় নিয়ম সেই সময়েই তাহার ফুল ফল হইয়া থাকে। বিশেষ কারণ ভিন্ন এ নিয়মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না। জীবগণও ঐরূপ পর্য্যায়ক্রমে আহার, বিহার নিদ্রা ও জননক্রিয়াদি নিষ্পাদন করে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সিংহ ব্যাঘ্রাদি জীব ও বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ্ যে নিয়মে কাল যাপন করিয়াছে এখনও ঠিক্ সেই নিয়মে করিয়া থাকে, তাহার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না। ইহার কারণ কি? ইহাতে কি স্পষ্ট বোধ হইতেছে না যে, যন্ত্র সকলের ন্যায় জীব ও উদ্ভিদ্গণও উপাদান সাপেক্ষ, অর্থাৎ যে কার্য্য সম্পাদন জন্য যে জীব বা যে উদ্ভিদ্ যেরূপ উপাদানে যে কার্য্য সাধন জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই জীব বা সেই উদ্ভিদ্ তদনুরূপ কার্য্যই সম্পাদন করিতে বাধ্য! যদি স্বতন্ত্র চেতন আত্মা ইচ্ছার কারণ হইত, তাহা হইলে অবশ্য কোন না কোন সময়ে নিয়মের ব্যত্যয় হইত।

আরও সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, মানবগণও ঐরূপ একই নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করে। দেখ, সকল মানবই একই নিয়মে জন্মগ্রহণ করিতেছে,

একই নিয়মে বাল্য ক্রীড়া করিতেছে, একই নিয়মে যৌবনসুখ অনুভব করিতেছে এবং একই নিয়মে বৃদ্ধ কাল কাটাইতেছে। স্থূলতঃ, মানবের সকল কার্য্যই এক নিয়মাধীন। তবে যে মানব যন্ত্রের ন্যায় প্রতিদিন সমান পর্য্যায়ে কার্য্য করে না, আকর্ষক পদার্থ সকল পর পর উপস্থিত না হওয়াই তাহার প্রধান কারণ। যখন যেমন বিষয় উপস্থিত হয়, তাহারই অনুরূপ কার্য্য মানব-শরীর হইতে প্রকাশ পায়। যাহার সহিত আকর্ষণ সম্বন্ধ আছে, এমন বিষয় যখন সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন মানব তাহাকে ভাল বাসে; যখন বিপ্রকর্ষণকারী পদার্থ সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন তাহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করে। আকর্ষণের নামান্তর অনুরাগ। প্রণয়, স্নেহ, ভক্তি সমুদাই আকর্ষণ-মূলক। বিপ্রকর্ষণের নামান্তর বৈরাগ্য। ভয়, ঘৃণা প্রভৃতি বিপ্রকর্ষণ মূলক। সাধারণতঃ, স্ত্রী পুরুষে পরস্পরের আকর্ষণ আছে। আবার তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে অধিকতর সম্বন্ধ আছে। সেই জন্যই তাহাদিগের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলেই অকৃত্রিম প্রণয় জন্মে। তাই প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই, অতি কুৎসিতা রমণীর সহিত সুন্দর পুরুষের ও পরমা সুন্দরী রমণীর সহিত কদাকার পুরুষের প্রণয় জন্মে। এই কারণেই যে যাহাকে ভাল বাসে, তাহার মন্দ গুলিও ভাল দেখে ও যে যাহাকে ঘৃণা করে তাহার ভাল গুলিও মন্দ দেখে। মানবগণ যে পরস্পর এত ভিন্নাকৃতি ও ভিন্নপ্রকৃতি উপাদানের ন্যূনাধিক্য ও সমাবেশ পার্থক্যই তাহার প্রধান কারণ। যে মানব-দেহে আকর্ষণকারী পদার্থ অধিক আছে, সে অধিক প্রণয়ী হয়, সকলে তাহাকে ভালবাসে এবং সকলকে সে ভালবাসে; যাহার

দেহে বিপ্রকর্ষণ শক্তি অধিক, সংসারে তাহার আসক্তি থাকে না, সে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করে; যে দেহে তাপ অধিক সে অধিক তেজীয়ান্ হয় এবং যাহাতে তাপ অল্প সে বিনয়ী হয়। এই রূপে যে শরীরে যে গুণের উপকরণ অধিক, সে শরীরে সেই গুণ অধিক দৃষ্ট হয়। বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি, বিবেক, অভিমান, দম্ভ, ধৈর্য্য, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি সমস্ত মানবীয় গুণগুলিই উপাদান পদার্থের শক্তি বিশেষ। যে গুণের উপকরণ যে শরীরে যত অধিক আছে, সেই শরীর সেইগুণে তত অধিক ভূষিত হইবে, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না। এই জন্যই বলিয়া থাকে, "অঙ্গার শত ধৌতেন মলিনত্বং ন জায়তে" এবং এই জন্যই বলিয়া থাকে, "স্বভাব যায় মলে।" যেমন চুম্বকের লৌহাকর্ষণ শক্তি, অগ্নির উষ্ণত্ব কিছুতেই যাইবার নহে, সেইরূপ মানবের স্বভাবও চিরকাল অটল থাকে। যে উপকরণ হইতে দেহ গঠিত, তাহার শক্তি কোথায় যাইবে? এইজন্য বুদ্ধিমান্ নির্ব্বোধ হয় না, নির্ব্বোধ বুদ্ধিমান্ হয় না; সাধু অসাধু হয় না, অসাধু সাধু হয় না; যাহার যে শক্তি, কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না। যদি মানবের জড়াতিরিক্ত ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে কখনই এরূপ হইত না। কেননা, তাহা হইলে ইচ্ছা করিয়া অন্ততঃ একদিনও দুর্ব্বল বলী হইত, ক্রোধী ক্ষমাপর হইত, তেজীয়ান্ বিনয়ী হইত, কামী নিষ্কাম হইত, নির্ব্বোধ বুদ্ধিমান হইত, এবং নিষ্ঠুর দয়ালু হইত।

কখন কখন স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া মানবকে বিপরীত ভাবাপন্ন হইত দেখা যায় সত্য, কিন্তু তাহার কারণ স্বতন্ত্র; জ্ঞান ও শিক্ষা প্রকরণে সে বিষয়ের যথাযথ আলোচনা করা যাইবে।

শাণিত হইলে লৌহাস্ত্র যেমন তীক্ষ্ণ হয় এবং বিনা ব্যবহারে তাহা যেমন আবার অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, সেইরূপ শিক্ষা দ্বারা বৃত্তি বিশেষ শাণিত ও বৃত্তি বিশেষ নিস্তেজ হইয়া যায়। কিন্তু যাহার যাহা নাই, শিক্ষা দ্বারা তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না। কাষ্ঠ শাণিত হইলে অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণধার হয় বটে কিন্তু কখনও লৌহের তুল্য হইতে পারে না। দিগ্গজ পণ্ডিত সহস্র বৎসর শিক্ষা করিলেও রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় হইতে পারিবে না। কালিদাস যদি বিদ্যাশিক্ষা না করিতেন, তথাপি কবি হইতেন। তবে এত উৎকৃষ্ট হইতে পারিতেন না। রাম-বসু, হরুঠাকুর, মধুকাণ, দাশরথি রায় শিক্ষা না করিয়াও কবি। শিক্ষিত হইলে তাঁহাদের কবিতা অধিক মার্জ্জিত হইত মাত্র। যুধিষ্ঠির ও সক্রেটিস্ শিক্ষা না করিলেও সাধু হইতেন; ভীষ্ম, অর্জ্জুন শিক্ষিত না হইলেও বীর হইতেন এবং বিশ্বামিত্র শিক্ষিত না হইলেও যোগী হইতেন। শিক্ষার গুণ এই যে, যাহার যাহা আছে, শিক্ষা দ্বারা তাহার উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহার যাহা আদৌ নাই, শিক্ষা তাহা দিতে পারে না এবং শিক্ষা যাহা মার্জ্জিত করিয়া প্রকাশ করে, তাহা প্রাকৃতিক শক্তির ন্যায় সুন্দর বা সুদৃঢ় হয় না। সেই জন্য প্রাকৃতিক কার্য্যের এত প্রশংসা এবং সেই জন্যই প্রাকৃতিক কবি যাহা বলেন তাহাই মিষ্ট লাগে, প্রাকৃতিক প্রেমের সমুদায়ই সুন্দর, প্রাকৃতিক স্বরের এত মনোহারিত্ব প্রাকৃতিক রূপের এত সৌন্দর্য্য ও প্রাকৃতিক বীরের এত বীরত্ব। যাহার হৃদয়ে করুণা আছে, তাহার ভাব অতি মধুর; যাহার ধৈর্য্য আছে, সে মহা বিপদেও অটল এবং যাহার বিবেক আছে, সে কিছুতেই কুকর্ম্মশালী

হয় না। শিক্ষা দ্বারা যে গুণের প্রকাশ হয়, তাহার কখনও এত মনোহারিত্ব ও এত দৃঢ়তা হয় না।

তবে কি মানবের ইচ্ছা নাই? অবশ্য আছে। আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, মানবের আদৌ ইচ্ছা নাই। আমরা এই মাত্র বলিতেছি যে মানবের ঐ ইচ্ছা দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র চৈতন্যের নহে,—উহা দেহসম্ভূত। আকর্ষণের নামান্তর ইচ্ছা অর্থাৎ দেহে যে পদার্থ আছে তাহার সহিত বাহ্য যে পদার্থের আকর্ষণ আছে তাহার মিলন করার চেষ্টাকে ইচ্ছা বলে। সেই জন্য যে দেহে যেরূপ পদার্থ আছে সে দেহী সেই-রূপ বস্তু লাভের ইচ্ছা করিয়া থাকে, সেইজন্য "ভিন্ন রুচির্হিলোকঃ"—কেহ মদ্যপানে ও কেহ নিরামিষভোজনে ইচ্ছুক হয়, কেহ খেলা করিতে ও কেহ কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হয় এবং সেই জন্য লোকে এইরূপ পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া সুখী হয়। যদি ইচ্ছা স্বতন্ত্র চৈতন্যের হইত, তাহা হইলে কখনও এরূপ হইত না। তাহা হইলে যাহা করিলে প্রকৃত সুখসাধন হয় সকল মানব তাহাই করিতে ইচ্ছা করিত।

মানবের মধ্যে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাঁহা হইতে আরম্ভ করিয়া নিকৃষ্ট উদ্ভিদ্ পর্য্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে পর পর প্রভেদ নিরীক্ষণ করিলে আলোচ্য বিষয় আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে। স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে উদ্ভিদ্ ও মানবের অন্তর অত্যন্ত অধিক হয় বটে, কিন্তু পর পর দেখিয়া আসিলে প্রভেদ অতি অল্প দৃষ্ট হয়। এ সমুদায়ই উপাদান পদার্থের ন্যূনাধিক্য ও বিন্যাসের ইতর বিশেষ বশতঃ হইয়া থাকে। ঐ উপাদান ও সন্নি-

বেশ-ভিন্নতা হেতু উদ্ভিদের আত্মা হইতে কীটাণুর, কীটাণু হইতে কীটের, কীট হইতে পতঙ্গের, পতঙ্গ হইতে মৎস্যের, মৎস্য হইতে পক্ষীর, পক্ষী হইতে কুকুরের এবং কুকুর হইতে বানরের আত্মা শ্রেষ্ঠ। ঐ ভিন্নতা হেতু বানর হইতে বনমানুষের, বনমানুষ হইতে অতি অসভ্য মানবের, তাহা হইতে ভীল-কুলিদিগের, তাহাদের হইতে কাফ্রিদিগের, তাহাদের হইতে সভ্য মানবের আত্মা পর পর শ্রেষ্ঠ। আবার ঐ ভিন্নতা হেতু সভ্যজাতির মধ্যে দিগগজ হইতে আর্য্যভট্ট, বুদ্ধ, বা ব্যাসের মধ্যে আত্মার এত প্রভেদ হইয়াছে। ঐ ভিন্নতাহেতু সকল দ্রব্য সকলের প্রিয় হয় না এবং সকল দ্রব্য সকলের উপকারক বা অপকারক হয় না। যে পদার্থ মানব দেহের নিতান্ত অপকারক, সেই পদার্থ অপর জীবের প্রাণ রক্ষক। মানব-দেহ হইতে মল বলিয়া যাহা পরিত্যক্ত হয়, শূকরাদি জীবদেহ তাহাতেই পরিপুষ্ট হয়। যে মৃত্তিকায় রক্তকর দ্রব্য নাই বলিয়া মানব অভোজ্য জ্ঞানে পরিত্যাগ করে, সেই মৃত্তিকাই কত জীবের দেহপোষক। যে বিষ ভোজনে মানবের প্রাণান্ত হয়, সেই বিষ কত জীবের প্রাণ রক্ষা করে। যে আঙ্গারিকাম্ল জীবের নিতান্ত অনিষ্টকর, সেই আঙ্গারিকাম্ল ভিন্ন উদ্ভিদ্ একদণ্ডও বাঁচেনা। এ সকলের কারণ কি? যাহা অপকারী, তাহা সকলেরই অপকারক হয় না কেন এবং যাহা উপকারী তাহা সাধারণের উপকারক হয় না কেন? *যন্ত্র নির্ম্মাণের ইতর বিশেষই ইহার কারণ।* জীবগণের কার্য্য ভেদের কারণও উহা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

এইরূপে যখন সকল কার্য্যই মানবের জড়শক্তিজাত প্রমাণিত হইতে চলিল, তখন স্বতন্ত্র আত্মার আর কি প্রয়োজন

থাকে! বোধ হয় আত্মাবাদীরা এই কথা বলিবেন যে, যদিও জড়শক্তি দ্বারা সকল কার্য্য সম্পন্ন হয় বিবেচনা করা যায়, কিন্তু বোধ ও জ্ঞান কখনও জড়ের হইতে পারে না। ঘটিকা যন্ত্র সকলকে সময়ের কথা বলিয়া দেয় বটে, কিন্তু ঐ যন্ত্র জানে না যে সে সকলকে সময় জ্ঞাপন করিতেছে। যদি কেহ ঘড়িটী ভাঙ্গিয়া ফেলেন তাহা হইলে ঐ ঘড়ী আঘাত জনিত বেদনাও বোধ করে না। কিন্তু মনুষ্য যাহা করে তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক করে, অর্থাৎ সে যাহা করে তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে এবং জন্ম হইতেই সুখ দুঃখ বোধ করে। জড়ের যখন বোধ শক্তি নাই তখন মানব তাহা কোথায় পাইল? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—হে আত্মাবাদিন্ আপনি কি প্রকারে জানিলেন যে জড়ের বোধ শক্তি নাই? যদি আপনি এরূপ ভাবিয়া থাকেন যে কোন জড় বস্তুকে প্রহারাদি জন্য কাঁদিতে বা ছট্‌ফট্ করিতে দেখা যায় না—সুতরাং তাহাদের বেদনা বোধ নাই—তবে আমি জিজ্ঞাসা করি পিপীলিকাদি ক্ষুদ্রপ্রাণীগণও ত বেদনা পাইলে চীৎকার করে না—তুমি তাহাদের চীৎকার শুনিতে পাওনা বলিয়া কি তাহারা শব্দ করিতে পারে না সিদ্ধান্ত করিবে? না উহারা বেদনা পায় না বলিবে? মাইক্রোফোন্ যন্ত্র নির্ম্মিত না হইলে তুমি অনায়াসে বলিতে পারিতে যে পিপীলিকার স্বর যন্ত্র নাই। পিপীলিকা ক্ষুদ্র প্রাণী, তাহার আর্ত্তনাদ তুমি শুনিতে পাওনা— তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিতে পাও, এজন্য তাহার হস্ত পদাদি সঞ্চালন দেখিয়া তাহার ক্লেশানুভব শক্তি স্বীকার কর। কোন বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিলে বৃক্ষ কাঁদে না, হস্ত পদাদি সঞ্চালনও করে না, তবে কি বৃক্ষ ক্লেশ অনুভব করে না? যদি না করে, তবে

বৃক্ষের ক্ষত স্থান হইতে রস পতিত হয় কেন ও সে স্থান শুকাইয়াই বা যায় কেন? এবং পল্লব বা শাখাবিশেষ ভগ্ন হইলে, সমুদায় বৃক্ষ শুকাইয়া মৃত হয় কেন? বৃক্ষের যদি অনুভব শক্তি না থাকিবে, তবে উহার মূল সকল কঠিন স্থান ত্যাগ করিয়া কোমল স্থানে প্রবিষ্ট হয় কেন? অতএব উদ্ভিদের যে বোধশক্তি আছে তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু উদ্ভিদেরই অনুভব ক্রিয়া যখন আমরা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তখন অপর জড়ের অনুভব শক্তির পরিচয় কিরূপে সহজে প্রাপ্ত হইব? বিশিষ্ট রূপ অনুধাবন করিলে কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়।

প্রথমে বিবেচনা কর, সুখদুঃখবোধ কাহাকে বলে। পূর্ব্বে বুঝান হইয়াছে যে, আকর্ষণেরই নামান্তর ইচ্ছা; সেই ইচ্ছা-তৃপ্তির নাম সুখ ও তাহার অতৃপ্তিই দুঃখ। চুম্বক প্রিয় পদার্থ লৌহকে পাইয়া কি নিরতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করে না? এবং যখন লৌহখণ্ডকে উহা হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তখন কি চুম্বক নিতান্ত অনিচ্ছা অর্থাৎ দুঃখ প্রকাশ করে না? তবে কি প্রকারে বলিব জড় পদার্থের অনুভব শক্তি নাই? জ্ঞান সহজাত নহে (জ্ঞান ও বিশ্বাস প্রকরণ দেখ), সুতরাং জ্ঞানসঞ্চয় করিবার শক্তি সকল পদার্থের না থকিলে, উপস্থিত প্রতিজ্ঞা প্রতিপত্তির কোন বাধা ঘটে না। কেননা সকল পদার্থের সকল শক্তি নাই। যদি সকল পদার্থের সকল শক্তিই থাকিবে, তবে পদার্থ সকল পর পর শ্রেষ্ঠ হইবে কি প্রকারে? এবং মানবই বা কি প্রকারে সকলের শ্রেষ্ঠ হইবে? ভিন্ন ভিন্ন শক্তিপ্রদ যন্ত্রাধিক্যই মানবের প্রাধান্যের হেতু। মানবে যত যন্ত্র আছে এত আর কোন জীবে তত নাই, তাই কোন প্রণালীই এত

শক্তি প্রকাশ করিতে পারে না। মানবে বহুবিধ যন্ত্র অর্থাৎ বহুবিধ ইন্দ্রিয়বৃত্তি আছে বলিয়াই মানব বহুবিধ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে ও ধোধশক্তি প্রকাশ করিতে পারে, স্বতন্ত্র চৈতন্য উহার কারণ নহে। এবং পশু পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণিগণ যে মানবের ন্যায় বিবিধ প্রকার শক্তি প্রকাশ করিতে পারে না, যন্ত্রের অল্পতাই তাহার কারণ, চৈতন্য না থাকা তাহার কারণ নহে।

একটী বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এবিষয়ে আর অধিক বিতর্কের আবশ্যক হইবে না। চৈতন্যবাদীরা যে চেতন চেতন করিয়া গণ্ডগোল করিতেছেন, সেই চৈতন্য যদি জড়ের শক্তি বা জড় সম্মিলিত হয়, তবে তাহাতে তাঁহাদের আপত্তি কি? যদি ঈশ্বরই সমস্ত পদার্থের শক্তি দানের কারণ হয়েন, তবে কি তিনি জড় পদার্থে চৈতন্য দিতে পারেন না? না জড়ের চৈতন্য শক্তি দিলে তাঁহার মহিমার খর্ব্ব হয়? তাহা যদি না হয়, তবে জড়ের চৈতন্য শক্তি আছে বলায় দোষ কি? যে জড়ের অদ্ভুত অদ্ভুত শক্তি সকল দেখিয়া মোহিত হইতে হইতেছে, যে জড়শক্তি অবিকল চিত্র অঙ্কিত করিতেছে (ফোটোগ্রাফ্), অবিকল শব্দানুকার করিতেছে (ফোনোগ্রাফ্), প্রকৃত সময় নিরূপণ করিতেছে (ক্রোনোমিটর) ও সুমধুর গীত গাইতেছে (পাইনো), তাহার যে চৈতন্য আছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ কি? যদি জড়ের জড় নাম বলিয়া আপত্তি হয়, তাহার উত্তর এই যে, জড়ের চৈতন্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই মানব উহার নাম জড় রাখিয়াছে। বাস্তবিক জড়পদার্থ জড় নহে, নিয়ত চৈতন্যসম্পন্ন। জড়ের আকর্ষণাদি শক্তি যেরূপ

পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল, চৈতন্য শক্তি সেইরূপ অদ্যাপি অজ্ঞাত রহিয়াছে। কালে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা নিশ্চয়ই জড়ের চেতনাশক্তির পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ করিতে পারিবেন। জড় চৈতন্যে প্রভেদ বুঝিতে পারিলে, এ বিষয় বুঝিতে আর সংশয় থাকিবে না। চৈতন্য নিত্য এবং জড় অনিত্য, ইহাই জড় ও চৈতন্যের ভেদ। চৈতন্য জড়ের আত্মা এবং জড় চৈতন্যের দেহ। চৈতন্য ভিন্ন জড়ের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। জড়ের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলেই আমাদের সহিত ঈশ্বরে সম্বন্ধ কি তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। সুধীগণ চৈতন্যের যে যে লক্ষণ করিয়াছেন, শক্তির লক্ষণ তাহার সহিত অনেক মিলে। শক্তির এই মাহাত্ম্য অবগত হইয়া আর্য্য-পণ্ডিতেরা শক্তিকে পরমেশ্বরী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। শাক্ত সম্প্রদায়ের মতে আদ্যাশক্তি কালীই জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী।

যে হউক এক্ষণে আমরা এই বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিতে চাই যে, যখন স্বতন্ত্র চৈতন্যের সত্তা আমাদের জ্ঞান-গোচর নহে, ও যখন উহার স্বতন্ত্র কার্য্য আমাদের কিছুই উপলব্ধি হয় না, অথচ মানবাদি জীবগণ চেতনোপযোগী কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছে ও যখন চৈতন্য জড় সম্মিলিত হইলে চৈতন্যের বা ঈশ্বরের মাহাত্ম্যের কিছু মাত্র খর্ব্ব হওয়ার কারণ দেখা যায় না, তখন জড়পদার্থ জড় নহে, জড় ও চৈতন্যে সর্ব্বদা মিলিত; আমাদিগের আত্মা জড়সম্মিলিত চেতন শক্তি বিশেষ। ঐ আত্মাই আমি পদবাচ্য এবং উহা দেহের মূলযন্ত্র। এ বিষয় আরও বিশদ করিতে হইলে স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—•✱•✱•✱•—

পূর্ব্ব ও পরকাল।

আত্মা যদি জড়শক্তি-সংশ্লিষ্ট হইল, তবে কি মৃত্যু পর্য্যন্তই মানবের শেষ? না মৃত্যুর পর মানব বর্ত্তমান থাকে ও ইহকালের কার্য্যের ফল স্বরূপে পরকালে সুখ দুঃখাদি ভোগ করে? এ বিষয়ে অগ্রে প্রচলিত মতের সমালোচনা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে নানাপ্রকার মত প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্ট উপাসকেরা বলেন যে, মৃত্যুর পর আত্মা-সকল স্থানবিশেষে স্থিত হয় ও পরিশেষে নির্দ্দিষ্ট বিচারদিনে, ঈশ্বর সেই সকল আত্মার পাপ পুণ্য বিচার করিয়া তাহাদিগের দণ্ড ও পুরস্কার প্রদান করেন। হিন্দুরা বলেন আত্মা পরকালে ইহকালের সৎ বা অসৎকার্য্যের ফলানুসারে স্বর্গ বা নরক ভোগকরে ও কৃত কার্য্যের ফলানুসারে অনুরূপ বংশে যথোচিত শক্তি সম্পন্ন হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। তাঁহারা বলেন পৃথিবীতে যে এই সকল নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট জীবভেদ ও মানবের অবস্থাগত ঈদৃশ প্রভেদ দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বা দুষ্কৃতিই তাহার কারণ। হিন্দুরা ইহাও বলেন যে প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলে, মানব মুক্তি লাভ করে অর্থাৎ তাহার আত্মা ঈশ্বরে লীন হয়, তাহার আর জন্ম হয় না; আবার ইহাও বলিয়া থাকেন যে, বিশেষ অবস্থায় বা পাপাচরণে আত্মার প্রেতত্ব লাভ হয়। খৃষ্ট উপাসকেরাও ভূত মানিয়া থাকেন।

ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের পরকাল সম্বন্ধীয় মত ভালরূপ বুঝা যায় না, তবে তাঁহারাও আত্মার নিত্যতা ও ইহকালের কার্য্যানুরূপ পরকালে ফলভোগ হওয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে এ সকল কথা সম্ভব কি না। খ্রীষ্ট উপাসকদিগের কথা বিশ্বাস করিতে হইলে, তৎসঙ্গে এ কথাও বিশ্বাস করিতে হইবে যে, হয় ঈশ্বর প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ আত্মার সৃষ্টি করিতেছেন অথবা অনন্ত আত্মারাশি অনন্তকাল অনন্ত আকাশে জড়বৎ বিরাজ করিতেছে, তাহারা কিয়ৎকাল জীবদেহ ধারণ করিয়া আবার অনন্তকাল আকাশে জড়বৎ অবস্থিতি করে। কেন না তাঁহারা পূর্ব্বজন্মের কথা স্বীকার করেন না, অথচ স্বতন্ত্র আত্মার বিদ্যমানতা স্বীকার করেন। ইঁহাদিগের এ সকল কথা যে নিতান্ত যুক্তিহীন তাহা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে। কেননা আত্মা ছিল, অথচ কোন দেহ ধারণ করিয়াছিল না, তবে আত্মা কি ভাবে থাকিয়া কি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছিল ও পরেই বা কি ভাবে থাকিয়া কি কার্য্য সম্পন্ন করিবে? যে কোনও ভাবে থাকিয়া যে কোনও কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকিলে, অবশ্য জীববিশেষে পরিণত ছিল বলিতে হইবে। তাহা না বলিলে জন্মলাভের পূর্ব্বে ও মৃত্যুর পরে আত্মা চিরকালই জড় হইতেও নিকৃষ্টভাবে অর্থাৎ নিতান্ত চেষ্টাশূন্য হইয়া থাকে বলিতে হয়। কেবল চেষ্টাই যে আত্মার কার্য্য, সেই আত্মার এরূপ চিরকালীন নিশ্চেষ্টত্ব যে নিতান্ত অসঙ্গত ও একান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ তাহাতে আর সন্দেহ কি? ব্রাহ্মদিগের মতও প্রায় তদনুরূপ। সুতরাং তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনার আবশ্যকতা নাই।

এ বিষয়ে হিন্দুদিগের মতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কেন না তাঁহারা পরজন্ম ও পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করিয়া আত্মার নবোৎপত্তি ও চেষ্টা-শূন্যতা দোষ পরিহার করিয়াছেন। একথায় এই সংশয় হইতে পারে, যে যদি পূর্ব্ব আত্মাই পর আত্মার কারণ, তবে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে পরিমাণ মানব পৃথিবীতে ছিল, এক্ষণে তাহার শতাধিকগুণ বৃদ্ধি হইল কি প্রকারে? এত অধিক লোকের আত্মা কোথা হইতে আইল? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, নিকৃষ্ট জীবের আত্মাসকল উন্নত হইয়া মানবত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু নিকৃষ্ট প্রাণীরও ত বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইতেছে না। নিকৃষ্ট জীবের আত্মা কোথা হইতে আইসে? পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত রূপ পদার্থ মাত্রেরই আত্মা আছে স্বীকার করিলেই এসংশয় নিরাকৃত হইবে। তাই হিন্দুশাস্ত্র পদার্থ মাত্রেরই আত্মা স্বীকার করিয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে মানব অসৎ কার্য্যফলে কীট, কৃমি, উদ্ভিদাদি যোনি প্রাপ্ত ও শাপ বশতঃ প্রস্তর ও জলাদি জড়রূপে পরিণত হয় এবং বৃক্ষের পল্লব ভঙ্গ করিলে হিংসা জন্য পাপ জন্মে।

আমাদের বোধ হয় হিন্দুদিগের এই মতটীই সত্য। কেন না পূর্ব্বে সপ্রমাণ হইয়াছে আত্মা সচেতন হইলেও জড়সংসৃষ্ট ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে, যে কোনও পদার্থেরই সৃষ্টি বা নাশ নাই, কিন্তু সমস্ত জড় পদার্থই পরিবর্ত্তনশীল। যদি অবস্থা পরিবর্ত্তনকালে চৈতন্য বা আত্মা এককালে জড় দেহ ত্যাগ করিয়া যায়, তবে কে পরে সেই শক্তি-শূন্য জড়ের পরিবর্ত্তন কার্য্য সংসাধিত করে? জড়ের ত কোন শক্তি নাই। জলের বাষ্পে পরিণত হওয়াকে যদি মৃত্যু বলে, অর্থাৎ যদি জলয় বাষ্প চৈতন্য বা জলীয় শক্তি শূন্য হয়, তবে সে বাষ্প আবার জল হয় কি

প্রকারে? চৈতন্য হীন—শক্তি হীন বাষ্পে কে শক্তি প্রদান করে? অতএব কোন পদার্থেরই উৎপত্তি বা নাশ নাই। আমারও উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, আমি পূর্ব্বেও ছিলাম, পরেও থাকিব, অবস্থান্তর হইবে মাত্র। মৃত্যু হইলে আমার দেহ মৃত্তিকা জল বায়ু প্রভৃতিতে পরিণত হইবে বটে, কিন্তু জলীয় বাষ্প হইতে জলের ন্যায় তাহা হইতে আর একটী দেহ সমুৎপন্ন হইবে। তাহাই আমার অবস্থান্তর প্রাপ্ত পরকাল। ঐরূপ যে পদার্থ হইতে আমার বর্ত্তমান দেহ গঠিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে যে দেহরূপে বর্ত্তমান ছিল, তাহাই আমার পূর্ব্বজন্ম। কিন্তু পূর্ব্বে কি ছিলাম ও পরে কি হইব তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমার এই দেহ হইতে উদ্ভিদ্ জন্মিতে পারে, কীট বা পতঙ্গ জন্মিতে পারে, পশু বা পক্ষী জন্মিতে পারে এবং মানবও জন্মিতে পারে। যদি আমি পুনরায় মানব হই, তাহা হইলে যদিও তখন বুঝিতে পারিব না যে, পূর্ব্বে আমি কি ছিলাম, কিন্তু সে যে এই আমি তাহাতে আর সন্দেহ কি? যদি আমি ভবিষ্যতের জন্য জগতের কোন উপকার করিয়া যাই এবং মদ্দেহোৎপন্ন অবস্থান্তর প্রাপ্ত প্রাণী যদি তাহার ফল ভোগ করিতে পারে, তাহা হইলে সে যে আমার কার্য্যের ফল আমারই ভোগ করা হইল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই আমি যাহা হইতে উৎপন্ন, সেই আমিও যখন তাহা হইতেই উৎপন্ন, এবং এই আমি যখন সুখকর বিষয় লাভে সুখী হই ও সে আমিও যখন সেইরূপ সুখী হইব, তখন এই আমাতে ও সে আমাতে কোন প্রভেদ নাই, সে আমারই পরকাল মাত্র। পরকালে মানব ভিন্ন অন্য জীবদেহ প্রাপ্ত হইলেও

তাহাতে আমার আমিত্ব থাকিবে। তাহা আমারই পরকাল। যদি আমি কখন পুনরায় মানব হই, তাহা যে কত কাল পরে হইব, তাহার নিশ্চয়তা কি? ইহার মধ্যে কতরূপ দেহ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহারই বা স্থিরতা কি? কিন্তু বোধ হয় মানব মরিয়া মানব হইবারই অধিক সম্ভাবনা। জলীয় বাষ্প হইতে জল জন্মিবারই অধিক সম্ভাবনা। ঈশ্বরের নিয়মানুসারে চলিলে আত্মার উন্নতিই হইয়া থাকে। তাই যত পৃথিবীর বয়স হইতেছে ততই মানবের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে অর্থাৎ জড়ের আত্মা উন্নত হইয়া উদ্ভিদ্ হইতেছে; উদ্ভিদের আত্মা কীট, পতঙ্গ হইতেছে; কীট পতঙ্গের আত্মা পশু, পক্ষী হইতেছে এবং পশুর আত্মা মানব হইতেছে। তাহা না হইলে মানবের সংখ্যা কি প্রকারে বৃদ্ধি হইবে? আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা ইহা বুঝিয়াই বলিয়াছেন অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া দুর্লভ মানব-দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার কার্য্য ও অবস্থা ভেদে এ নিয়মের ব্যত্যয় হইবারও সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ কর্ম্ম দোষে আত্মার অবনতিও হয়—মানব পরকালে পশু পক্ষী কীটাদি রূপেও জন্ম গ্রহণ করে।

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, স্বীকার করিলাম পদার্থের ধ্বংস নাই, যে পদার্থ হইতে আমি উৎপন্ন হইয়াছি, তাহা হইতে পদার্থান্তরের উৎপত্তি হইবে, কিন্তু যে সকল পদার্থের সম্মিলনে আমি উৎপন্ন হইয়াছি, সে সমস্ত যে পুনরায় মিলিত হইয়া দেহান্তর গঠিত হইবে, বিভক্ত হইয়া বহুতর দেহে যে যাইবে না, তাহার প্রমাণ কি? তাহা যদি হয়, তবে আমার পর জন্ম হইল কৈ? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি 'আমি' কাহাকে বলে?

দেহের সমস্তের সম্মিলনকেই কি আমি বলে? হস্তহীন আমি কি পদহীন আমি কি আমি নই? সর্ব্বসম্মিলনে ভিন্ন যদি আমি না হয়, তাহাহইলে স্থূল আমি যদি আমি হই, তবে কৃশ আমি আমি হইতে পারি না; বালক আমি যদি আমি হই, তবে যুবা আমি, আমি হইতে পারি না। কেন না স্থূল দেহে যে সকল রক্ত মেদাদি ছিল, কৃশ হইয়া তাহার অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং বালক কালে যে সকল রক্ত মাংসাদি ছিল তাহার অধিকাংশ বিষ্ঠা, মূত্র, প্রশ্বাসাদি দ্বারা বহির্গত হইয়া তৎস্থানে নূতন রক্ত মাংসাদি ভোজনাদি দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়াছে। নিয়তই শারীরিক পদার্থের পরিবর্ত্তন হইতেছে। যদি সমস্তই আমি পদ বাচ্য হয়, তবে এক মুহূর্ত্তও আমির অস্তিত্ব থাকে না। অতএব দেহস্থ সমস্ত পদার্থ আমি বাচ্য নহে, সুতরাং পরকালে আমিত্ব বজায় রাখিবার জন্য ইহকালীন দেহের সমস্ত পদার্থের একত্র সমাবেশ আবশ্যক নহে। আমি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। যে দিন গর্ভ মধ্যে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছি, সেদিন আমি যে সূক্ষ্ম অবয়বে উদিত হইয়াছি সে অবয়বের সহস্রাংশও আমি নহি; কেন না আমাতে যত শক্তি আছে সে সমুদায়েরই মূল যন্ত্র ঐ সূক্ষ্ম অবয়ব মধ্যে নিহিত ছিল। অতএব আমিবাচ্য যন্ত্র বা আত্মা নিতান্ত সূক্ষ্ম—ঐ সূক্ষ্ম আত্মা অনায়াসে দেহান্তর লাভ করিতে পারে। তাহা বিভক্ত হইয়া বহুতর দেহ উৎপন্ন করে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, জীব পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্যের ফল ভোগ করে কি না? আমাদের বোধ হয় করে। কেন না পূর্ব্ব জন্মে আত্মা যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ লাভ করে তাহা

যদি পরজন্মে না থাকে তাহা হইলে উদ্ভিদের আত্মা কি প্রকারে পর পর উন্নতি লাভ করিয়া মানবীয় আত্মা হয়? পূর্ব্বজন্মের উৎকর্ষতা স্থায়ী না হইলে কি প্রকারে ঐরূপ উন্নতি হয়? বিশেষতঃ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত মানবের সন্তানের আত্মা যখন উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইতেছে, তখন তাহার নিজের আত্মার উৎকর্ষতা নষ্ট হইবে কেন?

আর এক কথা এই যে, অনেক সময়ে আমরা দেখিতে পাই, অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি অশেষবিধ কৌশলে নিয়ত চেষ্টা করিয়াও কার্য্যের তাদৃশ ফল লাভ করিতে পারে না ও কত কত ব্যক্তি বিনা যত্নে বা সামান্য যত্নে, বুদ্ধির সাহায্য ভিন্ন, বিলক্ষণ ফল লাভ করে। কৃষ্ণপান্তি ছোলা বেচিয়া বড় লোক হইলেন এবং রামকান্ত এক জন সামান্য ব্যবসায়ীর প্রতিনিধিকে ক্ষণকালের নিমিত্ত আশ্রয় দিয়া বিখ্যাত ধনী হইলেন। ছোলা কি আর কেহ বেচে নাই, না আর কেহ কাহাকে আশ্রয় দেয় নাই? তবে ইঁহারা কেন এরূপ সামান্য কার্য্য করিয়া এরূপ অধিক ফল লাভ করিলেন? ইহা হইতে সহস্র গুণ চেষ্টা করিয়া অপরে কেন ইহার সহস্রাংশ লাভ পায় না? অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, সামান্য লোক কত কত সামান্য কারণে দেশবিখ্যাত হইয়াছেন এবং অনেক মহৎলোক সামান্য কারণে নিঃস্ব হইয়া গিয়াছেন! কয়েক জন মাত্র সেনা সমভিব্যাহারে ক্লাইব মহাপরাক্রান্ত সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজয় করিলেন কিন্তু মহাপরাক্রান্ত চিতোররাজ প্রতাপসিংহ অশেষ চেষ্টা করিয়াও যবনরাজ্যের কিছুই করিতে পারিলেন না। সামান্য কারণে

মলহার রাও রাজ্যচ্যুত ও বন্দী হইলেন, কিন্তু আলাউদ্দীন সহস্র দুষ্কর্ম্ম করিয়াও অক্ষুণ্ণ ছিলেন। এ সকলের কারণ কি? আমাদের বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে মানব যে বিষয়ে বিশেষ নিপুণতা লাভ করে, পরকালে সেই নিপুণতা তাহার স্বাভাবিকের ন্যায় থাকিয়া যায়; তাহার মর্ম্ম সে নিজে বা অপরে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মোহন্ত ছোলা বেচিল, কৃষ্ণপান্তি কিনিল; মোহন্ত ভাবিল ক্রমে ছোলার দর আরও কমিবে, কৃষ্ণপান্তি পূর্ব্বজন্মকৃত ব্যবসা-নিপুণ বুদ্ধি বলে বুঝিলেন পরে ছোলার মূল্য বাড়িবে। ইহাতেই মোহন্ত ছোলা বেচিল ও কৃষ্ণপান্তি ছোলা কিনিল। বোধ হয় ঐরূপ বুদ্ধিবলে রামকান্ত গবর্ণর জেনারলকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এবং ক্লাইব সাহেব সামান্য সৈন্য লইয়া সিরাজ-উদ্দৌলাকে আক্রমণ করিয়াছিল। আর্য্য পণ্ডিতেরা ইহাকে অদৃষ্ট বলেন।

আমরা আর এক প্রকার অদৃষ্ট দেখিয়া থাকি, তাহাকে সময় ও পড়তা বলে। অনেক সময়েই দেখা যায়, যে কাহারও ভাল হইতে আরম্ভ হইলে, সে সময়ে তাহার সকল দিকেই ভাল হয়; আবার যখন মন্দ হইতে থাকে তখন ক্রমাগতই মন্দ হয়। কিন্তু কি কারণে সেই ভাল মন্দের পড়তা হয় তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই। যাঁহারা অভিনিবেশ সহকারে তাস খেলিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, পড়তা কি। যে দিন যে দিকে তাসের পড়তা হয়, সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহা ভাঙ্গা যায় না। পড়তার দিকের খেলওয়ার নিতান্ত অজ্ঞ হইলেও জয়ী হয়েন ও পড়তা না হইলে অতিশয় ক্রীড়ানিপুণ ব্যক্তিকেও হারিতে হয়। দেখা গিয়াছে এক দিকে

তাসের পড়তা সময়ে সময়ে চারি, পাঁচ বা ততোধিক দিন থাকে। কখন কখন এক দিনেই পড়তা দুই তিন বার ভাঙ্গিয়া যায়। কোন দিন কোনও পক্ষেই পড়তা হয় না। ইহার কারণ কি? এই পড়তা আবার চেষ্টা করিলে হয় না, চেষ্টা করিলেও ভাঙ্গে না, বিনা চেষ্টায় হয় ও বিনা চেষ্টায় ভাঙ্গে। বত্রিশ খানি কাগজে ক্রমাগত খেলা করিয়া যখন তাহার পড়তার মর্ম্ম কিছুই বুঝা গেল না, তখন এই প্রকাণ্ড বিশ্ব ব্যাপারের পড়তার কারণ কি রূপে বুঝা যাইবে? ফলতঃ তাসের পড়তার ন্যায় আমাদের কার্য্যেরও পড়তা আছে। সেই পড়তার নামও অদৃষ্ট। এই পড়তা যে সময় হয়, তাহাকে সুসময় বলে ও যে সময় তাহা হয় না তাহাকে কুসময় বলে; ফলিত জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা তাহার কারণ স্বরূপে সুগ্রহ বা কুগ্রহের কার্য্য বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মত যে নিতান্ত অলীক তাহাও নিশ্চয় বলা যায় না। যেখানে কার্য্যের কারণ দৃষ্ট হয় না বা বুঝা যায় না সেই কারণকেই অদৃষ্ট (ন+দৃষ্ট) বলে। সুতরাং যেখানে মানব কারণ বুঝিতে অক্ষম হয়, সেইখানেই অদৃষ্ট বলিয়া নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু শেষোক্ত প্রকার অদৃষ্টের সহিত *পূর্ব্ব জন্মের কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে কি না বুঝিতে পারা যায় না।*

এতদ্ভিন্ন অন্য রূপ পরকাল অর্থাৎ স্বর্গ নরকাদি ভোগ আমাদের জ্ঞানের অগোচর। ঈশ্বর ও জ্ঞান প্রকরণ আলোচনা করিলে বিষয় আরও বিশদ হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বর।

ঈশ্বর কি? অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ কি ও তাঁহার কার্য্য কি? তাঁহাকে জানিবার আমাদের সাধ্য আছে কি না? যদি থাকে, তবে কি উপায়ে তাঁহাকে জানা যায়? মানবগণ যে নিয়ত ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন, তবে তাহার মর্ম্ম কি, অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কিন্তু তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, আমরা দেখিতে পাই, সকলেই বলেন ঈশ্বর মানবের জ্ঞানাতীত, মনুষ্য তাঁহাকে জ্ঞানযোগে পায় না। ঈশ্বর স্বয়ং মানবের জন্য গ্রন্থবিশেষ প্রণয়ন করিয়া দিয়াছেন, সেই গ্রন্থে তাঁহার স্বরূপ ও মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকল ব্যক্তিরই সেই গ্রন্থের মতানুসারে চলা উচিত। যিনি সেই গ্রন্থলিখিত ব্যবস্থার বিপরীতাচারী হইবেন, তিনি ঈশ্বরের ক্রোধভাজন হইয়া অনন্ত কাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পৃথিবীতে ঈশ্বরপ্রণীত গ্রন্থ একখানি নহে; অসংখ্য ঈশ্বরপ্রণীত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সম্প্রদায় আপনাদের গ্রন্থ বিশেষকেই ঈশ্বরপ্রণীত বলেন ও অন্য সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী ঈশ্বরপ্রণীত গ্রন্থ গুলিকে নাস্তিকতা বা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ কাল্পনিক বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। সুতরাং কোন্ খানি যে বাস্তবিক ঈশ্বর প্রণীত তাহা কিরূপে স্থির হইবে? যদি ঐ সকল

গ্রন্থের মতসকলের পরস্পর সামঞ্জস্য থাকিত, তাহা হইলেও কোনরূপে প্রকৃত পথের অনুসরণ করা যাইতে পারিত। কিন্তু সে সকলের সামঞ্জস্য থাকা দূরে থাকুক, তৎসমস্ত পরস্পর এত বিরুদ্ধভাবাপন্ন যে, তাহার একখানিকে প্রকৃত বলিলে, অপর সমস্তকেই ভ্রমপূর্ণ বলিতে হয়।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়গণের মধ্যে কেহ ঈশ্বরকে সাকার, কেহ নিরাকার, কেহ পুরুষ, কেহ প্রকৃতি, কেহ দ্বিভুজ, কেহ চতুর্ভুজ, কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ গৌরবর্ণ, কেহ ভক্তবৎসল, কেহ দীনবন্ধু, কেহ ত্রাণকর্ত্তা, কেহ ভূভারহারী ইত্যাদি নানা প্রকারে বর্ণনা করিয়া থাকেন। কেহ কহেন অহিংসা পরমধর্ম্ম, কেহ বলেন মনুষ্য ও পশুর শোণিত ঈশ্বরের অত্যন্ত প্রিয়। কেহ বলেন আতপতণ্ডুল, কদলী, পুষ্প প্রভৃতি তাঁহার পূজার প্রধান উপকরণ; কাহারও মতে অনন্যমনে ধ্যান করিলেই তিনি সন্তুষ্ট। কেহ বলেন নিকৃষ্ট জাতির অন্নগ্রহণ মহাপাপ, কেহ বলেন জাতিবিচার ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নহে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতিকে বিধর্ম্মী বলেন। তাঁহাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত তাঁহারা দেশে দেশে ধর্ম্মযাজক পাঠাইয়া থাকেন। যবনেরা আবার সকলকেই বিধর্ম্মী বলেন। যে পর্য্যন্ত বিধর্ম্মীরা তাঁহাদিগের ধর্ম্ম অবলম্বন না করে, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগের ধন, মান, প্রাণ, বিপুলকীর্ত্তি সকলই নষ্ট করেন। হিন্দুরা যদিও এ বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে পৈত্রিক ধর্ম্মে থাকিলে সকলেরই মুক্তি আছে, কিন্তু তাঁহারা স্বধর্ম্মত্যাগীদিগকে কদাচারী বলেন। এইরূপ সহস্র সহস্র সম্প্রদায় ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বরূপ ও

ভিন্ন ভিন্ন রূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্দ্দেশ করেন। কোনও সম্প্রদায়েরই পরস্পর মতের সামঞ্জস্য নাই। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই মতে বিধর্ম্মীরা চিরকাল নরকভোগ করিবে।

এক্ষণে আমরা কোন্ খানিকে প্রকৃত ঈশ্বরপ্রণীত বলিব? কোন খানির মত বাস্তবিক সত্য? কোন্ মত অবলম্বন করিলে আমাদের সত্য পথে চলা হইবে? কাহাকে প্রকৃত ঈশ্বর বলিব? যিশুখ্রীষ্টকে? মহম্মদকে? বিষ্ণুকে? না দুর্গাকে? কোন্ ধর্ম্মের মত তাঁহার প্রকৃত আজ্ঞা? কোন্ পথে চলিলে আমাদিগকে নিরয়গামী হইতে হইবে না? স্বর্গভোগ-সুখের বাঞ্ছা না করিলেও চলে, কিন্তু নরকভোগের আশঙ্কা না করিয়া ত থাকা যায় না। যিনি রুষ্ট হইলে আমাদিগের সর্ব্বনাশ, যাঁহার করুণাবলে আমরা আহার বিহার করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে বিরাজ করি, যাঁহার আজ্ঞা পালন না করিলে চিরকাল দুঃখ পাইতে হয়, যাঁহার উপাসনা করাই আমাদিগের মুখ্যকার্য্য, তাঁহাকে ও তাঁহার নিয়মাবলী না জানিলে চলিবে কেন? এই কারণেই ঈশ্বর সম্বন্ধীয় তর্কের অবতারণা ও দর্শন-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্র-প্রণেতাগণ ঈশ্বরের স্বরূপ ও কার্য্য নিরূপণ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাই চার্ব্বাকাদি দর্শন প্রণেতাগণ ঈশ্বরের সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন। অন্যান্য দার্শনিকগণ অনেক কূট তর্কের অবতারণা করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরের যে প্রকার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাস্তিত্বই প্রতিপন্ন হইয়াছে। কেননা প্রধান প্রধান দার্শনিকগণের মতে ঈশ্বর নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্গুণ

ও নির্লিপ্ত। সকল গুণগুলিই অভাব-বাচক। আকার নাই, গুণ নাই, অবস্থান্তর নাই, কার্য্য নাই, তবে ঈশ্বরের আছে কি? ঈশ্বর আছেন, অথচ তাঁহার অস্তিত্বব্যঞ্জক কোন লক্ষণই নাই; সুতরাং পাকতঃ ঈশ্বর নাই অথবা তাঁহাকে মানব-জ্ঞানের বহির্ভূত ও মানবের সহিত সম্বন্ধ-শূন্য বলা হইল।

এই জন্য দর্শনশাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা সপ্রমাণ না হইয়া বিপরীতই সপ্রমাণ হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়া লোকে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে ও দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র উভয় হইতে কিছু কিছু লইয়া নূতন প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঐরূপে প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি একবারে খিচুড়ি হইয়া উঠিয়াছে। তৎসমস্ত প্রমাণ ও বিশ্বাস উভয় সংশ্লিষ্ট হওয়ায়, উহার কিছুই সাব্যস্ত হয় নাই। নব ব্রাহ্মধর্ম্ম ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত। ব্রাহ্মগণ দার্শনিক যুক্তি ও ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় বিশ্বাস উভয়ই গ্রহণ করিয়াছেন; দর্শনমতে তাঁহারা ঈশ্বরকে নিরাকার নির্ব্বিকার ইত্যাদি বলেন, আবার ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় বিশ্বাসমতে বলেন, মানবগণ ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে এবং ঈশ্বরের উপাসনা ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যাদি না করিলে, ঈশ্বর পর-কালে তাহাদিগকে দণ্ডপ্রদান করেন। তাঁহারা বিশ্বা-সানুসারে ঈশ্বরের সত্তা নিরূপণ করেন এবং যুক্তি অনুসারে কর্ত্তব্য কার্য্য অর্থাৎ ঈশ্বরের আজ্ঞার বিচার করেন। তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে সহস্র উত্তম যুক্তি প্রদান করিলেও গ্রাহ্য করেন না, প্রত্যুত ঐ যুক্তিদাতাদিগকে নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করেন। ঈশ্বরপ্রণীতগ্রন্থবিশ্বাসীদিগের ন্যায় তাঁহাদেরও সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, তাঁহাদিগের এই অভিনব মত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা।

সুতরাং তাঁহাদিগের অবলম্বিত ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে মানবগণের নিস্তারের উপায়ান্তর নাই। অথচ দার্শনিক যুক্তি অবলম্বনে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে স্বধর্ম্মে আনয়নের চেষ্টা করেন।

অতএব যে সকল দর্শন ও ব্রাহ্মাদি ধর্ম্মশাস্ত্রসহপ্রণেতাগণ ধর্ম্মসকলের একতা সম্পাদন চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের দ্বারা তাহা সম্পন্ন না হইয়া নাস্তিকতারই সহায়তা হইতেছে। ধর্ম্মশাস্ত্র সকলও যে দর্শনশাস্ত্রসকলের ন্যায় মানবের মনঃকল্পিত তাহাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। কেন না, যুক্তিচক্ষে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মানবের যাহা জ্ঞানাতীত তাহার কল্পনাও মানব করিতে পারে না। তাই স্বর্গ বর্ণনকালে মানবগণ স্বর্ণঅট্টালিকা, হীরকস্তম্ভ, অমৃতময়ী নদী, চির-বসন্ত, শোক-দুঃখহীনজীব ইত্যাদি যাহা কিছু উৎকৃষ্ট অথচ জ্ঞানায়ত্ত তাহারই কল্পনা করিয়া থাকেন, জ্ঞানাতীত কোন বিষয়েরই উল্লেখ করিতে পারেন না। ঈশ্বরের বর্ণনাও তদ্রূপ। তাঁহারা বিশ্ব মধ্যে মানবকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেখিয়াছেন, ঈশ্বরকে সেই মানবীয় গুণ-সম্পন্ন করিয়াছেন। সেই গুণ গুলির আধিক্য বা অভাব কল্পনা করিয়াছেন, এই মাত্র প্রভেদ। সাকারবাদীরা মানবের ন্যায় ঈশ্বরের পুত্রকলত্র, ভোগৈশ্বর্য্য, বিপদসম্পদ, শত্রুমিত্র, আহারবিহার, রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি সমুদায়েরই কল্পনা করিয়াছেন। যে নিরাকারবাদীরা সাকারবাদীদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহারাও যে সম্পূর্ণ পৌত্তলিক, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। তাঁহারা মানবীয় শারীর-ধর্ম্ম ঈশ্বরে আরোপ করেন নাই বটে, কিন্তু মানসিক গুণ সকল অবিকল তাঁহাতে প্রদান করিয়াছেন। ইচ্ছা, প্রিয়াপ্রিয়জ্ঞান,

কৃতজ্ঞতাভিলাষ, তোষামোদপ্রিয়তা, দণ্ডপুরস্কারদানশীলতা, জ্ঞান প্রভৃতি সমুদায় মানবীয় মানসিক ধর্ম্ম গুলিই তাঁহাতে কল্পিত করিয়াছেন। এ সকল ঈশ্বরে থাকা সম্ভব কি না, তাহা একবারও বিবেচনা করেন নাই। যুক্তি মার্গানুসারে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে, যে, এ সকল গুণ ঈশ্বরে থাকা নিতান্ত অসম্ভব। আমরা একটী একটী করিয়া সে সকলের আলোচনা করিতেছি।

কোনও কার্য্যসাধনের পূর্ব্ব ভাবই ইচ্ছা; এই জন্য ইচ্ছা হইলেই কার্য্যের চেষ্টা হয়। উদ্দেশ্য বিনা কখনও ইচ্ছা হইতে পারে না। মানব সুখাভিলাষী ও স্বার্থপর, অথচ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন নহে, এজন্য মানবের অন্তরে কোন না কোন স্বার্থ থাকে ও তাহা পূরণের ইচ্ছা জন্মে। ঈশ্বরের কি উদ্দেশ্য আছে যে, তাহা সফল করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইবে? যখন সমুদায়ই তাঁহার, যখন তাঁহার কিছুরই অভাব নাই, তখন তাঁহার কোন স্বার্থও নাই, তৎসাধনের ইচ্ছাও নাই। ঈশ্বরকে সুখাভিলাষী এবং সেই সুখ প্রাপ্তি তাঁহার ক্ষমতাধীন নয়, একথা না বলিলে আর তাঁহার ইচ্ছা আছে বলা যায় না। কিন্তু তাহা বলিতে গেলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব কোথায় থাকে? তিনি কিসের কাঙ্গাল? কোন্ বিষয় তাঁহার প্রার্থনীয় এবং কে তাঁহার প্রার্থনা পূরণে বাধা দিতেছে? বিশেষতঃ ইচ্ছা প্রভৃতি সমস্তই সাকার ধর্ম্ম, ঐ সকল ধর্ম্ম ঈশ্বরের আছে বলিলে, তাঁহাকে সাকার বলিতে হয়; নচেৎ 'মাথা নাই তার মাথা ব্যথা' বাক্যের ন্যায় অসম্ভব হইয়া পড়ে।

মানবের যাহা স্বার্থের অনুকূল তাহাই তাহার প্রিয়, এবং যাহা তাহার স্বার্থের বিরোধী তাহাই তাহার অপ্রিয়। ঈশ্বরের যখন

স্বার্থ নাই তখন তাঁহার প্রিয়াপ্রিয় কি ? যদি তাঁহার প্রিয়াপ্রিয় থাকিত, তাহা হইলে তিনি কেবল প্রিয় পদার্থেরই সৃষ্টি করিতেন, অপ্রিয় বিষয় কখনই সৃষ্টি করিতেন না। দুধকলা দিয়া কখনও সাপ পুষিতেন না। যদিও তিনি অপ্রিয় বিষয়ের সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে কোন্ বিষয় তাঁহার প্রিয় ও কোন বিষয় অপ্রিয় তাহা অবশ্য আমাদিগকে বলিয়া দিতেন। কেননা যখন তাঁহার প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠানই আমাদিগের কর্ত্তব্য ও তাঁহার অভিপ্রেত সুখকর, তখন তাহা আমাদিগকে বলিয়া দেওয়া তাঁহার নিতান্ত উচিত। কিন্তু তিনি তাহা আমাদিগকে বলিয়া দেন নাই। যদি বলিয়া দিতেন, তাহা হইলে তুমি যাহাকে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বল, আমি তাহাকে তাঁহার নিতান্ত অপ্রিয় বলিতাম না। কেহ বলেন জীবহিংসা ঈশ্বরের অপ্রিয় (কেননা সকল পদার্থই তাঁহার সৃষ্ট, সুতরাং তৎ-সমুদায়েরই রক্ষা করা তাঁহার ইচ্ছা)। কেহ বলেন জীবহিংসা তাঁহার অভিপ্রেত, নতুবা ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু ছাগাদিকে বিনাশ করিত না। এইরূপে দেখা যায় ঈশ্বরের প্রিয়াপ্রিয় সম্বন্ধে জগতে সহস্র সহস্র বিপরীত মত প্রচলিত আছে। অপ্রিয় যখন ঈশ্বরের কষ্টদায়ক তখন কেন তিনি নিয়ত অপ্রিয় পদার্থ দ্বারা নিয়ত কষ্ট ভোগ করিতেছেন ?

মনুষ্য মধ্যে যাহারা সমাজের বা আপনার বিঘ্নকারী তাহারা দুষ্ট এবং যাহারা হিতকারী তাহারা শিষ্ট। দুষ্টের দ্বারা আমাদের অনিষ্ট হয়, এই জন্য আমরা তাহাদের দমন করি এবং শিষ্টের দ্বারা আমাদের উপকার হয়, এজন্য তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ পুরস্কার দিই। কিন্তু ঈশ্বর দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন কেন ?

আমাদের দ্বারা তাঁহার কোনও হিতাহিত হইতে পারে না। যদি বল বিশ্বের হিতোদ্দেশে দণ্ডাদি দান করেন, তাহাও অসম্ভব। কেননা শিষ্ট দুষ্ট সকলই তাঁহারই সৃষ্ট। দুষ্ট যদি তাঁহার অভিপ্রেত না হইত, তাহা হইলে কখনও তিনি দুষ্টের সৃষ্টি করিতেন না। যখন তিনিই দুষ্টের সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন দুষ্টের দণ্ড দেওয়া তাঁহার নিতান্ত অসম্ভব।

অনেকে বলেন ঈশ্বর দুষ্টের সৃষ্টি করেন নাই, মানবগণ আপনারাই তাঁহার অনভিপ্রেত কার্য্য করিয়া দুষ্ট হয়; কিন্তু একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। কারণ তাহা হইলে মানবকে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষ শত্রু শয়তান বলিতে হয়, সুতরাং ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা, সকলে ভাল হউক ও সুখে থাকুক, মানব তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দিল না; ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কোথায় রহিল? মানব ঈশ্বরকে পরাস্ত করিল। ঈশ্বর মৃত্যু অন্তে তাহাকে দণ্ড দিতে পারেন, কিন্তু জীবিত মনুষ্যের নিকট তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, মানব এই ঈশ্বর-বিজয়িনী শক্তি কোথায় পাইল? মানব যখন ঈশ্বরের সৃষ্ট, তখন এই ঈশ্বরাজ্ঞা ভঙ্গকারিণী শক্তি কি সেই ঈশ্বর হইতে পায় নাই? মানবের নিজস্ব কি কিছু আছে? বুদ্ধি, বিবেক, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি মানসিক শক্তি সকল কি মানব নিজে আনিয়াছে? যদি না হয়, যদি সমুদায়ই ঈশ্বরদত্ত হয়, তবে ঈশ্বরদত্ত শক্তি অনুসারে কৃতকার্য্যের জন্য মানব দণ্ডিত বা পুরস্কৃত হইবে কেন? মানব যে প্রবৃত্তি অনুসারে দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে প্রবৃত্তি যখন ঈশ্বরদত্ত তখন তজ্জন্য মানবের দায়িত্ব কোথায়?

কেহ কেহ বলেন যে, ঈশ্বর মানবকে দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেন নাই, তিনি মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিয়াছেন মাত্র ; মনুষ্য সেই স্বাধীনতার অপব্যবহারে যে দুষ্কর্ম্ম করে, তাহার জন্য মনুষ্যই দোষী। কেন না সে চেষ্টা করিলে ভাল কর্ম্ম করিতে পারিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর আমাদিগকে যে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম কি? ইচ্ছামত কার্য্য করার শক্তিকে অবশ্য স্বাধীনতা বলে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে,ঈশ্বর আমাদিগকে বলিয়াছেন যে "তোমরা ভাল মন্দ বা যাহা ইচ্ছা করিতে পার, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই"। যদি এরূপ বলিয়া থাকেন তবে তিনি ভাল কার্য্যের পুরস্কার ও মন্দ কার্য্যের দণ্ড দিবেন কেন? তাহা হইলে আর স্বাধীনতা দেওয়া হইল কৈ? আমি যদি তোমাকে বলি, তুমি আমার কথা শুন বা না শুন তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই ; এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ তোমাকে স্বাধীনতা দিতেছি ; কিন্তু যদি আমার কথা শুন তাহা হইলে তোমাকে ভাল বাসিব নচেৎ তোমাকে বিলক্ষণ প্রহার করিব। তুমি আমার কথা শুনিলে না, আমি চমৎকার এক লগুড় প্রহার করিলাম। দেখ আমি তোমাকে কেমন স্বাধীনতা দিলাম! ঈশ্বর কি আমাদিগকে ঐরূপ স্বাধীনতা দিয়াছেন? যদি সেরূপ হয়, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে তিনি অসৎ কার্য্যের দণ্ড ব্যবস্থা করিয়াছেন, অথচ আমাদিগকে অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবার উপযোগী কোন রূপ দৃঢ় উপায় ব্যবস্থা করেন নাই। এরূপ অবস্থায় ঈশ্বর আমাদিগকে দণ্ড দিলে, দণ্ড দেওয়াই যে, তাঁহার নিতান্ত অভি-প্রেত তাহাই বুঝায়। মানবের প্রতি তাঁহার এত কোপের কারণ কি? বিশেষতঃ তিনি যে দণ্ড দেন, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না

কেন? দণ্ডপুরস্কারদানের উদ্দেশ্য কি? শিক্ষাদানই কি দণ্ড পুরস্কারের উদ্দেশ্য নয়? কোন ব্যক্তি কোন দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইলে সে বুঝিতে পারে যে, এই কর্ম্ম করিয়াছিলাম তজ্জন্য দণ্ড পাইলাম, পুনরায় এরূপ কর্ম্ম করিব না। ঐরূপ সৎকর্ম্ম করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইলে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। অপর ব্যক্তিগণও তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সৎকর্ম্ম করিতে ও দুষ্কর্ম্ম না করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে যে দণ্ড বা পুরস্কার দেন তাহা কোন্ দুষ্কর্ম্ম বা কোন্ সৎকর্ম্মের জন্য তাহা কিছুই জানা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে দুষ্কর্ম্ম ও সৎ-কর্ম্মের লক্ষণ ও তাহার দণ্ড পুরস্কারের কথা লিখিত আছে সত্য, কিন্তু তাহা পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন। এক ধর্ম্মানুসারে যাহা সৎকর্ম্ম, অপর ধর্ম্মানুসারে তাহা নিতান্ত দুষ্কর্ম্ম। তাহার কোনটী সত্য জানিবার উপায় নাই। কোন কুকর্ম্মেরই আমরা প্রত্যক্ষ ফল উপলব্ধি করিতে পারি না। আহার না করিলে জীবন ধারণ হয় না, একথা যেরূপ কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হয় না, ক্ষুধা আপনিই আহারে প্রবৃত্তি জন্মায়; সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত ও কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য সেরূপ কোন বৃত্তি আমাদের হৃদয়ে নাই। সুতরাং কোন্‌টী সৎকর্ম্ম ও কোন্‌টী দুষ্কর্ম্ম তাহা কি প্রকারে জানিব?

কেহ কেহ ঐরূপ বৃত্তির (Conscience) সত্তা স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন ঈশ্বরদত্ত সেই মনোবৃত্তি দ্বারা আমাদের মনে কুকর্ম্ম করিলে গ্লানি ও সৎকার্য্য করিলে প্রসন্নতা জন্মে। আমরা বলি, সেটী কেবল আমাদিগের অভ্যাস ও সংস্কারেরর নিমিত্ত হইয়া থাকে। কেননা সামান্য মক্ষিকানাশে ধার্ম্মিক ব্যক্তির

মনে গ্লানি জন্মে, কিন্তু সহস্র মনুষ্য বিনাশেও দস্যু বা রাজার কষ্ট হয় না। ঔষধার্থে কিঞ্চিৎ সুরা পান করিলেও হিন্দু আপনাকে ধিক্কার দেন, কিন্তু ইংরেজ প্রভৃতি জাতি অহরহঃ মদ্য পান করিয়া আনন্দানুভব করিতেছেন। এইরূপ, যাহার যেরূপ সংস্কার ও শিক্ষা, তদনুরূপ কার্য্য নিমিত্ত মনের গ্লানি বা প্রসন্নতা জন্মে; তাহা সকলের সমান নহে, সুতরাং উহা ক্ষুধার ন্যায় প্রাকৃতিক বৃত্তি নহে। অষ্টম পরিচ্ছেদে ইহার বিবরণ করা হইল। কেহ কেহ বলেন, কুভোজনের ফল রোগ, শ্রমের ফল লাভ, দানের ফল যশঃ ইত্যাদি প্রত্যেক কার্য্যের ফল প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়। আমরা বলি তাহা নহে। কতকগুলি কার্য্যের কিছু কিছু ফল জানা যায় বটে, কিন্তু অসভ্য বন্যজাতিরা সে সকলের কিছুই জানে না বলিলেই হয়; সভ্যেরা নানা প্রকার বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া কিছু কিছু জানিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা নিতান্ত অল্প এবং তাহারও নিয়ত ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেননা দেখা যাইতেছে, কত লোক চির-কাল কুভোজন করিয়াও দীর্ঘজীবী হইতেছে, আবার কত লোক অতি সুনিয়মে আহারাদি করিয়াও চিররুগ্ন বা অকালে মানব-লীলা সম্বরণ করিতেছে। কেহ বিনা পরিশ্রমে অতুলৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইতেছে, কেহ বা দিবারাত্রি ভয়ানক পরিশ্রম করিয়াও উদরান্ন মাত্র সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। এইরূপ, অনুসন্ধান করিলে, কোন কার্য্যেরই দৃঢ় নির্দ্দিষ্ট একরূপ ফল দৃষ্ট হয় না। আবার অনেকে স্ত্রী-পুত্রাদির বিয়োগজনিত মহান্ ক্লেশানুভব করে, এবং দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হইয়া ভয়ানক কষ্ট দেয়। কিন্তু স্বকৃত কোন্ কার্য্যের ফলে—নিজকৃত কোন্

দুষ্ক্রিয়ার জন্য মানবগণ এ সকল অসহনীয় ক্লেশ পায়, অনুসন্ধান করিলে তাহার কিছুই জানিতে পারা যায় না। এই সকল বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কোন্ কর্ম্ম সৎ ও কোন্ কর্ম্ম অসৎ এবং কোন্ কর্ম্ম জন্য আমারা কোন্ দণ্ড বা কোন্ পুরস্কার পাই, তাহা জানিতে পারি এমত কোন স্বাভাবিক উপায় বা কোন রূপ মনোবৃত্তি আমাদের হৃদয়ে নাই; সুতরাং উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায়, ঈশ্বরের আমাদিগকে দণ্ড বা পুরস্কার দেওয়ার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না।

ঈশ্বর উপাসনাপ্রিয় অর্থাৎ যিনি তাঁহার গুণাবলী বর্ণনা করেন, পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি তুষ্ট হয়েন এবং যিনি তাহা না করেন, তাঁহার প্রতি রুষ্ট হয়েন। মনুষ্যমধ্যে ছোট বড় আছে ও মনুষ্যের আত্মাভিমান আছে, এই জন্য যে প্রশংসা করে তাহার প্রতি মানব অতিশয় তুষ্ট হয়। বড় হইবার ইচ্ছা মানবের নিতান্ত প্রবল, এজন্য সে যাহার মুখে শ্রবণ করে যে, তাহার সেই ইচ্ছা সফল হইয়াছে অর্থাৎ সে বাস্তবিক সমধিক গুণবান্ হইয়াছে, তাহার প্রতি সে তুষ্ট হয়; কিন্তু যে তাহার গুণবাদ না করে,তাহার প্রতি মানব রুষ্ট হয় না, যে নিন্দা করে তাহারই প্রতি রুষ্ট হয়। ঈশ্বর কিন্তু প্রশংসা না পাইলেই রুষ্ট হয়েন। মনুষ্য হইতেও তাঁহার নিজগুণানুবাদশ্রবণলালসা অধিক একথা কি রূপে বিশ্বাস করা যায়! তিনি কাহার উপর প্রভুত্বের অভিলাষ করেন? তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কে আছে? কি জন্য তাঁহার এত আত্মাভিমান? তিনি কি এত ক্ষুদ্রচেতা যে, প্রশংসা শুনিয়া গলিয়া যান? যে মনুষ্য আপন কর্ণে আপনার প্রশংসা শুনিতে ভাল বাসে, লোকে তাহাকে নিতান্ত

ক্ষুদ্রচিত্ত ও অহঙ্কারী বলিয়া ঘৃণা করে। ঈশ্বর কি তাহা হই-তেও ক্ষুদ্রচেতা ও আত্মাভিমানী? তিনি কি আত্মপ্রশংসা শুনিবার নিমিত্ত আমাদিগকে জগতে আনিয়াছেন? যদি তাহাই সত্য হয়, তবে পরমেশ্বর এই বিশ্ব কেবল মানবে পরিপূর্ণ করিলেন না কেন? পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, প্রভৃতি যে সকল জীব তাঁহার উপাসনা করে না, তাহাদের সৃষ্টি করিয়া-ছেন কেন? সকল পদার্থকেই মানব করিয়া এবং সেই মনুষ্য-দিগকে আহারাদি সর্ব্বপ্রকার চিন্তার দায় হইতে মুক্ত করিয়া কেবল তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত করিলেই ত পারিতেন।

আর একটী আশ্চর্য্য কথা এই যে, মনুষ্যকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে হইবে। অর্থাৎ হে ঈশ্বর! তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের সৃষ্টি করিয়াছ, আহারাদি প্রদান দ্বারা আমাদিগের জীবন রক্ষা করিতেছ, তোমার কৃপায় আমরা অশেষবিধ সুখ-জনক দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেছি, ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার কৃত উপকার স্বীকার করিতে হইবে, না করিলে তিনি নিতান্ত রুষ্ট হইবেন। তাহার কারণ কি? মনুষ্য পরের উপকার করিলে তাহার নিকট অপরকে কৃতজ্ঞ হইতে হয়; কারণ মনুষ্য, স্বার্থপর, নিজের সুখই তাহার উদ্দেশ্য, পরের সুখের প্রতি দৃষ্টি করা তাহার অনুগ্রহ, না করিলে কেহ তাহাকে দোষী বলিতে পারেন না। সুতরাং যে মনুষ্য আপনার অনিষ্ট করিয়া পরের উপকার করে, সে নিতান্ত অনুগ্রহ করে; তন্নিমিত্ত উপকৃত ব্যক্তির উপ-কারকের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া নিতান্ত উচিত। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন কি? তিনি আপনার কি ক্ষতি করিয়া আমাদের উপকার করেন? তাঁহার পরই বা কে?

আমরা ত তাঁহারই; আমাদের উপকারে যে তাঁহারই উপকার হয়। বিশেষতঃ তিনি আমাদের কি উপকার করেন? জন্ম দিয়া কি তিনি আমাদিগের কিছু উপকার করিয়াছেন? কখনই না। কেননা জন্ম না দিলে, আমরা জন্মিতাম না। আমাদিগের সত্তা মাত্রই হইত না, সুতরাং জন্ম লাভে উপকার কি জন্মের অভাবে অপকার কিছুই হইত না। আমাদিগের জীবন রক্ষা বা সুখ প্রদান করেন বলিয়াও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবার কোন কারণ নাই। কেননা আমরাও তাঁহার এবং আহার না করিলে যে আমরা মরিয়া যাই সে নিয়মও তাঁহার। আহার দেন, তাঁহার আমরা বাঁচিব, না দেন তাঁহার আমরা মরিব। তাহাতে তাঁহারই ক্ষতি, আমাদের কি? তাহাতে তাঁহারই কৃত কার্য্যের ধ্বংস হইবে। যদি আমরা তাঁহার সৃষ্ট না হইতাম, নিজে বা অপর কোন শক্তি হইতে উৎপন্ন হইতাম, আর তিনি আহারাদি প্রদান করিয়া আমাদিগকে বাঁচাইতেন ও সুখী করিতেন, তাহা হইলে অবশ্য আমাদিগকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে হইত। বোধ হয়, এই বিষয়ের সমন্বয় রক্ষা করিবার জন্য আর্য্য শাস্ত্রকারেরা ত্রিমূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছেন। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন ও শিব সংহার করেন। এমতে বিষ্ণুর নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া নিতান্ত উচিত; কেন না, তিনি খাইতে না দিলে ব্রহ্মার সৃষ্ট আমরা বাঁচিতাম না।

মানবের সুখই বা কোথায় যে তজ্জন্য মানব তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবে? জগতে ত কাহাকেই সুখী দেখা যায় না। কেহ অন্নের নিমিত্ত দিবারাত্রি লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে, কেহ রোগ যন্ত্রণায় অস্থির, কেহ পরমসুন্দরী স্ত্রী বা স্নেহাস্পদ পুত্রশোকে

কাতর, কেহ শত্রু কর্তৃক অপমানিত, কেহ গৃহাভাবে আশ্রয়-বিহীন, ইত্যাদি নানাপ্রকারে মানবগণ দিবানিশি যাতনা পাই-তেছে। যাঁহারা মহাসৌভাগ্যশালী বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও রোগ শোক প্রভৃতির কষ্ট হইতে মুক্ত নহেন। এমন মনুষ্যই জগতে নাই যাঁহার কিছু না কিছু কষ্ট নাই। আটটা পয়সার জন্য সমস্ত দিন সূর্য্যোত্তাপে মাটী কাটিতেছে, তাহাও সকল দিন জুটিতেছে না, তজ্জন্য কুলিরা কৃতজ্ঞ হইবে? না, সম্বৎসর রৌদ্রবাতাদি সহ্য করিয়া প্রাণান্তকর পরিশ্রম পূর্ব্বক শস্য বপনাদি করিয়া পরিশেষে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন কিছুই পাইতেছে না বলিয়া কৃষকেরা কৃতজ্ঞ হইবে? পেটের দায়ে দুর্গন্ধময় অপকারজনক কুৎসিত স্থান সকল পরিষ্কার করিতেছে বলিয়া ধাঙ্গড়েরা কৃতজ্ঞ হইবে, না বিষ্ঠা বহন করিয়া, জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে বলিয়া মেথরেরা কৃতজ্ঞ হইবে? দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইয়া প্রাণান্তকর কষ্ট পাইয়াছে বলিয়া উড়িষ্যাবাসীরা কৃতজ্ঞ হইবে, না প্রচণ্ড বাত্যাপীড়িত হইয়া গৃহদ্বারশূন্য হইয়াছে বলিয়া ডায়মণ্ডহারবারবাসীরা কৃতজ্ঞ হইবে? মহামারিতে জনশূন্য হইয়াছে বলিয়া গৌড়বাসীরা কৃতজ্ঞ হইবে, না আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ভস্মীভূত হইয়াছে বলিয়া নেপলস্‌বাসীরা কৃতজ্ঞ হইবে? মুসলমান ও ইংরাজদিগের পদলেহন করিতেছে বলিয়া আধুনিক আর্য্যেরা কৃতজ্ঞ হইবে, না ঔপনিবেসিক য়ুরোপীয়দিগের দ্বারা উৎসাদিত হইয়াছে বলিয়া আদিম আমে-রিকাবাসীরা কৃতজ্ঞ হইবে? চক্ষু নাই বলিয়া অন্ধ ও কর্ণ নাই বলিয়া বধির কৃতজ্ঞ হইবে, না বাক্‌শক্তি নাই বলিয়া মূক ও গমনোপযোগী পদ নাই বলিয়া খঞ্জ কৃতজ্ঞ হইবে? পরমেশ্বর

আমাদিগের সৃষ্টি করিয়া অনর্থক এইরূপ কষ্ট দিতেছেন সেই জন্য আমাদিগকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে হইব? যখন না খাটিলে আমরা খাইতে পাইনা, তখন তিনি কিরূপে আমাদিগকে আহার দিতেছেন? দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করিতেই যখন মানুষের সমুদায় সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, সুখের চেষ্টা করিবার কিঞ্চিন্মাত্রও অবসর থাকে না, তখন তিনি কিরূপে আমাদিগের সুখের ব্যবস্থা করিয়াছেন! হিন্দুরা ঈশ্বরের এই দোষ পরিহারের জন্য কহেন, মানবগণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কার্য্য-ফলে এ সকল কষ্টভোগ করে। কিন্তু পূর্ব্বজন্মে দুষ্কর্ম্ম করিল কেন? যে জন্মের পূর্ব্বে আর জন্মহয় নাই, সেই প্রথম জন্মে জীব দুষ্কর্ম্ম করিল কেন? সেবারকার দুষ্কর্ম্মের জন্য দায়ী কে?

ঈশ্বর মহাজ্ঞানী। কিন্তু জ্ঞান কাহাকে বলে? দেখিয়া শুনিয়াই জ্ঞান। বিশ্ব সম্বন্ধে যে যত অধিক জানিয়াছে, সে তত অধিক জ্ঞানী। শিশুরা বিশ্বের কিছুই জানেনা, তাই তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ। যত বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, তত অধিক দেখিতে শুনিতে পায়, ততই জ্ঞানী হইতে থাকে। মানবগণ নিতান্ত অল্পায়ু, তাহাদের চাক্ষুস জ্ঞান নিতান্ত অল্প। এজন্য পূর্ব্বে মনুষ্যেরা দেখিয়া শুনিয়া যে সকল জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন, সেই সকল লিপিবদ্ধবিষয় শিক্ষা করিয়া মানব অধিক জ্ঞানী হয়। অপরের জ্ঞাত বিষয় জানার নামই বিদ্যা-শিক্ষা। ফলতঃ বিশ্বের পদার্থ সকলের শক্তি ও কার্য্য জ্ঞাত হওয়া ভিন্ন শিক্ষা ও জ্ঞান আর কিছুই নহে। (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দেখ) কিন্তু ঈশ্বরের জানিবার বিষয় কিছুই নাই। যখন সকলই তাঁহার নিজের কৃত, তাঁহার কৃত নয় এমন কিছুরই যখন বিদ্যা-

মান নাই, তখন তাঁহার জ্ঞানেরও কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। অর্থাৎ যখন তাঁহার নিজত্ব ভিন্ন আর কিছুরই বিদ্যমানতা নাই, তখন তাঁহার জ্ঞাতব্যও নাই, জ্ঞানও নাই।

ঈশ্বর মঙ্গলময়। কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে সর্ব্বত্রই সমূহ অমঙ্গল বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্যাঘ্র মৃগ বধ করিতেছে. সর্প ভেক নাশ করিতেছে, কুম্ভীর মৎস্য আহার করিতেছে। অধিক কি, জীবপ্রধান মানবই পরস্পর দ্বন্দ্ব করিয়া বিনষ্ট হইতেছে। সর্ব্বদাই দ্বেষ, হিংসা, জিগীষা, জিঘাংসা প্রভৃতির পরতন্ত্র হইয়া মানবগণ পরস্পর কাহারও ধনাপহরণ করিতেছে, কাহারও দারগ্রহণ করিতেছে, কাহারও প্রাণবধ করিতেছে, কাহারও গৃহদগ্ধ করিতেছে। বলোন্মত্ত হইয়া এক দেশবাসীরা অন্য দেশবাসীদিগকে অধীনে আনিবার নিমিত্ত কত নরহত্যা, কত ধননাশ ও কত মহান্ কীর্ত্তি সকল নিপাতিত করিতেছে। ইতিহাস পাঠে ইহার অজস্র উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চাক্ষুস প্রত্যক্ষ দ্বারাও অহরহ অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। এই কি মঙ্গলময় ঈশ্বরের কার্য্য ?

ঈশ্বরের কৌশল সকল অতি চমৎকার। কিন্তু সুকৌশল কাহাকে বলে? যে কৌশল অবলম্বন করিলে সকল দিকেই ভাল হয়, কোন প্রকারেই মন্দ হয় না, তাহাকেই অবশ্য সুকৌশল বলিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের কোন্ কৌশল বা কোন্ নিয়ম ঐরূপ দোষশূন্য? কোনও কৌশলেই দোষের ভাগ অধিক ভিন্ন অল্প নহে। আমাদিগের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত? কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন অর্থাৎ যে ক্ষুধা দিয়া জীবমাত্রকে আহারে রত করিয়াছেন সেই ক্ষুধাই আমাদিগের প্রভেদ

মৃত্যুর কারণ। আহারে যেমন সুখ, অনাহারে তাহা হইতে অধিক কষ্ট। আবার কুদ্রব্য বা অতিরিক্ত ভোজনে পীড়া জন্মে। আমাদিগকে সংসারে আসক্ত করিবার জন্য যে স্নেহ ও প্রণয় দিয়াছেন, তাহাই আবার, বৈরাগ্যের কারণ। প্রণয়ী বা স্নেহস্পদের মিলনে যে সুখ, তাহাদের বিরহে তাহা হইতে অধিক দুঃখ। পুত্র জন্মিলে যত সুখ না হয়, মরিলে তাহা হইতে অনেক পরিমাণে দুঃখ হয়। যে জল বায়ু, আতপ ব্যতিরেকে আমাদিগের জীবন রক্ষা হয় না, তাহারাই আমাদের পরম-শত্রু। এইরূপে দেখা যায়, ঈশ্বরের কৌশলমাত্রই দোষযুক্ত। এমন কৌশলই দৃষ্ট হয় না, যাহা দোষস্পর্শশূন্য। তবে তাঁহাকে কিরূপে সুকৌশলী বলা যায়!

আশ্চর্য্য এই যে, যে সকল গুণ ঈশ্বরে আরোপ করা হইয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য নাই। ঈশ্বর করুণাময়, ইচ্ছাময় ও সর্ব্বশক্তিমান্। যখন জীবগণ অহরহ নানাবিধ কষ্ট পাইতেছে, তখন তাঁহাকে কি রূপে করুণাময় বলা যায়? যখন তিনি ইচ্ছাময় ও সর্ব্বশক্তিমান, অর্থাৎ তিনি যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, তখন মনে করিলে জীবগণ যাহাতে দুঃখ না পায় সেরূপ উপায় নিশ্চয়ই করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা যখন করেন নাই, তখন হয় তাঁহাকে দয়াহীন, না হয় সর্ব্বশক্তিহীন বলিতে হইবে। কিছুতেই তিনি এই উভয়গুণের অধিকারী হইতে পারেন না।

ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ ও শুভাশুভ ফল-দাতা। যখন ভবিষ্যৎ কি[য়] ঈশ্বরের জ্ঞান আছে, তখন যাহা ঘটিবে, তাহা নিশ্চিত। তাঁহ[া] নিশ্চয়তা না থাকিলে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান হইতে পারেনা।

কল্য হরি রামকে মারিবে কি না তাহার যদি নিশ্চয়তা না থাকে, তবে তৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ জ্ঞান হইতে পারে না; সুতরাং তাঁহাকে ত্রিকালজ্ঞ বলা যায় না। যদি ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ হয়েন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, হরি রামকে হয় মারিবে নাহয় মারিবে না, ইহার একটী নিশ্চয়তা অবশ্য আছে। ঘটনাবলীর এরূপ নিশ্চয়তা থাকিলে, মনুষ্য তাহার অন্যথা করিতে পারে না। যাহা ঘটিবে, তাহা ঘটিবেই, ঈশ্বর তাহা জানিতেছেন; সুতরাং তদ্বিপরীতে মনুষ্যের সহস্র চেষ্টা বিফল; কাযেই মনুষ্য শুভাশুভ ফলের অধিকারী নয়। যাহা দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হইবে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, চেষ্টা করুক আর না করুক তাহা দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইবেই হইবে। অতএব ঈশ্বর যদি ত্রিকালজ্ঞ হন, তবে শুভাশুভ ফলদাতা নহেন, অথবা যদি শুভাশুভ ফলদাতা হয়েন অর্থাৎ কার্য্য মাত্রেই যদি মনুষ্যের স্বাধীনতা থাকে, তাহার চেষ্টায় শুভ বা অশুভ হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি ত্রিকালজ্ঞ নহেন। কেন না যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহা মনুষ্যেরই ক্ষমতাধীন, মনুষ্য কি করিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ জ্ঞানও নাই।

ঈশ্বর সমদর্শী অথচ ভক্তবৎসল। ভক্তবৎসল বলিলে অবশ্য অভক্তকে ভাল বাসেন না বুঝায়; তবে তাঁহাকে কিরূপে সমদর্শী বলা যায়? তিনি সমদর্শী অর্থাৎ সর্ব্বজীবে তাঁহার সমান দৃষ্টি। তবে বিশ্বে এত ভেদ কেন? কেহ নর, কেহ কীট কেন? কেহ রাজা কেহ প্রজা কেন? কেহ ধনী কেহ নির্ধন কেন? কেহ বলবান্, কেহ দুর্ব্বল কেন? কেহ বুদ্ধিমান্, কেহ নির্ব্বোধ কেন? কেহ রূপবান্, কেহ কদাকার কেন? যদি বল এপ্রভেদ

মনুষ্যের স্বীয় কার্য্য দোষে, তাহা হইলে মনুষ্যকে স্বাধীন বলিতে হয়, সুতরাং ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ নহেন। আবার ঐ স্বাধীনতা যদি ঈশ্বরদত্ত হয়, এবং সমদর্শিত্ব হেতু যদি তিনি সকলকে সম পরিমাণে বল, বুদ্ধি, শক্তি, স্বাধীনতা প্রভৃতি দিয়া থাকেন, তবে সকলে সমান হয় না কেন? যদি ভিন্ন পরিমাণে দিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সমদর্শিত্ব কোথায়?

ঈশ্বর নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। আকারহীন, গুণহীন, ভাবান্তর বিহীন ও কর্ম্মশূন্য পদার্থ বা কিছু সম্ভবই হইতে পারে না; যদি পারে তাহা হইলে তাহা দ্বারা কোনও কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর নির্ব্বিকারাদি গুণসম্পন্ন হইলে, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা বা পূর্ব্বোল্লিখিত রূপ সেবাতোষ, করুণানিধান, স্বর্গ-নরকবিধাতা প্রভৃতি কোন গুণসম্পন্ন হইতে পারেন না। আর যদি তিনি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়াদিকর্ত্তা হয়েন, তবে নির্ব্বিকারাদি হইতে পারেন না।

এই সকল বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রচলিত গুণসম্পন্ন ঈশ্বর মানবের মনঃকল্পিত। কল্পিত না হইলে, মানবে নাই, অন্ততঃ এমত একটী গুণও তাঁহাতে লক্ষিত হইত। ফলতঃ মানব যখন দেখিলেন, যে, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে, তখন ভাবিলেন, যে, বিশ্বরূপ কার্য্যেরও অবশ্য কারণ আছে। সেই কারণেরই নাম ঈশ্বর হইল। ঐ ঈশ্বর জ্ঞানদ্বারা পাওয়া গেলনা বলিয়া তাঁহাকে জ্ঞানাতীত বলা হইল। ঈশ্বরের গুণগুলি যে কল্পনা সম্ভূত তাহা এই কথাতে আরও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। কেন না যিনি জ্ঞানাতীত, তাঁহার গুণ মানব কি প্রকারে জ্ঞাত হইল? যদি তাঁহার গুণই জানা গেল, তবে তাঁহাকে জানা

হইল না কি প্রকারে? যদি গুণ জানার নাম জানা না হয়, তবে ত আমরা কিছুই জানি না, তাহা হইলে জড়পদার্থও আমাদের অজ্ঞেয়। কেন না জড়ের গুণ (Properties) ভিন্ন আর কিছুই জানা যায় না।

এই সকল তর্ক করিয়াই নাস্তিকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু নাস্তিকদিগের এই মীমাংসা নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক। কেননা স্বেচ্ছাজন্মপরিগ্রহ প্রভৃতির উপযোগী শক্তি-শূন্য আমি আছি, তুমি আছ. ও অনন্ত পদার্থ আছে, অথচ ঈশ্বর নাই, একথা একান্ত অর্থহীন। এ সমস্ত কি আপনা আপনি হয় ও আপনা আপনি যায়? আমি তুমি কি স্বেচ্ছাবশতঃ আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি ও স্বেচ্ছাবশতঃ আপনা হইতে যাইব? অবশ্য কখনই না। তবে কে আমা-দিগকে আনিল ও কে আমাদিগকে লইয়া যাইবে? যদি বল প্রকৃতিই সমস্তের মূল, কিন্তু প্রকৃতির অর্থ কি? কাহার প্রকৃতি হইতে হয়? আপনি কি মনে করেন, এই সকল ভূতের ব্যাপার কেবল ভূতেরই ব্যাপার? তাহা যদি ভাবিয়া থাকেন, তবে নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়াছেন। কোনও ভূতেরই স্বশক্তি কিছুই নাই।

এ কথার এই তর্ক উঠিতে পারে যে, বিশ্ব কি প্রকারে হইল ও কি প্রকারে রক্ষিত হইতেছে, কেবল এইকথার মীমাংসারজন্য যদি ঈশ্বরের কল্পনা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ত আবার ঈশ্বর কি প্রকারে হইলেন তাহারও কারণজ্ঞান আব-শ্যক হইবে। যদি অনবস্থা দোষ পরিহার করিবার জন্য কল্পিত ঈশ্বরকে অনাদি অনন্ত বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে

বিশ্বকেইত সেইরূপ অনাদি অনন্ত বলিলেই চলে। কল্পনার প্রয়োজন কি? বিশ্ব যে অনাদি অনন্ত তাহা ত সপ্রমাণ হইয়াছে। অনাদি অনন্ত বস্তুর আবার সৃষ্টি কি?

একথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কেবল উহাই ঈশ্বরানুসন্ধানের একমাত্র কারণ নহে। অনিত্য হইতে নিত্য অন্বেষণ করাই ঈশ্বরানুসন্ধানের মূল কারণ। আমরা যাহা যাহা দেখিতে পাই তৎসমস্তই অনিত্য অথচ সমস্তই নিত্যসম্বদ্ধ; সেই নিত্যাবস্থা ঈশ্বর ও অনিত্যাবস্থা বিশ্ব। সুতরাং ঈশ্বর ও বিশ্ব স্বতন্ত্র না হইয়াও ভিন্ন। অগ্নি ও দাহিকাশক্তি যেরূপ ভিন্ন, জল ও শৈত্য যেরূপ ভিন্ন, চুম্বক ও আকর্ষণ শক্তি যেরূপ ভিন্ন, জড় ও চৈতন্যে যেরূপ ভিন্ন, সেইরূপ ভিন্ন।

"সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্য বেদনাৎ।
তদভাবাত্ততোঽন্যেতু কথ্যন্তে ব্যষ্টি সংজ্ঞয়া॥" পঞ্চদশী

মানবের আত্মা যেরূপ আমি বাচক, বিশ্বের আত্মা সেইরূপ ঈশ্বরবাচক। এইজন্য ঈশ্বরের নাম পরমাত্মা। আত্মা যেমন মানব হইতে স্বতন্ত্র নহে, বিশ্বাত্মা ঈশ্বরও সেইরূপ বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র নহেন। এই জন্যই হিন্দু শাস্ত্রের মতে ঈশ্বর সর্ব্ব ভূতে নিয়ত বর্ত্তমান, সমস্ত পদার্থই ঈশ্বরের অংশ এবং আমি ও ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়॥

"অস্তি ব্রহ্মেতিচেৎবেদ পরোক্ষজ্ঞানমেবতৎ।
অহং ব্রহ্মেতিচেদ্বেদ সাক্ষাৎকারঃ সউচ্যতে॥
তৎসাক্ষাৎকারসিদ্ধ্যর্থমাত্মতত্বং বিবিচ্যতে।
যেনায়ং সর্ব্বসংসারাৎ সদ্য এব বিমুচ্যতে॥

কূটস্থো ব্রহ্মজীবেশাবিত্যেবং চিচ্চতুর্বিধা।
ঘটাকাশ মহাকাশৌ জলাকাশাভ্রখেযথা ॥” পঞ্চদশী

এ বিষয়ে আরও বিশদ করিতে হইলে স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন। মৎপ্রণীত ‘ধর্ম্মবিজ্ঞান’ নামক পুস্তক দেখিতে অনুরোধ করি। নিম্নে একটী স্তোত্র দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ একটু বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

স্তোত্র।

“নমস্যামো দেবান্ ননু হতবিধেস্তেঽপি বশগাঃ।
বিধির্ব্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়ত কর্ম্মৈক ফলদঃ ॥
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা।
নমস্তৎ কর্ম্মেভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি ॥”

হে বিশ্বাত্মন্ বিশ্বময় পরমপিতঃ পরমেশ্বর! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে ভগবতি বিশ্বজননি অনাদ্যা শক্তি! আমি তোমাকে নমস্কার করি। যদিও আমি তোমা হইতে ভিন্ন নই, তথাপি আমি তোমার মহিমা বর্ণন করিব। তুমি স্তবে তুষ্ট না হইলেও আমি তোমার স্তব করিব। হে দেবি বিশ্বশক্তি! তুমি একবার সরস্বতী রূপে আমার জিহ্বাগ্রে বাস কর; আমি তোমার স্বরূপ বর্ণনা করিব। তুমি যেমন রমণীর শিরোমণি, সেইরূপ পুরুষের মধ্যেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তোমার বিরাটমূর্ত্তি চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। হে বিশ্বরূপি ব্রহ্ম! প্রত্যেক পৃথিবী তোমার পদ, চন্দ্র সূর্য্য তোমার নয়ন, আলোক তোমার

বর্ণ, বায়ু তোমার শ্বাস, আকাশ তোমার ব্যাপ্তি, গ্রহ নক্ষত্র সকল তোমার রোমকূপ এবং শক্তি তোমার প্রাণ। তোমার বিশ্বদেহের তুলনা নাই। তুমি বিশ্বের স্রষ্টা, সুতরাং ব্রহ্মা; তুমি বিশ্বের পাতা, সুতরাং বিষ্ণু এবং তুমি বিশ্বের নাশক, সুতরাং শিব। প্রণব তোমারই বাচক। তুমি সকল দেব হইতে উচ্চ, সুতরাং মহাদেব; তুমি দুর্গ হইতে রক্ষা কর, সুতরাং দুর্গা; এবং ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে বিরাজ কর, সুতরাং করাল-বদনা কালী। "তুমি চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র; তুমি ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ; তুমি বুদ্ধি, ধৃতি, স্মৃতি, মেধা; তুমি লজ্জা, শান্তি, দয়া, শ্রদ্ধা; তুমি দিক্, দেশ, কাল; তুমি তড়িৎ, তাপ, আলোক; তুমি নদী, জল, প্রস্রবণ; তুমি যক্ষ, রক্ষ, দানব; তুমি সত্ত্ব, রজঃ, তম; তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান; তুমি লক্ষ্মী, সরস্বতী; তুমি স্থাবর, জঙ্গম; তুমি দিবা, রাত্রি; তুমি শরীর, তুমিই শরীরী; তুমি স্রষ্টা, তুমিই সৃষ্ট; তুমি দ্রষ্টা, তুমিই দৃশ্য; তুমি শ্রোতা, তুমিই শ্রাব্য; তুমি পিতা, তুমিই পুত্র; তুমিও তুমি, আমিও তুমি। যাহা কিছু আছে, সকলই তুমি। তোমা ভিন্ন কিছুই নাই।" সুতরাং তোমার তত্ত্ব আর কে বুঝিবে?

তোমার আদিও নাই অন্তও নাই। তোমাভিন্ন আর কিছুই নাই। যখন তুমি এই বিশ্বের সংহার কর, তখনও তুমি পূর্ব্ববৎ সমগ্র বর্ত্তমান থাক। নরকুলতিলক মনু লিখিয়াছেন,—

"আসীদিদন্তমোভূত মপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্য মবিজ্ঞেয়ম্ প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥"

"প্রলয়কালে এই বিশ্ব অন্ধকারময় অবিজ্ঞেয় লক্ষণশূন্য অবস্থায় থাকে। সৃষ্টিকালে আবার সকল পদার্থ স্ব স্ব পূর্ব্ব-

শক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে থাকে।" এ সকলই তোমারই কার্য্য। কিন্তু হে বিশ্বময়! তুমি কি জন্য একবার সৃষ্টি কর ও কি জন্য আবার তাহা নষ্ট কর, তাহা আমরা কিছুই জানি না। তুমি সৃষ্টি করিতেছ, পালন করিতেছ, আবার সংহার করিতেছ। সেই নষ্ট পদার্থের আবার পুনর্জ্জন্ম দিতেছ, আবার তাহাকে মারিতেছ। তুমি কখনও আমাদিগকে হাসাইতেছ ও কখনও কাঁদাইতেছ। কিন্তু তুমি কেন জন্ম দাও, কেন নষ্ট কর, কেন হাসাও, কেন কাঁদাও, তাহা আমরা জানি না। তুমি জান কি না তাহাও আমরা জানি না। তোমার কোন অভিপ্রায় আছে কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তোমার ক্রীড়াপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা আছে কিনা, তাহা আমরা কি প্রকারে বুঝিব?

দেখা যাইতেছে, তুমি অসংখ্য প্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ, কিন্তু বিশেষপ্রণিধান পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে তোমার দুই প্রকার মাত্র কার্য্য দেখিতে পাই ;—তুমি কেবল ভাঙ্গিতেছ ও গড়িতেছ। জল ভাঙ্গিয়া বাষ্প করিতেছ এবং বাষ্প গড়িয়া জল করিতেছ। সমভূমিকে পর্ব্বত করিতেছ, আবার পর্ব্বতকে সমভূমি করিতেছ। মরুভূমিকে উদ্যান এবং উদ্যানকে মরুভূমি করিতেছ। পশুকে মনুষ্য এবং মনুষ্যকে পশু করিতেছ। এ সকলই ভাঙ্গা গড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভাঙ্গা গড়াই তোমার কাজ। জন্মমৃত্যু ভাঙ্গাগড়াভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি তুমি জ্ঞান সেই ভাঙ্গা গড়া হইতে উৎপন্ন। সেই ভাঙ্গা গড়া হইতেই তুমি আমি হইতেছি। কিন্তু তুমি কেন ভাঙ্গ, কেন গড়, তাহার কোনও প্রকার উদ্দেশ্য আছে কি না, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

হে শক্তিরূপিণি! তোমার অসংখ্য মূর্ত্তি সতত বিরাজ করিতেছে। তুমি যেমন নিরাকার, সেইরূপ তোমার অসংখ্য সাকারমূর্ত্তি অহরহঃ দীপ্যমান রহিয়াছে। বিশ্বের সমস্ত পদার্থই তোমার মূর্ত্তি। কখনও তোমার প্রশান্ত মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া আমরা আনন্দে পুলকিত হই, এবং কখনও তোমার ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হই। কখনও

"অতসী পুষ্প বর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ ভূষিতাং॥
সুচারুদশনাং দেবীং পীনোন্নত পয়োধরাং।
প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকাম প্রদাং শুভাং॥"

বলিয়া আমরা তোমাকে ধ্যান করি; আবার কখনও

"করালবদনাং ঘোরাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং।
সদ্যশ্ছিন্ন শিরঃখড়গ বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাং।
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীং।
কণ্ঠাবশক্তমুণ্ডালী গলদ্রুধির চর্চ্চিতাং।
কর্ণাবতংসতানীত শবযুগ ভয়ানকাং।
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসোন্মুখীং।
সৃকদ্বয়গলদ্রক্তধারা বিস্ফুরিতাননাং।
ঘোর রাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং।"

বলিয়া ধ্যান করি। এই দেখিতেছি, তুমি শান্তভাবে বিরাজ করিতেছ, মৃদুমন্দ বায়ু বহিতেছে, কোকিল মধুরস্বরে গান করিতেছে, গবাদি পশুসকল সুখে বিচরণ করিতেছে, যুবকদম্পতি বিশুদ্ধ প্রেমালাপ করিতেছে, নদীগণ মৃদুকলরবে সাগরো-

বেগে প্রবাহিত হইতেছে, সুগন্ধ ও সুদর্শন পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া অতুল শোভা বিস্তার করিতেছে, ময়ূর ময়ূরী সুন্দর পক্ষ বিস্তার করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে, নির্ম্মলাকাশে চন্দ্রিকা মোহিনী ক্রীড়া করিতেছে, যে দিকে দৃষ্টি করি সর্ব্বত্রই তোমার মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকি। মনে ভাবি, তুমি আমাদের সুখের জন্য নিয়তই ব্যস্ত রহিয়াছ। কিন্তু দেখিতে দেখিতে আবার তোমায় কিরূপ দেখি। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, নিবিড় অন্ধকারে আপনার শরীরটাপর্য্যন্ত দেখা যায় না, ভয়ঙ্কর বাত্যা প্রবল বেগে কড়মড়াইতেছে, বৃক্ষ সকল মড়মড় শব্দে ভাঙ্গিতেছে, গৃহসকল যেন রসাতলে নীত হইতেছে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, করকাঘাতে শরীর ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, বিদ্যুতালোকে চক্ষু ধাঁদিয়া যাইতেছে, অশনিপাতের শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে, চতুর্দ্দিকে মনুষ্যগণ হা হতোঽস্মি বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে, প্রণয়ীর মৃত্যুজনিত ক্রন্দনধ্বনিতে পৃথিবী বিদীর্ণ হইতেছে। যেদিকে দেখি সকলই ভয়ানক। তোমার এই সংহারমূর্ত্তি স্মরণ করিলেও ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তখন বোধ হয় যেন তুমি বিশ্বের সংহার সাধন করিতে বসিয়াছ। যেন ক্রোধে তোমার বিশ্বদেহ কম্পিত হইতেছে। কিন্তু জানি না, কিসে তোমার ক্রোধ হয় এবং কিসে ক্রোধের শান্তি হয়। এই দেখিতেছি শ্যামল শস্যক্ষেত্রসমূহে পৃথিবী সুশোভিত রহিয়াছে, আবার দেখি আভ্যন্তরীণ অগ্ন্যুৎপাতে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া শত শত গ্রাম ও নগর উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। এই দেখিতেছি স্রোতস্বতী কলকলরবে মধুর গান করিতে করিতে গমন করিতেছে,

আবার দেখি ভয়ঙ্কর বেগে জলপ্রবাহ উত্থিত হইয়া সমুদায় দেশ প্লাবিত করিতেছে। এই দেখিতেছি ভয়ঙ্কর শীতে শরীর অবসন্ন ও জড়সড় হইয়া অগ্নির নিকট বসিয়া রহিয়াছি, জলকে বিষবৎ স্পর্শ করিতে ভয় হইতেছে, আবার দেখি ভয়ানক রৌদ্রের তাপে শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে, প্রিয় অগ্নি বিষতুল্য হইয়াছে এবং বিদ্বিষ্ট জল সুখের সামগ্রী হইয়াছে। এই দেখিতেছি সুখাসীন মানব প্রিয় পরিজন, বয়স্য ও প্রণয়িণীর সহিত সহাস্যে মধুর আলাপ করিতেছে, পরোপকার ও পরহিত চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে, শত শত আশাকে হৃদয়ে বর্দ্ধিত করিতেছে, সতত আপনাকে অজর অমর করিবার চেষ্টা করিতেছে ; পরক্ষণেই দেখি তাহার সেই যত্নের দেহ চিতায় শায়িত ও অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভস্মাবশেষ হইতেছ, চতুর্দ্দিকে পরিজনেরা আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছে। এ সকলই তোমার রূপবৈচিত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ সকলের গূঢ় অর্থ কে বুঝিবে ? যদি আমরা তোমার তত্ত্ব বুঝিতে পারিতাম, তবে তোমাতে আমাতে কি কোন প্রভেদ থাকিত ?

তুমি যাহাকে যাহা দিয়াছ, সে তাহাই পাইয়াছে, যাহাকে যাহা দেও নাই সে তাহা পায় নাই। তুমি সিংহকে অসাধারণ বল, অশ্বকে দ্রুতগতি, ময়ূরকে সুন্দরশ্রী, কোকিলকে মধুরস্বর, অগ্নিতে তাপ, তুষারে শৈত্য, তড়িতে গতি, দীপকে উজ্জ্বলতা এবং মানবকে বুদ্ধি দিয়াছ ! তুমি যাহাকে যাহা দেও নাই, সহস্র চেষ্টা করিলেও সে তাহা পাইবে না। কাহার সাধ্য তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে। যে তাহার চেষ্টা করে, তদ্দণ্ডেই সে তাহার উপযুক্ত শাস্তি পায়। হে জগদাত্মিকে ! মানব তোমারই

সন্তান, তোমারই অঙ্গবিশেষ, তোমাহইতেই উৎপন্ন ও মরিয়া তোমাতেই লীন হয়; সুতরাং মানবের জন্ম জন্ম নহে, মৃত্যু মৃত্যু নহে।

হে বিশ্বময়! তুমি কাহারও কৃত তোষামোদ বাক্যে ভুলনা বটে, কিন্তু তোমার মহিমা গান করিলে জ্ঞানের উদয় হয়, মনের স্ফূর্ত্তি হয় ও সংসার জয় করা যায়, সুতরাং তোমার গুণাগুণের ফল আছে। জীবগণ আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, কার্য্যে, বিশ্রামে সকল সময়েই তোমার পূজা করিতেছে। তোমার পূজা করিতে কালাকাল ও স্থানাস্থান বিচার করিতে হয় না; যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই ও যখন ইচ্ছা তখনই তোমার পূজা করা যায়। হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান সকলেই তোমার নিকট সমান। তোমার সেবকদিগকে সাক্ষাৎ দেবতা পিতা, মাতা ও প্রণয়-পুত্তলি রমণী পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না, অথবা বিধর্ম্মী বন্ধুগণের বিশ্বস্ত ধর্ম্মকার্য্যে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতে হয় না। তুমি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, দুর্গা প্রভৃতির নামে নাম রাখিলে রাগ করনা এবং ব্রাহ্মণের আভিজাত্য চিহ্ন-স্বরূপ উপবীত ধারণে ক্ষুণ্ণ হওনা। হে পরাৎপর! তুমি স্তবে তুষ্ট বা নিন্দায় রুষ্ট হও না; সহস্র লোক একত্রিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে দিবানিশি তোমার নাম উচ্চারণ করিলে, মুদ্রিতনয়নে তোমাকে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আনিয়া, সহস্র দিন চিন্তা করিলে অথবা বহুবিধ মূল্যবান্ উপহার সহ ধূমধামে পূজা করিলেও তুমি সন্তুষ্ট হও না। কেন না তুমি ভোলানাথ বা আশুতোষ নও। তুমি সত্য স্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ ও ন্যায়পর। তুমি করুণাময় নও। যাহারা

তোমাকে করুণাময় বলে, তাহারা তোমার মহাশক্তির দুর্নাম ঘোষণা করে। যাহারা তোমাকে স্তবে তুষ্ট করিবার প্রয়াস পায়, তাহারা তোমাকে বালকের ন্যায় চঞ্চল ও অবিমৃষ্যকারী বিবেচনা করে—তোমার নির্ব্বিকার নামে বিকার জন্মাইয়া দেয়। যদি একেশ্বরবাদীরা পৌত্তলিকদিগকে অধার্ম্মিক বলিতে পারেন, তাহা হইলে, যাঁহারা তোমার ইচ্ছা প্রভৃতির কল্পনা করেন, তাঁহাদিগকেও অধার্ম্মিক বলিতে হয়। কিন্তু তোমার নির্ব্বিকারত্বগুণে তুমি কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হও না। হে জ্ঞানময়! তুমি দয়াময় নও বটে, কিন্তু নিষ্ঠুরও নও। কেন না, আমরা পদে পদে তোমার ক্ষমার পরিচয় পাইতেছি। যদি তোমার ক্ষমা না থাকিত তাহা হইলে একবার রোগ হইলে আর সারিত না। শোকসন্তপ্ত হইলেও কেহ আর সুস্থ হইত না।

হে সনাতনি শক্তি! যাহারা তোমাকে জড়প্রকৃতি বলিয়া অবজ্ঞা করে, তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। তুমি অচিন্ত্য-শক্তি, অপারমহিম, অপ্রমেয়জ্ঞানাধার, চৈতন্যস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, নির্ব্বিকার, ওঁতৎসৎ বাচ্য ও একমেবাদ্বিতীয়ম্। তুমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাহারা তোমা ভিন্ন অপর পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহারা তোমার অদ্বিতীয় নাম অর্থশূন্য করে অথবা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনা করে। তাহাদিগকে দ্বৈতবাদী বলিতে হয়। তোমার উপাসকেরা প্রকৃত অদ্বৈতবাদী। যাঁহারা তোমার উপাসকদিগকে অর্থাৎ যাঁহারা অদ্বৈতবাদী বিশ্বদেবো-পাসকদিগকে নাস্তিক বলেন, তাঁহারাই নাস্তিক অথবা তাঁহারাই পৌত্তলিক। হে বাঙ্মনসোঽগোচর! তোমার মহিমা আমি কি

বর্ণনা করিব? তুমি মানবেরে এমন শক্তি দাও নাই যে, তদ্দ্বারা তোমাকে অবগত হয়। যে বিজ্ঞানশাস্ত্রবলে তোমার তত্ত্ব জানিবার আশা করা যায়, তাহা মানবের কৃত, সুতরাং অপূর্ণ। মানব সম্যক্‌রূপে অপূর্ণ। অপূর্ণ শক্তি দ্বারা তোমার পূর্ণশক্তির পরিচয় কিরূপে লইব? তোমার নিকট প্রার্থনা এই যে, আমাতে এমত মহাভূত সকল প্রদান কর, যাহার বলে তোমার তত্ত্ব অবগত হইতে পারি ও তোমার সহিত ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইতে পারে। ইহাই মানবের একমাত্র অভাব। অপূর্ণতা দূর হইলেই মানব চরিতার্থ হয়। কিন্তু তুমি তাহা পূর্ণ করিবে কি না বলিতে পারি না।

যিনি প্রতিদিন অবহিতচিত্তে এই স্তব পাঠ করিবেন, তিনি সংসারজয়ী হইতে পারিবেন। মর্ম্মার্থ বুঝিয়া এই স্তব পাঠ করিলে মৃত্যুভয় থাকে না, কোন কষ্টই তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না, রোগ শোক কিছুতেই তিনি ব্যথিত হন না। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করিবেন।

"বিক্ষেপোযস্যনাস্ত্যস্য ব্রহ্মবিত্ত্বং নমনতে।
ব্রহ্মোবায়মিতি প্রাহুর্ম্মুনয়ঃ পারদর্শিনঃ॥
দর্শনাদর্শনেহিত্বা স্বয়ং কেবলরূপতঃ।
যস্তিষ্ঠতি সতুব্রহ্মান্ ব্রহ্ম ন ব্রহ্মবিৎস্বয়ং॥" পঞ্চদশী

অতএব সকলেরই উচিত পূর্ব্ব ও পরসন্ধ্যারাগরঞ্জিত মনোহর কালে অভিনিবেশ পূর্ব্বক পরম পরাৎপর বিশ্বদেব ব্রহ্মের উপাসনা করেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জ্ঞান ও বিশ্বাস।

আমরা এপর্য্যন্ত অনেকবার জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু জ্ঞান কি তদ্বিষয়ে কোনও আলোচনা করা হয় নাই; এক্ষণে আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। এ বিষয়ে সাধারণ মত এই যে, জ্ঞান মানবের সহজাত শক্তি বিশেষ উহা দ্বারা আমরা সত্য নিরূপণ করি, এবং সত্য নিরূপণ করা জ্ঞানেরই কার্য্য। কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞানদ্বারা সত্য লব্ধ হয় না। কেননা যাহা যাহা তাহাই সত্য অর্থাৎ পদার্থের প্রকৃত অবস্থাকে সত্য বলে, এবং সত্য প্রতিভাত হওয়ার নামই জ্ঞান। সত্য জ্ঞানের বিষয়—সত্যনিরূপণই জ্ঞানের নামান্তর।

বিষয় না হইলে কখনও জ্ঞান হইতে পারে না। সত্য চিরকাল বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান মানবের চির-কাল নাই। সত্য জ্ঞান ভিন্ন থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞান সত্য ভিন্ন থাকিতে পারে না। 'তাড়িতের গতি অতি দ্রুত' এ সত্য চিরকালই আছে, অথচ তাহার জ্ঞান পূর্ব্বে মানবের ছিলনা। কিন্তু এমত জ্ঞান মানবহৃদয়ে নাই যাহার আধারভূত কোন সত্য বিষয় নাই। বিষয় না থাকিলে কি অবধারণ করিবে? অতএব যখন বিষয় না পাইলে জ্ঞান হইতে পারে না, তখন কি প্রকারে জ্ঞান মানবের সহজ হইবে? সত্য অবলম্বনেই মানব-গণ দিন দিন জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ যখন যে বিষয় মানবের গোচর হয় তখন তৎসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। যে, যেমন

স্থানে ও যেমন অবস্থায় অবস্থিত, তাহার তদনুরূপ জ্ঞানলাভ হয়। যাহারা সমুদ্রকূলবাসী তাহাদের সমুদ্রবিষয়ে যেরূপ জ্ঞান-লাভ হয়, আমাদের সেরূপ হয় না। ঐরূপ পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী-দিগের পর্ব্বত জ্ঞান, শীতপ্রধানদেশবাসীদিগের তুষারজ্ঞান, অরণ্য-বাসীদিগের ব্যাঘ্রাদি বন্য জন্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান যেরূপ জন্মে, আমা-দের সেরূপ জন্মিতে পারেনা। কেননা তাহারা সর্ব্বদাই ঐ সকল দেখিয়া থাকে, আমরা কদাচিৎ দেখি। যাহা কখনও দেখি নাই তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইতে পারেনা; তবে অন্যের নিকট শুনিয়া যে জ্ঞান লাভ করি সে ভিন্ন কথা। অতএব যখন বিষয় অর্থাৎ সত্য না পাইলে জ্ঞান হইতে পারে না, তখন কিরূপে জ্ঞান দ্বারা সত্য নিরূপণ হইবে? বাস্তবিক যদি জ্ঞানই সত্য নির্ণয়ের কারণ হইত, তাহা হইলে স্থান ও কাল-ভেদে জ্ঞানের পার্থক্য হইত না। এবং তাহা হইলে যে কোন স্থানে ও যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, সকলেই সকল বিষয়ে সমান জ্ঞান লাভ করিত; কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞান দ্বারা সত্য নির্ণয় হয় না, সত্য অর্থাৎ বিষয় জ্ঞানের সমবায় কারণ, এই জন্য যে স্থানে ও যে কালে যেমন বিষয় বর্ত্তমান থাকে, সেস্থানে ও সেই কালে মানবের সেইরূপ জ্ঞান জন্মে।

ইহাতে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, যদি বিষয়ই জ্ঞানের কারণ তবে সকলে সমান জ্ঞানী হয় না কেন? বিষয় ত চিরকালই আছে, তবে মানব যে সকল জ্ঞান লাভ করিতে পারে, পশু পক্ষ্যাদি তাহা পারেনা কেন? সুতরাং বলিতে হইবে যে, বিষয়ের শক্তিপ্রতিভাত হইতে পারে এমন কোনও সহজ শক্তি অবশ্য মানবে আছে। যে শক্তিদ্বারা মানবে সত্য

প্রতিভাত হয়, তাহার নাম জ্ঞান, সুতরাং সেই জ্ঞান দ্বারাই সত্য প্রকাশিত হয়। ঐ সহজ শক্তি অন্য জীবে নাই সেই জন্য ইতর-প্রাণিগণ মানবের ন্যায় জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। যখন ঐ সত্যপ্রকাশক শক্তি মানবের সহজাত, তখন জ্ঞানকে কেননা সহজাত বলিব?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এমত কোন একটী শক্তি মানবে নাই, যে, কেবল তাহারই সহায়তায় মানব জ্ঞান লাভ করে। কেননা, যদি কোন এক শক্তি দ্বারা জ্ঞান লাভ হইত, তাহা হইলে পদার্থের সকল প্রকার শক্তিই এক প্রকারে অবগত হওয়া হইত। তাহা হইলে ময়ূরের শ্রী, গীতের মধুরতা, শর্করার স্বাদুতা, পুষ্পের সৌরভ ও অগ্নির দাহিকা শক্তি একই প্রকারে জ্ঞাত হইতে পারা যাইত। কৈ তাহা ত পারা যায় না। ময়ূরের শ্রী চক্ষুভিন্ন নাসিকা, কর্ণ, জিহ্বা বা ত্বক্ দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, গীতের মধুরতা কর্ণভিন্ন, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা বা ত্বক্ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না। ঐরূপ শর্করার স্বাদুতা জিহ্বা, পুষ্পের সৌরভ নাসিকা এবং অগ্নির দাহিকাশক্তি ত্বক্ ভিন্ন অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না। যদি জ্ঞান নামক মানবীয় শক্তি বিশেষটী সমস্ত জ্ঞানের কারণ হইত তাহা হইলে কখনও এরূপ হইতে পারিত না। তাহা হইলে পশু পক্ষ্যাদি ঐ শক্তি না থাকায় ইতর প্রাণিগণের কোনও প্রকার জ্ঞানই জন্মিতে পারিত না, এবং উন্মাদদিগের জ্ঞান নাশের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়-শক্তিরও লোপ হইত। অপিচ তাহা হইলে মানবশিশু জন্মিবা-মাত্র জ্ঞান সম্পন্ন হইত এবং যখন যে পদার্থ জ্ঞানের বিষয়

হইত তখনই মানব তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিত। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে পশ্বাদি ইতরপ্রাণীরা স্ব স্ব আবশ্যক মত সমস্ত প্রকার জ্ঞানই উপার্জ্জন করে ও উন্মাদগণ ক্ষণমাত্রও ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানশূন্য হয় না, এবং যখন দেখা যাইতেছে মানবশিশু শিক্ষা না পাইলে কিছুমাত্র জ্ঞান লাভ করিতে পারে না ও পণ্ডিত-গণও জ্ঞান লাভ করিতে যাইয়া পদে পদে ভ্রান্ত হইয়া থাকেন, তখন জ্ঞানকে কি প্রকারে সহজ বলিব, এবং তাহা পশ্বাদির নাই, কেবল মানবেরই আছে তাহাই বা কি প্রকারে বলা যায়?

বাস্তবিক যদি সহজাত জ্ঞান দ্বারা সত্য নিরূপিত হইত, তাহা হইলে, ঈশ্বর কি? সৃষ্টি কেন হইল? ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি? তিনি জন্ম দিয়া আবার মরণ কষ্ট দেন কেন? বিশ্বনিয়ম সকল দোষযুক্ত করিয়াছেন কেন? ইহা অপেক্ষা ভাল নিয়ম করিলেন না কেন? ইত্যাদি অলৌকিক বিষয়সকলের মর্ম্ম ও আমরা জানিতে পারিতাম। কিন্তু তৎসমস্ত জানা দূরে থাকুক, যদি কেহ ঐ সকল বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপন করে, তাহা হইলে লোকে তাহাকে উন্মাদ বলিয়া উড়াইয়া দেয়। কেন লোকে এরূপ করে? যদি সহজ জ্ঞানদ্বারা সকল সত্য নিরূপিত হয়, তবে কেন ঐরূপ সত্যনির্ণয়কারীদিগকে লোকে উন্মাদ বলে? কেন জ্ঞান ঐ সকল সত্য নিরূপণের চেষ্টা করিবে না? কেন আমরা সর্ব্বজ্ঞ হইব না? বাস্তবিক জ্ঞান দ্বারা সত্য নিরূপিত হয় না, সত্য নিরূপণই জ্ঞান, সত্য না পাইলে জ্ঞান হইতে পারেনা এবং পূর্ব্বোক্ত সত্যসকল আমাদের অতীন্দ্রিয়, এই জন্য আমাদের তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই, তাই ঐরূপ চেষ্টাকে উন্মত্ততা বলে।

কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারাই জ্ঞানলাভ হয় না। স্মৃতি, ধারণা, তুলনা, কল্পনা প্রভৃতি অনেক গুলি শক্তি আমাদের আছে. তাহাদিগকে সাধারণতঃ বুদ্ধিবৃত্তি বলে। জ্ঞান-লাভ করিতে ঐ সকল বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তা একান্ত আবশ্যক। বুদ্ধি না থাকিলে কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না। তাই যাহার যেমন বুদ্ধি আছে, সে তদনুরূপ জ্ঞান লাভ করে। পশ্বাদির বুদ্ধি নিতান্ত অল্প এজন্য তাহারা মানবের ন্যায় জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে তাহা বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না। এই জন্য কোন ব্যক্তিই অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান লাভে সমর্থ নহে। অতএব জ্ঞান আমাদের সহজাত নয়। জ্ঞান অর্জিত হয় দেখিয়াই অনেকে মনে করেন মানবের সকল প্রকার শক্তি ও সহজাত নহে, অনেক প্রকার শক্তি মানবের উপার্জ্জিত। বাস্তবিক তাঁহাদের একথা একান্ত ভ্রান্তিমূলক। কেননা জ্ঞান শক্তিবিশেষ নহে, সম্পত্তি বিশেষ। সম্পত্তি অর্জ্জিত হয় বলিয়া শক্তি অর্জ্জিত হইতে পারে না। ঘ্রাণশক্তিবলে পুষ্পের গন্ধ অর্জ্জন করা যায় বলিয়া, ঘ্রাণশক্তি অর্জ্জিত হইতে পারে না।

যদি সত্য নিরূপণেরই নামান্তর জ্ঞান হইল, তবেত আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তৎসমস্ত সত্য হইবে, কিন্তু তাহা হয় না কেন? অভাবের অল্পতা, ইন্দ্রিয়ের অসামর্থ্যতা ও বিষয়ের জটিলতাই প্রকৃত জ্ঞানলাভের প্রধান বাধা। শিশুর অভাব কেবল ক্ষুধা, স্তন্যপান করিয়া তাহার সেই ক্ষুধা রূপ দুঃখের অবসান হয়; শিশুর জ্ঞান হইল স্তন্যপানেই সকল দুঃখ দূর হয়। অন্য প্রকার কষ্ট হইলেও শিশু ঐ জ্ঞানানুসারে তাহা স্তন্যপান দ্বারা

নিবারিত হইবে বিবেচনা করে, এবং তজ্জন্যমাত্রেই দুগ্ধ বা দুঃখনিবারক পদার্থ আছে মনে করে। মানব আকাশে নক্ষত্র মণ্ডল দেখিল, কেবল দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা দেখিল, এজন্য জ্ঞান হইল নক্ষত্র সকল হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল ও ক্ষুদ্র ,এবং আকাশের যে স্থানে যে নক্ষত্র আছে বোধ হইল সেই স্থানেই সেই নক্ষত্র আছে বলিয়া জ্ঞান হইল। দর্শনেন্দ্রিয়ের ইহা অপেক্ষা আর অধিক দর্শনের শক্তি নাই, সুতরাং কেবল দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা ভ্রান্ত জ্ঞান জন্মিল। বাস্তবিক নক্ষত্র সকল ক্ষুদ্র নহে, দূরে আছে বলিয়া ক্ষুদ্র দেখায়; এবং যে নক্ষত্র যে স্থানে আছে বলিয়া বোধ হয় সে নক্ষত্র বাস্তবিক সে স্থানে নাই, নক্ষত্রের আলোক-কিরণ সরল রেখায় আসিতে পারে না বলিয়াই উহাদিগকে স্থানান্তরে দৃষ্ট হয়। দর্শনেন্দ্রিয়ের এসকল জ্ঞান লাভের শক্তি নাই, সেই জন্য মানবের নক্ষত্র সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে তাহা ভ্রান্ত। পারদ ও গন্ধকে মিলিত করিয়া দেখা গেল, উভয়ের সংযোগে কৃষ্ণ বর্ণ হইল, সুতরাং জ্ঞান হইল যে পারদ ও গন্ধকের মিশ্রণে কৃষ্ণ বর্ণ হয়, অন্য কোনরূপ হয় না। কিন্তু ঐ পারদ ও গন্ধকের সংযোগে যে ঘোর রক্ত বর্ণ হিঙ্গুল উৎপন্ন হয়, তখন তাহা বুঝিতে পারা গেল না।

এই রূপ নানা কারণে মানব সত্যের অনুসন্ধান পায় না। বিশেষতঃ জ্ঞানসকল পরস্পর পূর্ব্ব জ্ঞানের সহায়তা সাপেক্ষ; কোনও একটী বিশেষ সত্য নিরূপিত না হইলে পরবর্ত্তী আর একটী সত্য নিরূপিত হইতে পারে না। জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা সকল যে রূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাসাপেক্ষ, জ্ঞানসকলও সেই রূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানসাপেক্ষ। নক্ষত্র মণ্ডলের পরিমাণ জানিতে হইলে,

অগ্রে "দূরস্থ বস্তু ক্ষুদ্র দেখায়," "কতদূরে কত ক্ষুদ্র দেখায়" ইত্যাদি জ্ঞানসকল লাভ করা আবশ্যক; নতুবা এককালে নক্ষত্রের পরিমাণ স্থির করিতে গেলে ভ্রান্তি ভিন্ন হইতে পারে না। জ্ঞানসকল পরস্পর জ্ঞানসাপেক্ষ হওয়াতেই অর্থাৎ কোনও সত্য নিরূপণ করিতে হইলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান বিশেষের সহায়তা আবশ্যক হওয়াতেই, লোকে বিবেচনা করিয়াছে জ্ঞান দ্বারা সত্য নিরূপিত হয়। কিন্তু যেমন জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা সকল প্রমাণ করিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার সাহায্য একান্ত আবশ্যক হইলেও বাস্তবিক কোনও প্রতিজ্ঞা কেবল মাত্র প্রতিজ্ঞা দ্বারা সপ্রমাণ হয় না, স্বতঃসিদ্ধই প্রতিজ্ঞা প্রমাণের প্রকৃত উপায়, সেই রূপ জ্ঞানসকল উৎপাদন করিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানের সাহায্য একান্ত আবশ্যক হইলেও জ্ঞান দ্বারা সত্য নির্ণয় হয়, বলা যাইতে পারে না; বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সম্মিলনজাত প্রত্যক্ষই জ্ঞানের প্রকৃত কারণ। সুতরাং জ্ঞানের বিষয় ইন্দ্রিয়াতীত হইলে, তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে না। যে বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে আমরা চেষ্টা করি সে বিষয় যদি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় ও সে বিষয়ের শক্তিসকল যদি অবিকৃত ইন্দ্রিয়পথে যাইয়া বুদ্ধির বিষয় হয় এবং সেই বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে যে সকল পূর্ব্বজ্ঞানের সহায়তা আবশ্যক তাহা যদি পর পরক্রমানুসারে বুদ্ধির বিষয় হইয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলেই প্রকৃত জ্ঞান বা সেই বিষয়ের সত্য নিরূপিত হয়। ইহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলেই বিপরীত অর্থাৎ ভ্রান্তি হয়। তাই সর্ব্বদাই ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। বিশেষতঃ প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, পদার্থ সকলের সংযোগ ও বিশ্লেষণ করা একান্ত

আবশ্যক; তাহা না হইলে, হিঙ্গুল যে পারা ও গন্ধকসংযোগে সমুৎপন্ন তাহা তুমি কি প্রকারে বুঝিবে? বিষমিশ্র দুগ্ধে যে বিষ মিশ্রিত আছে তাহা কি প্রকারে জানিবে? বায়ুদ্বয়ের যোগেই যে জল হয় এবং সিঙ্কোনা বৃক্ষে যে জ্বরনাশক কুইনাইন আছে তাহা কি প্রকারে জানিবে? সর্ব্বথা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, যথাযোগ্য ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি অর্থাৎ বৃত্তি সকলের যথাযোগ্য বিষয়ে সম্মিলন, পর পর জ্ঞান লাভ ও তৎসাহায্যে পরবর্ত্তী জ্ঞানলাভের চেষ্টা এবং বিষয়ীভূত পদার্থের সংযোগ ও বিয়োগ করণ একান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে সত্য নিরূপণ না হইয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া জ্ঞান জন্মে।

পূর্ব্বোক্ত কারণ ভিন্ন অন্য প্রকারেও আমাদের ভ্রান্তি হইয়া থাকে। প্রকৃত সত্য বুঝিতে না পারিয়া অযথা অনুমান ও কল্পনা করাতে অনেক প্রকার ভ্রান্তির উৎপত্তি হয়। কোন ব্যক্তি যে দিন একটী গাভী ক্রয় করিয়া আনিল, সেই দিনই তাহার পরিবারস্থ একব্যক্তি পীড়িত হইল ও পরে দুই তিন দিনের মধ্যে পরিবারস্থ সকলেই পীড়িত হইল। কেন সকলে পীড়িত হইল, বুঝিতে না পারিয়া ভাবিল গাভীটীর কোন দোষ থাকিতে পারে; পরে সন্ধানে জানিল, যাহাদের নিকট হইতে ঐ গাভীটী ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে তাহারা নির্ব্বংশ; তখন গরুটী অলক্ষণযুক্ত জ্ঞানে বিক্রয় করিল। যে উহা ক্রয় করিল সে দেনার দায়ে কারাবদ্ধ হইল। সুতরাং গরুটী যে নিতান্ত অলক্ষণযুক্ত সে জ্ঞানের আর সন্দেহ থাকিল না। এক ব্যক্তির শরীর গরম হইয়া জ্বরের ন্যায় হওয়ায় জ্বর হইয়াছে ভাবিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহার জ্বর হয় নাই, অথচ জ্বর হইয়াছে ভাবিয়া কুইনাইন

খাইল, ও তাহাতে শরীর জ্বলিতে লাগিল; পরিশেষে জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া জলে ডুব দিল, ও ডাবের জল পান করিল। তাহাতেই তাহার শরীর সুস্থ হইলে ভাবিল, তাহার শরীরে কুইনাইন সহ্য হয় না, শৈত্য করিলে তাহার জ্বর আরাম হয়। ঐরূপ দুই তিন বার হইলেই ঐ জ্ঞান তাহার দৃঢ় হইয়া যায়। আকাশে মেঘ হইল, ধনুরাকার পদার্থ দৃষ্ট হইল, বজ্রপাত হইল, ভয়ানক শব্দ হইল। মানব কিছুই বুঝিল না, স্থির করিল দেবরাজ ইন্দ্র ধনুর্ধারণে যুদ্ধ করিতেছেন। সে প্রত্যক্ষ ধনুঃ দেখিয়াছে, বাণ পতিত হইতে দেখিয়াছে, ধনুষ্টঙ্কার শুনিয়াছে, সুতরাং তাহার ঐ জ্ঞান সন্দেহশূন্য হইল। এই প্রকারে অযথা অনুমাণ ও কল্পনা দ্বারা অনেক ভ্রান্ত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

মনুষ্য যে জ্ঞান লাভ করে, তাহা প্রকৃত হউক বা ভ্রান্ত হউক, সমস্তই সত্য বলিয়া জ্ঞান বা প্রতীতি জন্মে। বাস্তবিক ইন্দ্রিয়াদির সহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষকে যখন জ্ঞান বলা যায়, তখন তাহা সত্য ভিন্ন কি হইতে পারে? প্রত্যক্ষ যে স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানানুসন্ধায়ী বা জ্ঞানিগণ বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারা যে সকল জ্ঞানকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই বাস্তবিক সত্য নহে। কেননা তাঁহারা দেখিতে পান পূর্ব্বপণ্ডিতেরা যে সমস্ত জ্ঞানকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার অনেকগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং তাঁহারা নিজে পূর্ব্বে যাহাকে সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া উপপন্ন হইতেছে। জ্ঞানের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, যে মানবের জ্ঞান চূড়ান্ত নহে, উহা বিশ্বে

পরীক্ষা সাপেক্ষ। এই জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়াও যে সকল সত্য আবিষ্কার করিতেছেন, তৎসমস্তকেও সম্পূর্ণ সত্য বলিতে সাহস করেন না, প্রত্যুত স্পষ্টই বলেন যে, পরে অধিকতর প্রমাণ দ্বারা এই সকল মিথ্যা রূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে। জ্ঞানের এই অবস্থা অর্থাৎ পরীক্ষাসাপেক্ষ অবস্থাই এক্ষণে জ্ঞান-পদ-বাচ্য হইয়াছে। এই জন্য বাস্তবিক কোন জ্ঞান সত্য হইলেও জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাহাকে সন্দেহশূন্য বলিতে পারেন না। জ্ঞানীরা বুঝিয়াছেন যে, মানব অপূর্ণ, ইন্দ্রিয়গণ সকল বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞানলাভে অসমর্থ, এবং বিশ্বান্তর্গত পদার্থসকল অত্যন্ত জটিল; সুতরাং প্রজ্ঞা অর্থাৎ সত্য জ্ঞান লাভ করা মানবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু অনেক লোক এমত আছেন যে, তাঁহারা যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা নিতান্ত ভ্রান্ত হইলেও সম্পূর্ণ সত্য মনে করেন। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত রূপ মানবের অপূর্ণতাদির বিষয় আদৌ বিবেচনা করেন না; তাঁহাদের দৃঢ় সংস্কার এই যে, তাঁহারা যাহা জানিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য, তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রান্তি নাই। এই জন্য তাঁহাদের জ্ঞানের বিরুদ্ধে সহস্র প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিলে তাহা শুনিতেই চাহেন না। তাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের ঐ জ্ঞান সহজাত বা ঈশ্বর দত্ত শক্তিবিশেষ হইতে সমুৎপন্ন, অথবা যাঁহার নিকট তাঁহারা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি অভ্রান্ত পুরুষ। এই জন্য তাঁহারা লব্ধ জ্ঞানকে চূড়ান্ত মনে করেন, অর্থাৎ উহার সত্যতা প্রমাণের জন্য পরীক্ষান্তরের প্রয়োজন স্বীকার করেন না।

জ্ঞানের ঐ পরীক্ষানিরপেক্ষ অবস্থা অর্থাৎ কেবল মাত্র

পূর্ব্বোক্ত রূপ সংস্কারানুসারে যে জ্ঞানকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয় ও যাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই বিবেচিত হয়, তাহা বিশ্বাস পদবাচ্য। ফলতঃ জ্ঞান ও বিশ্বাস একই ভাবে উৎপন্ন ও একই ভাবে কার্য্যকারী হয়। সুতরাং জ্ঞানের ন্যায় বিশ্বাস সত্য হইতেও পারে, মিথ্যা হইতেও পারে। কেননা যে জ্ঞানটী বিশ্বাসরূপে পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ যাহার সত্যতাসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ বোধ হইয়াছে, তাহা যদি সত্য হয়, তবে সে বিশ্বাসও সত্য আর যদি সে জ্ঞান মিথ্যা হয় তবে সে বিশ্বাসও মিথ্যা হয়। বাস্তবিক বিশ্বাস কোন মনোবৃত্তি বা সহজাত শক্তি বিশেষ নহে; উহা জ্ঞানেরই নামান্তর। প্রভেদ এই যে, জ্ঞান পরীক্ষাসাপেক্ষ ও বিশ্বাস পরীক্ষানিরপেক্ষ; জ্ঞানের বিরুদ্ধে যুক্তি শ্রবণযোগ্য, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তি অগ্রাহ্য; জ্ঞান পরিবর্ত্তসহ এজন্য চঞ্চল, বিশ্বাস চূড়ান্ত এজন্য দৃঢ়; জ্ঞান চঞ্চল বিধায় হৃদয়ে দৃঢ় সম্বদ্ধ হয় না, বিশ্বাস দৃঢ় বিধায় হৃদয়ে দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়া স্বভাব বা সংস্কারের ন্যায় হইয়া যায়; জ্ঞান চক্ষুষ্মান্, বিশ্বাস অন্ধ; জ্ঞান উন্নতিশীল, বিশ্বাস স্থিতিশীল; জ্ঞান সত্য-নিষ্ঠ, বিশ্বাস ভক্তি-নিষ্ঠ। এককালে যে জ্ঞান সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল, এক্ষণে তাহা মিথ্যা রূপে উপপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহা এক্ষণে বিশ্বাস-সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আবার এক্ষণে যাহাকে সত্য জ্ঞান বলিয়া পণ্ডিতেরা গ্রহণ করিতেছেন, পরে তৎসমস্ত বা তাহার কতকগুলির অলীকত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে। কিন্তু তখনও, যাঁহারা বিশ্বাসরূপে গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা সে সকলকে অলীক বলিবেন না। কারণ যুক্তি, বিচার ও পরীক্ষা দ্বারাই জ্ঞানের অলীকত্ব সপ্রমাণ হয়; কিন্তু বিশ্বাস যখন যুক্ত্যাদি

গ্রহণ করে না, তখন কি প্রকারে তাহার অলীকত্ব প্রমাণিত হইবে? এই জন্য জ্ঞানীব্যক্তিরা বিশ্বাসকে ভ্রান্ত ও জ্ঞানকে সত্য বলেন। বাস্তবিক জ্ঞান ও বিশ্বাস ইহার কোনওটাই সম্পূর্ণ সত্য বা সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে। সত্য মিথ্যা উভয়েতেই আছে।

বিশ্বাস যদি সহজাত অভ্রান্ত বৃত্তিবিশেষ হইত, তাহা হইলে মানব মাত্রই একইরূপ বিশ্বাসপরায়ণ হইত, এবং তাহা হইলে শৈশব কালেই মানবমনে বিশ্বাসসকল প্রকাশিত হইত; কিন্তু তাহা না হইয়া যখন হিন্দু বালকের একরূপ, মুসলমান বালকের অন্যরূপ এবং খৃষ্টান বালকের আর একরূপ বিশ্বাস, তখন বিশ্বাসকে কিরূপে সহজ বলা যায়? বাস্তবিক পিতা মাতা বা গুরুর নিকট হইতে যেরূপ শিক্ষা পায়, শিশুগণ তদনুরূপ বিশ্বাসপরায়ণ হয়। অতএব বিশ্বাসকে সহজাত না বলিয়া শিক্ষাজাত বলাই উচিত। বিশেষতঃ জ্ঞানের ন্যায় বিশ্বাসও বিষয়সাপেক্ষ। বিষয় না হইলে কিসের উপর বিশ্বাস করিবে? বিষয় যখন সহজাত নয় তখন বিশ্বাস কিরূপে সহজাত হইবে? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে আমরা যাহা কিছু বিশ্বাস করি, তৎসমস্তই বিষয়ের সত্যতা লইয়া, অর্থাৎ আমরা যে বিষয় সম্বন্ধে যাহা বিশ্বাস করি তাহাকেই সেই বিষয় সম্বন্ধীয় সত্য বলিয়া জানি। বিশ্ব কি প্রকারে হইল? সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সৃষ্টিকরিয়াছেন। জড়-দেহ কি প্রকারে চিন্তাদি করে? চেতন আত্মাই তাহার মূল। পৃথিবী নিরবলম্বনে কি প্রকারে আছে? অনন্তদেব বা অন্য কোন শক্তি উহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। চন্দ্রের মলিন চিহ্ন গুলি কি? উহার কলঙ্ক। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, প্রভৃতির এত শক্তি ও এত মাহাত্ম্য কেন? উহারা দেবতা।

ভূমিকম্প হয় কেন? বাসুকির মস্তক পরিবর্ত্তন জন্য। চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ হয় কেন? রাহু উহাদিগকে গ্রাস করে। অমুক নির্ব্বংশ হইল কেন? কাহারও অনিষ্ট করিয়া উপার্জ্জন করে বলিয়া। এ সমস্তই কারণ অর্থাৎ সত্যজিজ্ঞাসু হইয়া স্থির হইয়াছে। সুতরাং ঐ সকল সত্যাই হউক বা মিথ্যা হউক, ঐ সকল যে মানবের জ্ঞান তাহাতে সন্দেহ কি? ঐরূপ পরধন ও পরদার গ্রহণ করিলে, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ ও প্রবঞ্চনা করিলে, অন্যের প্রাণনাশ করিলে পরস্পরের সমূহ ক্ষতি হয় দেখিয়া জ্ঞান জন্মিয়াছে যাহারা ঐ সকল অনিষ্টকর কার্য্য করে, ঈশ্বর তাহাদের দণ্ড দিয়া থাকেন। কিন্তু সকলের দণ্ডপ্রাপ্তি প্রত্যক্ষ-গোচর হয় না, সেই জন্যে পরকালে নরকাদি ভোগবিষয়ে জ্ঞান ও বিশ্বাস জন্মিয়াছে। ঐরূপে পূর্ব্বকথিত রোগ হওয়ার কারণ নিরূপণে অসমর্থ হইয়া অলক্ষণযুক্ত গাভীই কারণ স্বরূপে স্থির হইয়াছে ও তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে। ঐরূপ কারণে অনেকে স্থির করিয়াছেন কাহারও দুর্গাপূজা করিতে নাই, কাহারও ইষ্টক প্রস্তুত করা সহেনা, আম্রের আচার প্রস্তুত করিলে কাহারও অনিষ্ট হয় ও কাহারও বৃক্ষবিশেষ রোপণ করিতে নাই, করিলে তাহাদের অমঙ্গল হয়। এ সকল তাঁহারা বা তৎপূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বে জানিয়াছেন, তাহাতেই সত্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। এই সকল দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে বিশ্বাস জ্ঞানবিশেষ ও সম্পূর্ণ বিষয়সাপেক্ষ এবং সত্যনির্ণয়ই বিশ্বাসের একমাত্র কার্য্য। সত্য চূড়ান্ত বলিয়া জ্ঞান হওয়াতেই তাহা বিশ্বাস-পদবাচ্য হইয়াছে।

যাহা আলোচনা করা গেল, তাহাতে স্পষ্ট জানা গেল যে,

জ্ঞান ও বিশ্বাস উভয়েরই মূল এক ও উদ্দেশ্য এক; তবে বিশ্বাস পরীক্ষাসাপেক্ষ না হওয়াতেই জ্ঞানের বিরোধী হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্যই সমকালিক জ্ঞান সমকালীন বা পূর্ব্বকালীন বিশ্বাস অপেক্ষা সত্যের অধিক নিকটবর্ত্তী সুতরাং শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাহা বলিয়া জ্ঞানই অবলম্বনীয়, বিশ্বাস অবলম্বনীয় নহে, একথা বলা যায় না। কারণ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হইলেও উহা অস্থির, সুতরাং উহা হৃদয়ে সম্পূর্ণ মিলিত হয় না, তজ্জন্য জ্ঞানীর কার্য্য হৃদয়ের সহিত হয় না। বিশ্বাস অপেক্ষাকৃত ভ্রান্ত হইলেও উহা হৃদয়ে দৃঢ় সম্বদ্ধ হওয়া প্রযুক্ত স্বভাব বা সংস্কারের ন্যায় হইয়া যায়, তজ্জন্য বিশ্বাসীর কার্য্য হৃদয়ের সহিত সম্পন্ন হয়। জ্ঞানী ব্যবস্থা দিতে যেরূপ পটু, কার্য্য করিতে সেরূপ পটু নহেন। বিশ্বাসী প্রাণপণে বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানী জ্ঞানানুরূপ কার্য্য করিতে সেরূপ যত্ন করিতে পারেন না। জ্ঞানী ও বিশ্বাসী উভয়েই দান কার্য্য উত্তম বলিয়া জানেন, কিন্তু বিশ্বাসী যেরূপ অকাতরে দান করিতে পারেন, জ্ঞানী সেরূপ পারেন না; বিশ্বাসী সর্ব্বস্ব দান করিয়াও তৃপ্ত, জ্ঞানী কিঞ্চিৎ দান করিবার সময়েও দানের পাত্র কি না, সঙ্কল্পিত অর্থ দেওয়া সঙ্গত কি না ইত্যাদি নানাপ্রকার চিন্তা করেন। জ্ঞানী ও বিশ্বাসী উভয়েই মদ্যপান অন্যায় বলিয়া থাকেন, কিন্তু বিশ্বাসী হিন্দু যেরূপ মদ্য স্পর্শ মাত্রও করেন না, জ্ঞানী অন্যে মদ্যের প্রতি তত বিরাগ প্রদর্শন করেন না, আবশ্যক বোধ হইলেই তিনি তাহা পান করেন। দেশহিতৈষণা জ্ঞানী ও বিশ্বাসী উভয়েই কর্ত্তব্য বলিয়া জানেন, কিন্তু বিশ্বাসী ক্ষত্রিয় যেরূপ দেশের জন্য আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন, জ্ঞানী

অন্যে সেরূপ পারেন না। জ্ঞানী যাহাই করুন নিজের প্রতি দৃষ্টি তাঁহার থাকিবেই থাকিবে, কিন্তু বিশ্বাসী আত্মবিস্মৃত হইয়া কার্য্য করে। এই জন্য বিশ্বাসীরা বিশ্বাস বশতঃ উপবাস, দান, তপস্যা, চিরবৈধব্যব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, ধর্ম্মার্থেপ্রাণবিসর্জ্জন প্রভৃতি নিতান্ত-দুঃসাধ্য কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া থাকে, জ্ঞানী তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারে না। ভক্তি, প্রেম বিশ্বাসেরই সহচর। বিশ্বাসী ভক্তি প্রেমভরে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া নৃত্য করে, মত্ততা জনিত সে সুখ জ্ঞানী কখনই পায় না।

আর এক কথা—সকল ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয় না। পরীক্ষা দ্বারা যাবদীয় জ্ঞানলাভ ত কাহারই ভাগ্যে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানলাভও কচিৎ কেহ করিতে পারে। মানবের অল্প জীবন; কার্য্য ব্যপদেশেই তাহার অধিকাংশ ব্যয়িত হয়। যে যৎকিঞ্চিৎ সময় থাকে, জ্ঞানোপার্জ্জন জন্য তাহা ব্যয় করিবার সুবিধা অতি অল্প লোকেই পায়; কাজেই বিশ্বাসই তাহাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। বিশ্বাস অবলম্বন না করিলে, তাহাদের কোনও জ্ঞানই লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। শিক্ষা-প্রকরণে ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

বিশ্বাসের আর একটী প্রধান প্রয়োজন এই যে, জ্ঞান সকল শরীরে সমান রূপ প্রতিফলিত হয় না। যাহার যেরূপ স্বভাব বা গঠনোপকরণ, সে তদনুরূপ জ্ঞান লাভ করে; যে ব্যক্তি দয়ার্দ্র সে পশু বা নরহত্যা দেখিয়া ক্লেশ পায়; এজন্য সে জীবহিংসা অকর্ত্তব্য বলে—তাহার মতে অহিংসা পরমধর্ম্ম। যে নিষ্ঠুর তাহার পরদ্রোহে কষ্ট নাই, বরং আমোদ আছে, সুতরাং সে নিজের সামান্য উন্নতির জন্য পরদ্রোহ কর্ত্তব্য বলে।

যে দুর্ব্বল ও ভীত সে বিবাদে অপটু, তাহার মতে ক্ষমাই প্রধান ধর্ম্ম। যে বলবান, তেজস্বী ও অভিমানী সে আত্ম-ধনমান রক্ষার জন্য বিবাদ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া জানে। যে প্রণয়ী সে প্রণয়পাত্রের হিতের জন্য আত্মবলি দেওয়াকেও কর্ত্তব্য বলে। যে অপ্রণয়ী সে আত্মসুখের জন্য স্ত্রী পুত্রাদির বিনাশ সাধনও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। এইরূপ যে শরীর যেরূপ উপাদানে গঠিত সে শরীর হইতে তদনুরূপ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। সুতরাং সকলকে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া কার্য্য করিতে হইলে মহা অনর্থ ঘটে। কাহারই নীতিশিক্ষা ঘটেনা।

বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিলে, কি দয়ার্দ্র কি কঠিনহৃদয়, কি দুর্ব্বল, কি বলবান্, কি প্রণয়ী কি অপ্রণয়ী সকলেরই নৈতিক জ্ঞান জন্মে। তাহাতেই জাতীয়তা, সমাজ ও ধর্ম্মভাবের উৎপত্তি হয়। বিশ্বাস না থাকিলে এ সকলের কিছুই হইতে পারে না; এই জন্য সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই মূলে ঈশ্বরবাক্যের বিদ্যমানতা আছে; ঈশ্বর-বাক্যে বিশ্বাসই ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল প্রাণ। বিশ্বাস না থাকিলে কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রই স্থায়ী হইত না। হিন্দুশাস্ত্রের মূল ঈশ্বর-প্রণীত বেদ, মুসলমানধর্ম্মের মূল ঈশ্বরপ্রণীত কোরাণ এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মূলে ঈশ্বরপ্রণীত বাইবেল। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলে ঈশ্বর-প্রণীত কোন গ্রন্থ নাই বলিয়া উহাকে প্রকৃত ধর্ম্ম শাস্ত্র বলা যায় না; উহার স্থিতিও হইবে না। যদি রাজা রামমোহন রায় বেদান্তকে অবলম্বন করিয়া উক্ত ধর্ম্মের সৃষ্টি না করিতেন তাহা হইলে, আদৌ ঐ ধর্ম্মের উৎপত্তিই হইত না। বিজ্ঞবর কেশবচন্দ্র সেন উহা বুঝিতে পারিয়াই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং স্পষ্টাক্ষরে বলিতেন যে, ঈশ্বরের

সাক্ষাৎ আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তিনি ধর্ম্মবিধানসকল প্রচার করিয়া থাকেন, এবং ঈশা, মুসা, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় আপনাকেও ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া প্রচার করিতেন।

যদি বিশ্বাস আমাদের এতই আবশ্যক, তবে কি আমরা জ্ঞানলাভ করিব না? জ্ঞান ও বিশ্বাস যখন পরস্পর বিরোধী তখন বিশ্বাস রাখিতে গেলে যে জ্ঞান লাভ হয় না, জ্ঞানলাভ হইলে আবার বিশ্বাস থাকে না। আমি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, যুক্তি দ্বারা তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে সে বিশ্বাস কি প্রকারে থাকিবে? সুতরাং বিশ্বাসকে রাখিতে হইলে জ্ঞান উপার্জ্জনে ক্ষান্ত হইতে হয়, যুক্তি ও বিচারকে এককালে পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে মানবেব উন্নতি কি প্রকারে হইবে? অধিক কি তাহা হইলে মানবের মানবত্বই থাকে না। কেননা উন্নতিই মানবের মানবত্ব এবং উন্নতি জ্ঞানসাপেক্ষ। মানবের জ্ঞানোন্নতি না হইলে মানব ও পশুতে প্রভেদ কি থাকে?

আর্য্যপণ্ডিতেরা জাতিভেদপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া এই শঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছেন। যাহাতে জ্ঞান ও বিশ্বাসের বিরোধ না জন্মে তাহার উপায় করিবার জন্য তাঁহারা নিয়ম করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণগণ জ্ঞান উপার্জ্জন করিবেন, অপর সকলে বিশ্বাসানুসারে চলিবেন। তাহা হইলে সকলেই জ্ঞানের ফল লাভ করিবেন অথচ বিশ্বাসের উপকারিতা রহিয়া যাইবে। আর্য্যজাতির এই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা উভয় কুল রক্ষা করিয়াছে। জাতিভেদ প্রকরণে এ বিষয়ের যথাযথ আলোচনা করা যাইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্বত্বসাম্য ও স্বাধীনতা।

পাশ্চাত্য শিক্ষিত দলের মত এই যে, ঈশ্বর সকল মানবকেই সমান শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন ও সকলকেই সমান স্বাধীনতা, সমান স্বত্ব ও সমান অধিকার দিয়াছেন। স্বাধীনতার অপব্যবহার হওয়াতেই মানবগণ স্বত্ব ও অধিকারবিষয়ে পরস্পর অসম হইয়া পড়িয়াছে ও তজ্জন্যই মানবগণ অহরহ ক্লেশ পাইতেছে। যদি সকল মানব প্রাপ্ত স্বাধীনতার সুব্যবহার করে, তাহা হইলে সকলেই একইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সুখী হয়। বাস্তবিক পাশ্চাত্যগণের এই সকল কথা সত্য কিনা দেখা আবশ্যক। এসকল কথা যে একান্ত ভ্রমপূর্ণ তাহা ঈশ্বরপ্রকরণে একরূপ প্রমাণিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে একটু বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা যাইতেছে।

কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, স্বাধীনতা (স্ব+অধীনতা) অর্থাৎ আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিবার শক্তি মানবের আদৌ থাকিতে পারে না। কেননা মানব পরস্পর-সাপেক্ষ সামাজিক জীব ও পরস্পর বিরোধী ভিন্ন ভিন্ন রূপ শরীর ও মনোবৃত্তি পরায়ণ। সুতরাং কি প্রকারে সকলে আপন আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিবে? যখন একের ইচ্ছার তৃপ্তি করিতে হইলে অপরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে হয়, তখন মানবের স্বাধীনতা বা ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য কোথায়? বিষয় মাত্রেরই জন্য বহু ব্যক্তি প্রার্থী হইয়া থাকে, কিন্তু বিষয় অপেক্ষা প্রার্থীর সংখ্যা

অধিক হওয়ায় নিয়তই অধিক লোকের প্রার্থনা অপূরিত থাকে। সুতরাং অধিক লোকের স্বাধীনতা রক্ষা হয় না। একটী রাজপদ, একটী প্রধান বিচারপতির পদ একজন ভিন্ন পাইতে পারে না, কিন্তু কত লক্ষ জনে তাহা পাইতে ইচ্ছা করে। কোনও একটী স্ত্রী লাভের জন্য দশজন নিতান্ত ইচ্ছুক হইল, কিন্তু ঐ স্ত্রী একজন ভিন্ন ত দশজনের ইচ্ছা পূরণ করিতে পারে না, সুতরাং নয় জনের স্বাধীনতা রহিল না; আবার মনে কর, রাম কমলিনীকে বিবাহ করিতে নিতান্তই ইচ্ছুক, কিন্তু কমলিনী হরিকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করে, রামকে নহে। সুতরাং রাম ও কমলিনী উভয়ের ইচ্ছাপূরণ হইবে কি প্রকারে? এইরূপে একের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গেলে যে, অপরের স্বাধীনতা নষ্ট হয় তাহার সহস্র উদাহরণ নিয়ত দেখা যায়। বিশেষতঃ যখন ক্রোধের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইলে, ক্ষমার ইচ্ছা অপূরিত থাকে; পরোপকার করিবার ইচ্ছা পূর্ণ করিলে স্বার্থরক্ষার বিঘ্ন হয় তখন মানবের স্বাধীনতা থাকিতেই পারে না। কোন এক বৃত্তির স্বাধীনতা রক্ষিত হইলেই ত আর স্বাধীনতা রক্ষা হয় না। সকল মনোবৃত্তির অনুরূপ কার্য্য করিতে পারিলেই মানব প্রকৃত স্বাধীন হয়। অতএব মানবের স্বাধীনতা ঈশ্বরের একান্ত অনভিপ্রেত।

যদি বাস্তবিক মানবের স্বাধীনতা ঈশ্বরাভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে সকলেই ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিত, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইত না। কেননা যখন বলিতেছ সকল মানবই সমান শক্তি সম্পন্ন ও স্বাধীন তখন কেহ কাহারও কার্য্যে অনুমাত্রও বাধা প্রদান করিতে পারে না সুতরাং স্বাধী-

নতার অপব্যবহার আদৌ হইতেই পারে না। যখন বলিতেছ ঈশ্বর সকলকেই সমান শক্তি ও সমানরূপ স্বাধীনতা দিয়াছেন, তখন অবশ্যই ঐ সমান কারণে সকলেরই সমানরূপ কার্য্য হইবে। যদি মানব উহার অপব্যবহার করিতে পারে, তবে সকলেই সমান রূপ অপব্যবহার করিবে। তাহা না হইয়া কেহ অপব্যবহার করিবে কেহ করিবেনা বলিলে সম্পূর্ণ সমান কারণে অসমান কার্য্য হয় বলিতে হয়; কিন্তু তাহা যুক্তি, বিজ্ঞান ও মানববুদ্ধির একান্ত বিরুদ্ধ। অতএব যখন দেখা যাইতেছে মানবের অবস্থাগত বৈষম্য অত্যন্ত অধিক তখন হয় সকল মানব সম্পূর্ণ সমান নহে, অথবা সকল মানবের সমান স্বাধীনতা নাই। বিশেষতঃ যে বিষয় সম্পন্ন করিবার শক্তি আদৌ মানবের নাই তাহা করিতেও যখন মানবের ইচ্ছা হয়, তখন স্বাধীনতাকে কখনই স্বাভাবিক বা ঈশ্বরাভিপ্রেত বলা যাইতে পারে না। সেরূপ অসঙ্গত ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া কি প্রকারে মানবের স্বাধীনতা রক্ষা হইবে? নিয়তই দেখা যায় মানবগণ ক্ষণমাত্র দুঃখ পাইতে বা বৃদ্ধাবস্থাতেও মরিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু চিরজীবন ও চিরসুখ যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয় তাহা বোধ হয় প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। স্বাধীনতা ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে কখনই মানব এরূপ অসঙ্গত ইচ্ছা করিত না এবং যাহা ইচ্ছা করিত তাহা অনায়াসেই সম্পন্ন করিতে পারিত।

কেহ কেহ বলেন, যে ইচ্ছা পূর্ণ হউক বা না হউক তাহা দেখিবার আমাদের আবশ্যক নাই, যে ব্যক্তি অন্যায় ইচ্ছা করিবে, সেই ব্যক্তিই সেই ইচ্ছাপূরণ না হওন জন্য কষ্ট পাইবে, তাহাতে অন্যের কথা কহিবার অধিকার নাই। তাহার বিবে-

চনায় যাহা ভাল বোধ হইবে সে তাহা করিতে পারিবে। এই স্বত্ব মানবের আছে,—এইরূপ স্বত্বের নামই স্বাধীনতা—ইচ্ছামত চলিতে পারার নাম স্বাধীনতা নহে। অন্যের ইচ্ছারই বিরোধাচরণ করিবার অধিকার আমাদের নাই। প্রত্যেক মনুষ্য আপনি আপনার দায়ী। তাহার সুখ হউক দুঃখ হউক তাহারই হইবে, অন্যের তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সুতরাং তাহাতে কাহারও হস্তক্ষেপণ করিবার আবশ্যক ও অধিকার নাই। তবে যে কার্য্য করিলে অপরের ক্ষতি হয়, তাহাতে অন্যে কথা কহিতে পারে। আমাদের বোধ হয় এরূপ স্বাধীনতা কার্য্যপর হইতে পারে না। কেননা এমন কার্য্যই মানবের নাই, যাহা অপরের সহিত এককালে সংস্রবশূন্য; অর্থাৎ এমন কার্য্যই নাই যাহা করিলে অপরের কিছুমাত্রও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। আহার, বিহার, ভ্রমণ, অবস্থান, দারপরিগ্রহ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই পরস্পর-সাপেক্ষ। স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে, কতকগুলি কার্য্য অন্যনিরপেক্ষ বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু বিশেষপ্রণিধানপূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে, সকল কার্য্যই পরস্পরসাপেক্ষ বলিয়া বুঝা যায়। তথাপি যদি স্বীকার করা যায় যে, কতকগুলি কার্য্য কেবল ব্যক্তিগত আছে, তাহা হইলেও কোন্ কার্য্য অন্যসাপেক্ষ ও কোন্ কার্য্য অন্যনিরপেক্ষ তাহা স্থির করা সুকঠিন। সুতরাং কোন্ কার্য্যে মানবের স্বাধীনতা আছে তাহা স্থির করা যায় না। যদিও স্বীকার করা যায় যে কোনপ্রকারে ব্যক্তিগত কার্য্য সকল স্থির করিতে পারা যায়, তথাপি কেবল মাত্র সেই গুলিতে স্বাধীনতা প্রয়োগ করিবার শক্তিকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলা যায় না।

বাস্তবিক ঐ সামান্য স্বাধীনতাও মানবের নাই। কেননা

তাহা হইলে পাপ পুণ্য ও ভাল মন্দ বিচার থাকে না। যদি ঈশ্বর আমাদিগকে কোনও প্রকার স্বাধীনতা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যে বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, তদ্বিষয়ক ভাল মন্দ যাহা ইচ্ছা করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন বলিতে হইবে। সুতরাং ভাল করিলে ভাল ফল বা মন্দ করিলে মন্দফল হইবে না। যদি ভাল মন্দ কার্য্য জন্য ভাল মন্দ ফল হইল, তবে আর মানবের স্বাধীনতা কোথায় থাকিল? তাহা হইলে ত মানব ভাল করিতেই বাধ্য হইল, সুতরাং মানবের কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকিল না। আবার যদি ভাল কার্য্যের ভাল ফল ও মন্দ কার্য্যের মন্দ ফল না থাকিল, তাহা হইলে ত বিচারই আবশ্যক থাকিল না, ভেদ ফুরাইয়া গেল। তাহা হইলে মানবের মানবত্ব দূরে থাকুক পশুত্ব পর্য্যন্তও থাকে না। এই সকল বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মানবের স্বাধীনতা নাই। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা মানবের অসভ্যাবস্থার কথা। আমরা পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব যে, সকল কার্য্যই মানবের সমাজগত।

যখন মানবের স্বাধীনতা নাই সপ্রমাণ হইল, তখন স্বাধীনতার অপব্যবহার কখনও সমত্ব ভঙ্গের কারণ হইতে পারে না। বাস্তবিক ঈশ্বর সকলকে সমান শক্তি ও সকল বিষয়ে সমান অধিকার দেন নাই। বিশেষতঃ কেবল মানবেরই স্বাধীনতা আছে বলিতেছ, অপর জীব বা উদ্ভিদের ত স্বাধীনতা নাই। তবে পশ্বাদি পরস্পর অসম কেন? বৈষম্য ত কেবল মানবের মধ্যে নহে, সমগ্র বিশ্ব যে বৈষম্যময়। যেদিকে দৃষ্টি করা যায়, সেই দিকেই কেবল বৈষম্য দৃষ্ট হয়। সংযোগ-বৈষম্য, বিস্তৃতি-বৈষম্য,

বর্ণ-বৈষম্য, শক্তি-বৈষম্য, নানা প্রকার বৈষম্যে বিশ্ব পরিপূর্ণ। আকাশ, বায়ু, আলোক, তাপ, জল, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, প্রস্তর সকলই বিষম ; নদী, পর্ব্বত, অরণ্য, মরুভূমি, সাগর, মহাসাগর সকলই বিষম ; বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, মৎস্য, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী, মানব সকলই বিষম ; বিশ্বের সমস্তই বিষম। আবার প্রত্যেক জাতীয় পদার্থ সকলও পরস্পর সম্পূর্ণ বিষম। কোনও একটীর সহিত আর একটীর সর্ব্বাবয়বে মিল আছে, এমত পদার্থই জগতে দৃষ্ট হয় না ; অধিক কি যে যমজ সন্তানদ্বয়কে সর্ব্বাবয়বে সমান বোধ হওয়ায় পরস্পরকে চিনিয়া লওয়া যায় না, তাহাদেরই পরস্পরের এত বৈষম্য যে, ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। অতএব বৈষম্য, ঈশ্বরের একান্ত অভিপ্রেত।

বাস্তবিক বৈষম্য না হইলে বিশ্ব রচনা হইতেই পারিত না ; তাহা হইলে এই বিশ্ব একইরূপ পদার্থে পরিপূর্ণ হইত। এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থকে পৃথক্ বলিয়া চিনিবার উপায় কেবল বৈষম্য। সুতরাং বৈষম্য না থাকিলে পদার্থসকল সর্ব্বপ্রকারে এক রূপই হইত, চিনিবারও কোন উপায় থাকিত না। কিন্তু কেবল আকারে বিষম বলিলে নিস্তার পাওয়া যায় না। কেননা সকল পদার্থ যদি সমান শক্তি সম্পন্ন হয় তাহা হইলে এক পদার্থ হইতে অপর পদার্থকে পৃথক বলিয়া চিনিবার আবশ্যকতাই থাকে না ; কারণ যখন যে কোনও পদার্থ দ্বারা সমান কার্য্য সম্পন্ন হইবে, তখন যে কোন পদার্থ পাইলেই চলে, চিনিয়া কোনও একটী লওয়ার আবশ্যক থাকে না। আবার সকল পদার্থ সমান শক্তিসম্পন্ন হইলে জগতে উন্নতিই হইতে পারে না। সমশক্তিবলে পদার্থসকল চিরকাল একইরূপ কার্য্য

করিবে। সুতরাং তাহা হইলে জগতে এক প্রকার মাত্র কার্য্য থাকে। বাস্তবিক সৃষ্টির প্রাক্‌কালে ও প্রলয়ের পরে ভিন্ন সাম্য বিরাজ করিতে পারে না। সে সময় আকাশ ভিন্ন কিছুই থাকে না, সুতরাং সে অবস্থাকে সাম্যাবস্থা বলা যাইতে পারে। সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াই বৈষম্য জন্মিতে থাকে। তখন আকাশ হইতে বিষম বায়ু, তেজ, জল ও মৃত্তিকা জন্মে। তাহা হইতে ক্রমে প্রস্তরলৌহাদি জড়পদার্থ, বৃক্ষলতাদি উদ্‌ভিদ, কীট পতঙ্গাদি ক্ষুদ্রপ্রাণী, পশুপক্ষ্যাদি ইতর জীব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব জন্মিল। ক্রমেই বৈষম্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মানব সভ্য হইয়া আরও বৈষম্য বৃদ্ধি করিয়াছে। যে জাতি যত উন্নত বা সভ্য, সে জাতি পরস্পর তত অধিক বিষম। এক জাতীয় জড় পদার্থের বৈষম্য অতি অল্প, এক জাতীয় উদ্ভিদের বৈষম্য তাহা হইতে অধিক, পশু পক্ষ্যাদির বৈষম্য তাহা হইতেও অধিক, অসভ্য মানবের বৈষম্য তাহা হইতেও অধিক এবং উন্নত সভ্যজাতির বৈষম্য অত্যন্ত অধিক। জড়ের বৈষম্য বুঝিয়া উঠা ভার; সকল লৌহখণ্ড বা সকল সুবর্ণখণ্ডই প্রায় একরূপ, উহা অপেক্ষা মিশ্রিত পদার্থের বৈষম্যের পরিমাণ অধিক; সেই জন্য মৃত্তিকা, বায়ু প্রভৃতির অনেক বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন মৃত্তিকা উর্ব্বরা, কোন মৃত্তিকা অনুর্ব্বরা, কোন বায়ু স্বাস্থ্যকর, কোন বায়ু প্রাণনাশক ইত্যাদি বিবিধ গুণাবলম্বী! উদ্ভিদের বৈষম্য উহাদিগের অপেক্ষাও অধিক। এক আম্রজাতীয় বৃক্ষে কত ভিন্ন প্রকার আম্রফল জন্মে। অপর একজাতীয় বৃক্ষের ফলগত বৈষম্য আম্রের ন্যায় অধিক নয় বটে, কিন্তু সকল জাতীয় বৃক্ষেরই ফল সকলের আকার ও স্বাদগত

বৈষম্য বিলক্ষণ আছে; আকৃতি ও স্থায়ীত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বৈষম্যও অল্প নহে। জীবের বৈষম্য উদ্ভিদ্ হইতেও অধিক। এক জাতীয় জীবের মধ্যে কোনটী স্থূলাকার, কোনটী কৃশ, কোনটী সুন্দর, কোনটী কুৎসিত, কোনটী শান্ত, কোনটী উদ্ধত, এবং কোনটী দুর্ব্বল ও কোনটী বলবান। কোন গাভী অপরিমিত দুগ্ধ প্রদানকরে ও কোন গাভী অতি অল্প দুগ্ধ দেয়; কোন অশ্ব অতি দ্রুত গমন করে, কোন অশ্ব নিতান্ত মৃদু চলে। মানবের বৈষম্য সর্ব্বপ্রকার জীব অপেক্ষা অধিক। কিন্তু অসভ্য মানবের বৈষম্য তত অধিক নহে। নিতান্ত অসভ্যজাতীয় নিতান্ত অক্ষমের সহিত সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানের বৈষম্য, সভ্য জাতীয় উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের বৈষম্যের সহিত তুলনায়, বৈষম্য নয় বলিলেই হয়। কেননা অসভ্যজাতীয় বৈষম্য কেবল স্বাভাবিক শক্তি লইয়া। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, তিনি সে জাতির রাজা, অপরের সহিত তাহার বৈষম্য কেবল স্বাভাবিক শক্তি মাত্র লইয়া। আহার, বিহার, গৃহ, বেশ, বিদ্যা, জ্ঞান সমস্ত বিষয়ই রাজা ও প্রজার প্রায় সমান অবস্থা। কিন্তু সভ্যজাতীয়গণের পরস্পরের বৈষম্য অতিশয় অধিক।

এ বিষয়ে আমরা সাম্যতত্ত্ব প্রচারকারী ইংরাজদিগের উদাহরণ গ্রহণ করিব। জাতিভেদপ্রথাদ্বারা হিন্দুগণের কৃত্রিম বৈষম্য জন্মিয়াছে, এইজন্য হিন্দুর উদাহরণ গ্রহণ করিতে চাহি না। ইংলণ্ডের একজন নিতান্ত দরিদ্র ও একজন লর্ড বংশীয় ধনীর সহিত তুলনা করিয়া দেখ, তাহাদের কত বৈষম্য। দরিদ্রের অন্ন নাই, গৃহ নাই, শীতনিবারণোপযোগী বস্ত্র নাই, স্ত্রী

নাই, বিদ্যা নাই, আবশ্যক কিছুই নাই; সে দিবারাত্রি ভয়ঙ্কর পরিশ্রম সহ অতি ঘৃণেয় কার্য্য করিয়া কোনও প্রকারে যে জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহা মানবের যোগ্যই নয়; সে যাহা খায়, যেস্থানে বাস করে, যে বস্ত্র পরিধান করে, তাহা অতি জঘন্য ও শরীরপালনশাস্ত্রমতে রোগ-নিদান। কিন্তু লর্ডতনয় কি অবস্থায় থাকেন দেখ। তাঁহার গৃহ ও গৃহসজ্জা দেখিলে দরিদ্রের চক্ষু ধাঁধিয়া যায়, তাঁহার বেশ ও গাড়িঘোড়ার পারিপাট্য দেখিয়া সে নিস্তব্ধ হয় এবং তাঁহার বিদ্যা ও চিন্তা সকলের মর্ম্ম তাহার বুঝিবারই সামর্থ্য নাই। এত অধিক দেখিতে হইবে কেন, একজন কুলি বা একজন ডাকহরকরা মাসিক দশটাকা বেতন পায়, আর একজন প্রধান বিচারক বা রাজপ্রতিনিধি লক্ষটাকা বেতন পাইয়া থাকেন। ঐ প্রধান বিচারপতির সহাধ্যায়ী সম বা উচ্চশ্রেণীর একজন কেরানিগিরি করিয়া কুড়িটাকা মাত্র বেতন পাইতেছেন। একজন সেলর মদ্যপান ও নিতান্ত অসভ্যব্যবহার করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছে, আর কেহ বেকন্, কেহ মিল, কেহ বিকন্স্‌ফিল্ড্ হইয়া অনন্ত জ্ঞানালোচনায় মগ্ন রহিয়াছেন। এইরূপে দেখা যায় যে, সভ্য দেশে মানবের বৈষম্য অতিশয় প্রবল। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যে, সৃষ্টিকাল হইতে আরম্ভ হইয়া যতই উন্নতি হইতে থাকে ততই বৈষম্য বৃদ্ধি হয়। বৈষম্য বৃদ্ধিই উন্নতি ও সভ্যতা, বৈষম্যের অল্পতাই ধ্বংসের প্রাক্‌কাল এবং বৈষম্যই মানবের মানবত্ব। বাস্তবিক উন্নতিই যদি মানবের মানবত্ব ও ঈশ্বরাভিপ্রেত হয়, তবে বৈষম্য যে ঈশ্বরের একান্ত অভিপ্রেত তাহাতে আর কথা কি? কেননা যে মানব যতই উন্নত হইবে,

ততই অন্যান্য অসভ্য মানবের সহিত ও অন্যান্য জীব ও পদার্থের সহিত তাহার বৈষম্য বৃদ্ধি হইবে।

অমুক বড় আমি ছোট, আমি উহার ন্যায় বা উহা অপেক্ষা বড় হইব, অমুক উত্তম দ্রব্য আহার, উত্তম স্থানে বাস ও উত্তমরূপে শীতাতপ নিবারণ করিতেছে, আমি সেরূপ পারিতেছি না, আমি উহার ন্যায় বা উহা অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট অবস্থায় থাকিব, এই ইচ্ছা হইতেই চেষ্টা হয় এবং সেই চেষ্টা হইতেই মানবের সভ্যতা ও উন্নতি। যদি সকলেই সমান রূপ শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিত, ও চেষ্টা করিলে সকলেই সমান হইত, তাহা হইলে সকলেরই সুখ দুঃখ সমানরূপ হইত। সুতরাং কেহ কোন অভাব পূরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিত না, উন্নতিও হইত না; তাহা হইলে মানব পশ্বাদি হইতেও হীনভাবে চিরকাল অবস্থিত হইত। অতএব বৈষম্যের পরিমাণ যত অল্প হয়, ততই অসভ্যত্ব, পশুত্ব ও জড়ত্ব এবং বৈষম্যের পরিমাণ যত অধিক হয় ততই মানবত্ব, উন্নতি ও সভ্যতা।

আর এক কথা,—যদি সাম্যই ঈশ্বরের নিয়ম হয়, তাহা হইলে সকলেই সমান কাল জীবিত থাকিবে এবং সমানরূপ ভোজন ও সমানরূপ দার গ্রহণ ও সমানরূপে পুত্রাদি উৎপাদন করিবে। কিন্তু তাহা করে না কেন? কেহ শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকে ও কেহ জন্মমাত্র বা গর্ভমধ্যেই মৃত হয়, ইহার কারণ কি? মানবের যত প্রকার স্বত্ব আছে তন্মধ্যে জীবনস্বত্বই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিতে হইবে। কেননা জীবনই সকল কার্য্যের মূল। কি আস্তিক কি নাস্তিক সকল মতেই জীবন সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। জীবন না থাকিলে সুখদুঃখ, উন্নতি অবনতি কিছুই

হয় না। ইহকাল কি পরকালের কিছুই থাকে না। যখন সত্তাই থাকিল না তখন কার্য্য কি প্রকারে হইবে? এমত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় জীবনস্বত্বই যখন মানবের নাই, তখন আর মানবের আছে কি? সমজীবন যদি প্রাকৃতিক নিয়ম হইত তাহা হইলে আয়ুষ্কালের এত ভিন্নতা হইত না। একদিনে ও ১৩০ বৎসরের বৈষম্য হইত না। মানবের দোষই যদি আয়ুবৈষম্যের কারণ হইত, তাহা হইলে কখনও এত প্রভেদ হইত না। মানবের কি এত দুর্নিবার শক্তি আছে যে, ঈশ্বরের নিয়মাবলী গুলিও একবারে বিচ্ছিন্ন ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে? গর্ভমধ্যে থাকিয়াও মানব এত শক্তি প্রকাশ করিতে পারে? গর্ভস্থ ভ্রূণও কি স্বাধীন? যদি বাস্তবিকই মানবের এরূপ শক্তি থাকে, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই ঈশ্বরাভিপ্রেত। নতুবা তাঁহার অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ এত প্রবল শক্তি মানব কোথায় পাইল?

বাস্তবিক সমজীবন যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয় তাহা ইহা দ্বারা আরও বুঝা যাইতেছে যে, পৃথিবীতে এত অকালমৃত্যু রহিয়াছে, তথাপি মানবের আহারদ্রব্য সংকুলান হইতেছে না। দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা নিয়ত মানবসংখ্যার হ্রাস হইতেছে, তথাপি পৃথিবী সুভিক্ষ হয় না। যদি সকলে দীর্ঘজীবী হইয়া নিয়ম মত অজস্র পুত্রাদি উৎপাদন করিত, তাহা হইলে কি প্রকারে সেই বহুসংখ্যক জীবের আহার দ্রব্য সংকুলান হইত ও কি রূপেই বা এই পৃথিবীতে তাহাদের স্থান হইত? যখন ঈশ্বর জীবসংস্থিতি ও আহারীয় উৎপাদনের উপযোগী যথেষ্ট স্থানব্যবস্থা করেন নাই, তখন সমজীবন যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয় তাহাতে আর সন্দেহ কি?

মাল্‌থস্ এ বিষয় সুন্দররূপ বিবৃত করিয়াছেন, এজন্য এ বিষয় সম্বন্ধে আর অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই। আর্য্যপণ্ডিতেরা এই সকল বুঝিয়াই বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিবিশেষের আয়ুঃ স্বতন্ত্র; যাহার যে আয়ুঃ সেই কাল পূর্ণ হইলে, তাহাকে মরিতেই হইবে, কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ইহার অর্থ এই যে, যাহার যেরূপ জীবনীশক্তি সে তদনুরূপ জীবিত থাকে।

সাম্য যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয় তাহার আর একটী প্রমাণ এই যে, এ জগতে রাজা, মন্ত্রী, কৃষক, শ্রমজীবী, কর্ম্মকার, স্বর্ণ-কার, তন্তুবায়, সূত্রধর, রজক, মিস্ত্রি, ধাঙ্গড়, মেথর, মুদ্দফরাস, প্রভৃতি সকল প্রকার শ্রেণীর লোকেরই প্রয়োজন, উহার কোন একশ্রেণী মাত্র লোকের দ্বারা জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। সুতরাং মানবের উক্তরূপ নানা অবস্থা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে আর সাম্য থাকিল কৈ? রাজায় প্রজায়, কৃষকে মেথরে কিরূপে সমান হইবে? এই সকল কথার উত্তরে সাম্যবাদীরা বলিতে পারেন যে, সম্পূর্ণসাম্য ঈশ্বরের অভিপ্রেত না হউক, কিন্তু অবস্থাগত সাম্যভাব তাঁহার অভিপ্রেত অর্থাৎ সকল ব্যক্তির সমানরূপ ভোজন সমানরূপ স্থানে বাস, সমানরূপ জ্ঞানোপার্জ্জন ইত্যাদি হওয়া ঈশ্বরের একান্ত অভিপ্রেত। যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা বিজ্ঞানের মস্তকে পদাঘাত করেন। কেননা যখন সপ্রমাণ হইল যে সমস্ত মানবের উপাদান পদার্থ সমান নহে, তখন মানবের কার্য্য সকল সমান কি প্রকারে হইবে? উপাদান পদার্থ সমান না হইয়া কার্য্য সমান হইলে বিষম পদার্থের শক্তি সমান বলিতে হয়,

কিন্তু তাহা বৈজ্ঞানিক যুক্তির একান্ত বিরুদ্ধ। প্রস্তর কি লৌহের ন্যায় কঠিন হইবে, না পিত্তল সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে? মৃত্তিকা কাচের ন্যায় মসৃণ হইবে, না জল অগ্নির ন্যায় উষ্ণ হইবে? বলবান যেরূপ প্রভুত্ব করিবে, দুর্ব্বল কি সেইরূপ প্রভুত্ব লাভ করিবে? না সুন্দর পুরুষ যেরূপ প্রিয়দর্শন হইবে, কদাকার পুরুষ সেইরূপ প্রিয়দর্শন হইবে? বুদ্ধিমান যেরূপ বিদ্যালাভ করিবে, নির্ব্বোধ কি সেইরূপ বিদ্যালাভ করিবে? না কবি, সুকণ্ঠী ও চিত্রকর প্রভৃতি যেরূপ কবিতা, সংগীত ও চিত্রাদি দ্বারা লোকের মনোহরণ করিবে, অক্ষম অপটু ব্যক্তি সেইরূপ লোক-মনোহরণ করিতে পারিবে? তাহা যদি না পারিল, তবে বলবান ও দুর্ব্বল, সুরূপ ও কুৎসিত, বুদ্ধিমান ও নির্ব্বোধ এবং কবি ও অকবি কিরূপে সমানরূপ উপার্জ্জন করিবে? উপার্জ্জন সমান না হইলে অবস্থাই বা সমান হইবে কেন? অতএব সাম্যবাদী দিগের অবস্থাসাম্যবাদও নিতান্ত অসার।

তবে কি অক্ষমের স্থান পৃথিবীতে হইবে না? ঈশ্বর কি অক্ষমদিগকে কষ্ট দিতেই সৃষ্টি করিয়াছেন? যখন সুপ্রমাণিত হইল যে, কাহারও স্বাধীনতা নাই ও সকল মানবের সমান হইবার অধিকার নাই, তখন ত ইহাই বলা হইল যে, বলবান নিয়ত দুর্ব্বলের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে, ও তাহার সমস্ত স্বত্ব অপহরণ করিবে। বাস্তবিক তাহা নহে; কেননা মানবের যখন স্বাধীনতা নাই, তখন কি বলবান কি দুর্ব্বল কাহারই স্বাধীনতা নাই বলিতে হইবে। সুতরাং সম্পূর্ণ শক্তির অনুরূপ কার্য্য কেহই করিতে পারে না, এবং যাহার যে স্বত্ব ও অধিকার আছে, তাহা অপহরণ করিবার অধিকারও কাহারও নাই। শক্তি অনুসারে

কেহ রাজা কেহ প্রজা, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ হইলেও যাহার যে বিষয়ে অধিকার আছে, তাহার বাধা প্রদান করিবার অধিকার কাহারও নাই। যে ব্যক্তির রাজা হইবার শক্তি ও অধিকার নাই, তাহার যদি প্রজা হইবার শক্তি ও অধিকার থাকে, তবে রাজা বা অন্য কেহ তাহার সে শক্তির বিরোধাচরণ করিতে পারেন না। প্রজাগণেরও রাজশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির রাজপদের বাধা দিবার অধিকার নাই। ঈশ্বর সকলকে সমান শক্তি দেন নাই বটে, কিন্তু তিনি যাহাকে যে শক্তি দিয়াছেন, অন্যের শক্তির নাশ না করিয়া সে শক্তি ব্যবহার করার অধিকার তাহার আছে। সেই অধিকার রক্ষারই নামই স্বাধীনতা। হিন্দুর জাতিভেদপ্রথা মানবের এই স্বাধীনতা স্বত্বের সংরক্ষক। যে পরিমাণ সাম্য ও স্বাধীনতা মানবের সম্ভব, তাহা ঐ জাতিভেদপ্রথা দ্বারাই সংরক্ষিত হয়; তাই ভারতে যেরূপ সাম্য আছে, আর কোন সভ্য দেশে সেরূপ সাম্য নাই। জাতিভেদপ্রকরণে এ বিষয়ের যথাযথ আলোচনা করা যাইবে।

সর্ব্বশেষে সাম্যবাদীরা এই আপত্তি করিতে পারেন যে, যদি ঈশ্বর মানবকে সমস্বত্ব না দিয়া থাকেন বলাযায়, তাহা হইলে তাঁহাকে পক্ষপাতী বলিতে হয়। বাস্তবিক ঈশ্বরের এই কলঙ্ক মোচনের জন্যই সাম্যতত্ত্বের কল্পনা হইয়াছে। কিন্তু এ আপত্তি অতি অকিঞ্চিৎকর। কেননা সকলকে সমান না করিলে যে ঈশ্বরের পক্ষপাত করা হয় তাহার অর্থ কি? তাহা হইলে ত তাঁহার সৃষ্টি কার্য্যই পক্ষপাতপরিপূর্ণ। কারণ কেবল মানব জাতিকে পরস্পর সমান করিলেই তাঁহার পক্ষপাতদোষের ক্ষালন হয় না। পশু পক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতি ভেদ থাকিলেও ত সে

দোষ দূরীভূত হয় না। কিন্তু যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে জগৎ ঐরূপ বৈষম্যে পরিপূর্ণ বৈষম্য ভিন্ন জগৎকার্য্য চলিতেই পারেনা, তখন কেবল-মাত্র কাল্পনিক যুক্তিবলে ঈশ্বরকে সমদর্শী বলিবার জন্য এই প্রত্যক্ষের অপলাপ করা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ ঈশ্বরের কিছুমাত্র পক্ষপাতিতা নাই। কেননা স্থূল চক্ষে মানবের অবস্থাগত অনেক ভেদ দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ সকলেই সমান সুখী। রাজার ও কৃষকের মনোসুখের কিছুমাত্র ভিন্নতা নাই। বিষ্ঠাবাহা মেথরও মনোসুখে কোন প্রকারে অন্য হইতে হীন নহে। ঈশ্বর আমাদিগকে এমন করিয়াছেন যে, আমরা যে অবস্থায় থাকি তাহাতেই প্রায় সমান সুখ পাই, অর্থাৎ সুখ দুঃখ রাজারও যেমন প্রজারও সেইরূপ। রাজা অট্টালিকা-বাসে যেরূপ সুখী হয়েন, প্রজা কুটীরে বাস করিয়াও সেইরূপ সুখ লাভ করে। শিহ্লন মিশ্র বলিয়াছেন।—

> ইন্দ্রস্যাশুচি শূকরস্যচ সুখে দুঃখে চ নাস্ত্যন্তরং।।
> স্বেচ্ছা কল্পনয়া তয়োঃ খলু সুধা বিষ্ঠাচ কাম্যাশনং।
> রম্ভাচাশুচি শূকরীচ পরম প্রেমাস্পদং মৃত্যুতঃ।
> সংত্রাসোপি সমঃ স্বকর্ম্মগতিভিশ্চান্যোন্য ভাবঃ সমঃ।

ইন্দ্র ও শূকরের সুখ দুঃখে ভেদ নাই, কেননা ইচ্ছাপূর্ব্বকই ইন্দ্র অমৃত ও শূকর বিষ্ঠা ভক্ষণ করে; ইন্দ্রের রম্ভা ও শূকরের শূকরী সমানই প্রেমাস্পদ এবং মৃত্যুকে উভয়েই সমান ভয় করে।

তবে ভাল অবস্থা হইতে মন্দ অবস্থায় পড়িলে মানবের অনেক কষ্ট হয় বটে, কিন্তু জাতিভেদ প্রথা এই দুঃখ নিবারণের মহৌষধ। জাতিভেদ প্রকরণে এবিষয়ের বিবরণ করা যাইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তব্য নিরূপণের উপায়।

মানবের স্বত্তার যে সকল প্রয়োজন তন্মধ্যে কার্য্যই প্রধান, এমন কি কার্য্যই মানবের সর্ব্বস্ব বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কেননা মানবের উন্নতি, অবনতি, সুখ, দুঃখ, স্বর্গ, নরক, মান, অপমান, পাপ, পুণ্য সমস্তই কার্য্যগত। আমরা যে ঈশ্বরতত্ত্বকে জীবনের লক্ষ্য বিবেচনা করি, যে বিজ্ঞানদর্শন প্রভৃতিকে মানবের মানবত্ব সম্পাদনের মূল বলি, যে শিক্ষা ও নীতিকে মানবের দেবত্বের কারণ বলি, তৎসমস্তই কার্য্য লইয়া। কেবল মানব কেন, সমস্ত জীব ও পদার্থেরই চরম উদ্দেশ্য কার্য্য। কার্য্য হইতেই মানবের মানবত্ব, পশুর পশুত্ব ও জড়ের জড়ত্ব। এই জন্য আর্য্যশাস্ত্রকারেরা পৃথিবীকে কর্ম্মভূমি বলিয়াছেন,—এইজন্য শিহ্লন মিশ্র ঈশ্বর ও দেবতাদিগকে বাদ দিয়া কর্ম্মকেই প্রণাম করিয়াছেন,—এইজন্য বৈয়াকরণগণ ক্রিয়া ভিন্ন বাক্য সম্পন্ন হয় না বলিয়াছেন। অতএব আমাদের কার্য্যনিরূপণ করাই প্রধান কার্য্য, কেবল ঈশ্বর বা বিশ্বের আদি নিরূপণ করিলে চলিবে না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আমরা কেবল আমাদের কার্য্য নিরূপণের জন্যই ঈশ্বরনিরূপণ ও ঈশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া থাকি। অতএব আমাদের কার্য্যনিরূপণ না করিয়া কেবল ঈশ্বর-নিরূপণ করিয়া নিরস্ত হইলে কোন ফল নাই। মনে কর ঈশ্বর আছেন জানিলাম, তাঁহার স্বরূপও অবগত হইলাম,

কিন্তু আমাদের কার্য্য কি জানিলাম না, তাহাতে ফল কি? কি করিলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? এই জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র-সকলে যেমন ঈশ্বর নিরূপিত হইয়াছে, সেইরূপ কর্ত্তব্য কার্য্য সকলের ব্যবস্থাও তাহাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কর্ত্তব্যপরায়ণগণ তদবলম্বনে কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি লোকের তাদৃশ আস্থা না থাকায় মানব কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারেনা; বিশেষতঃ এক্ষণে এমন কতকগুলি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব মাত্র প্রচারিত হইয়াছে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি তদ্বিষয়ের কোন উল্লেখই নাই। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপন আপন যুক্তি অনুসারে কার্য্য স্থির করিতে হয়; কাজেই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কাহারও কোন দৃঢ় জ্ঞান জন্মে না।

নব্যগণের মত এই যে, ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে বৃত্তিবিশেষ দিয়াছেন, সেই বৃত্তি সর্ব্বদা আমাদের হৃদয়ে উপদেশক স্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়া থাকেন। ঐ বৃত্তিকে ইংরাজিতে (Conscience) বলে; বাঙ্গালায় উহার প্রকৃত নাম মিলে না; এজন্য কেহ উহাকে অন্তঃসংজ্ঞা ও কেহ হিতাহিতজ্ঞান বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন হিতাহিতজ্ঞান সর্ব্বদাই আমাদিগকে সুপথ দেখাইয়া দেয়, ঐ বৃত্তির অনুমোদিত কার্য্যের নাম সৎকার্য্য ও ঐ বৃত্তির অননুমোদিত কার্য্যের নাম অসৎ কার্য্য। কিন্তু আমরা ঈশ্বরপ্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছি যে, আমাদিগকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দেয় এমন কোন বৃত্তি আমাদের হৃদয়ে নাই, এবং জ্ঞানপ্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছি যে, জ্ঞান আমাদের সহজ নহে। যে হউক অন্তঃসংজ্ঞা সম্বন্ধে

আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কর্ত্তব্য কি অর্থাৎ কর্ত্তব্যের লক্ষণ কি তাহা জানা আবশ্যক। নচেৎ হিতাহিতজ্ঞান যাহা বলিয়া দেয় তাহা প্রকৃত কর্ত্তব্য কি না, কি প্রকারে তাহার পরীক্ষা হইবে? যদি হিতাহিতজ্ঞান যাহা বলিয়া দেয় তাহারই নাম কর্ত্তব্য হয়, অর্থাৎ তাহাই কর্ত্তব্যের লক্ষণ হয়, কর্ত্তব্যের অন্য কোন লক্ষণ না থাকে, তবে যাহার হৃদয় যাহা বলে তাহাকেই অন্তঃসংজ্ঞানুমোদিত কর্ত্তব্য বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে কার্য্য মাত্রকেই কর্ত্তব্য বলিতে হয়, কোন কার্য্যই অকর্ত্তব্যবাচ্য হইতে পারে না। কেননা লোকে যাহা করে সমস্তই ইচ্ছা পূর্ব্বক করিয়া থাকে।

অন্তঃসজ্ঞাবাদীরা বলেন, মানব ইচ্ছা পূর্ব্বক যে সকল কর্ম্ম করে তৎসমস্তই হিতাহিতজ্ঞানানুমোদিত নহে, হিতাহিত-জ্ঞানের বিরুদ্ধাচারী হইয়াও অনেক কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু সে সকল কার্য্য করিয়া পরে মনস্তাপ পায়। যে কার্য্য করিয়া কিছু মাত্র মনস্তাপ না পায় তাহাই প্রকৃত অন্তঃসংজ্ঞার অনুমোদিত। কিন্তু দেখা যাইতেছে সহস্র সহস্র দুষ্কার্য্য করিয়াও লোকে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, আবার অতি সৎ-কার্য্য করিয়াও মনস্তাপ পায়। মুসলমানেরা কাফেরবধ, শাক্তেরা নরপশুবলি, ও হিন্দুরা সতীদাহ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে; এবং কেন পরের উপকার করিতে গিয়া দরিদ্র হইলাম, কেন পরের প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়া ভগ্নপদ হইলাম, কেন দেশের জন্য প্রাণ হারাইলাম ইত্যাদি বলিয়া অনেকে মনস্তাপ পাইয়া থাকেন। এবম্বিধ লক্ষ লক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে, যে তদ্দারা বুঝা যায় যে, অতি দুষ্কর্ম্ম

করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ হয় ও অতি সৎকার্য্য করিয়াও আত্মগ্লানি জন্মে। অতএব যে কার্য্য করিলে আত্মপ্রসাদ জন্মে, তাহাই হিতাহিত জ্ঞানের অনুমোদিত ও কর্ত্তব্য এবং যে কার্য্য করিলে মনস্তাপ জন্মে, তাহাই হিতাহিত জ্ঞানের অননুমোদিত ও অকর্ত্তব্য এ কথা কিছুতেই বলা যায় না।

বস্তুতঃ আমাদিগকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত ও অসৎকার্য্য হইতে বিরত করিবার উপযোগী কোন বৃত্তিবিশেষের সত্তা উপলব্ধিই হয় না। কেননা যখন দেখা যাইতেছে কুদ্রব্য ভক্ষণে পীড়া বা প্রাণের হানি হয়, তখন নিশ্চয়ই কুদ্রব্যভক্ষণ অকর্ত্তব্য। কিন্তু কোন্ দ্রব্য কু অর্থাৎ আমাদের অপকারক বা প্রাণহানিকর, তাহা ত কোনও মনোবৃত্তি বা হিতাহিতজ্ঞান আমাদিগকে বলিয়া দেয় না। শিশুকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ কর, কোনও সময়েই হিতাহিতজ্ঞানের কোনও কার্য্য লক্ষিত হইবে না, সকল কার্য্যই পরীক্ষাসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইবে। শিশুরা অগ্নিতে হাত দেয়, সর্পের সহিত ক্রীড়া করে, উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যায়, বিষ্ঠা, মূত্র, বিষ প্রভৃতি যাহা পায় তাহাই খায়, প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল ভাঙ্গিয়া বা ছিঁড়িয়া নষ্ট করে, সুবর্ণ দিয়া কাচ লয়, যাহা অহিতকর তাহাই করে। হিতাহিতজ্ঞান যদি সহজ হইবে, তবে বালকেরা এরূপ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য কেন? কেন হিতাহিত জ্ঞান শিশুদিগকে ঐ সকল ভয়ানক অহিতকর কার্য্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত করে না? বালক যত বড় হইতে থাকে তত বিষ্ঠা প্রভৃতি ভোজন ও অগ্ন্যাদিতে হস্ত দেওয়ায় ক্ষান্ত হয় বটে; কিন্তু তখনও অন্য নানাপ্রকার অন্যায়াচরণ করে; পরীক্ষা দ্বারা যাহার অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারে বা

শাসনাধীন থাকায় যাহা করিতে নিবারিত হয়, তাঁহাই মাত্র পরি-ত্যাগ করে, প্রকৃত হিতানুষ্ঠায়ী হয় না। তাহারা বিদ্যাশিক্ষায় নিতান্ত অনিচ্ছুক হয়, প্রাণান্তকর দ্রব্য ভক্ষণে অনুরক্ত থাকে, পীড়া হইলেও আহারে নিয়ত রত থাকে, অতি শিশুকাল হইতে যে পশুপক্ষীকীটাদির হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাতে আরও অনুরক্ত হয়। পরে যৌবনকাল আগত হইলে তাহারা ইন্দ্রিয়পর হয়, নরহত্যা, বেশ্যারতি, পরের ও আপনার অনিষ্টাচরণ প্রভৃতি কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, ভ্রমেও প্রকৃত হিত চিন্তা করে না। যাহারা বাল্যকাল হইতে পিতামাতার প্রভূত যত্নে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহারাই কেবল শিক্ষানুযায়ী সৎকার্য্যে নিরত হয়। কিন্তু তাহাকে হিতাহিত জ্ঞানের আজ্ঞা কি প্রকারে বলিব? সে ত শিক্ষারই কার্য্য। যে ব্যক্তি যেরূপ শিক্ষা পায় সে সেইরূপ কার্য্যই করে। শিক্ষার ভিন্নতা অনুসারে হিন্দুযুবা এক রূপ কার্য্য করে, ইংরাজযুবা অন্য রূপ কার্য্য করে এবং যবনযুবা আর একরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। শিক্ষারই ভিন্নতা জন্য হিন্দুরা যে সতীদাহ, প্রতিমাপূজা, জাতিবিচার প্রভৃতিকে কর্ত্তব্য বলেন, ইংরাজেরা তাহাকে নিতান্ত গর্হিত মনে করিয়া থাকেন; এবং ইংরাজেরা যে বিধবাবিবাহ, মদ্যপান, গোমাংস-ভক্ষণ, সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতিকে কর্ত্তব্য বলেন, হিন্দুরা তাহাকে নিতান্ত অকর্ত্তব্য বলিয়া থাকেন। যদি হিতাহিতজ্ঞান হিতা-হিত জ্ঞানের কারণ হইত, তাহা হইলে কখনই হিতাহিত সম্বন্ধে এবম্বিধ মতপার্থক্য হইত না। বিশেষতঃ আমরা যখন কোন কার্য্য-সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া কি করিব স্থির করিবার জন্য নিতান্ত নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করি অর্থাৎ হিতাহিত

জ্ঞানের নিকট বারম্বার জিজ্ঞাসা করি, যে, এ সময়ে আমাদের কর্ত্তব্য কি বলিয়া দেও, তখনও হিতাহিতজ্ঞান আমাদিগকে কোন হিত পরামর্শ দেয় না। কেননা অনেক সময়েই দেখা যায় যে, মনুষ্যেরা কোনও একটী কার্য্য করিবে কিনা, কিম্বা চিন্তিত উভয় প্রকার কার্য্যের মধ্যে কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিবার জন্য ২।৪ দিন বা ৫।৬ মাস পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া থাকে বা তদ্বিষয়ে হিতাহিতজ্ঞানের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু তথাচ হিতাহিতজ্ঞানকে কোনও হিতোপদেশ দিতে দেখা যায় না। কারণ এত চিন্তা করিয়া মনুষ্য যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতেও সমূহ অমঙ্গল হইয়া থাকে, এমন কি তাহাই অনেক সময়ে তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া পড়ে। বরং যাহারা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া কার্য্য করে, অনেক সময়ে তাহাদের প্রভূত মঙ্গল হইতে দেখা যায়—অনেকে হঠাৎ কার্য্য বিশেষে প্রবৃত্ত হইয়া বড় লোক হয়; এই জন্য অনেকের মত এই যে, কোন কার্য্য করিবার সময় অধিক চিন্তা করা যুক্তিযুক্ত নহে। আবার অনেকে বিদ্যা শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া কুকর্ম্মে রত হয়, শেষে ঐ কুকর্ম্মের সহায়তা জন্য অর্থ আবশ্যক হওয়ায় অতি সামান্য ও হীন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, পরিশেষে বিপুল অর্থোপার্জ্জন করে ও ক্রমে ধর্ম্মশীল পর্য্যন্তও হয়। অতএব যখন হিতাহিতজ্ঞান বাল্যকালে প্রকাশিত হইল না, চিন্তাকালে ও যৌবনে শিক্ষারই সম্পূর্ণরূপ অধীন হইল, তখন তাহার সত্তার প্রমাণ কি, অথবা থাকিলেও তাহার সত্তার প্রয়োজন কি? সুতরাং হৃদয়স্থ বৃত্তিবিশেষের অনুমোদিত কার্য্যকে কর্ত্তব্য বলা যায় না, কর্ত্তব্যের লক্ষণ অন্য রূপ।

কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে মত ভেদই থাকুক, এক বিষয়ে অর্থাৎ মূল বিষয়ে সকলেরই মত এক অর্থাৎ ঈশ্বরাজ্ঞা পালনের নাম যে কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। কি প্রকারে ঈশ্বরাজ্ঞা নিরূপণ করিতে হইবে তাহা লইয়াই পরস্পরের মত ভেদ। যদি এবিষয়ে মত ভেদ না থাকিত তাহা হইলে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র মত ভেদ হইত না। আর এক বিষয়েও সকলের ঐকমত্য দেখা যায়, অর্থাৎ সকলেই বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার আজ্ঞা বা জীবগণের কর্ত্তব্য-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, স্বচেষ্টায় মানব কর্ত্তব্য বুঝিতে পারে না। প্রভেদ এই যে, কেহ বলেন শাস্ত্রগ্রন্থপ্রদানদ্বারা, কেহ বলেন প্রত্যাদেশদ্বারা, কেহ বলেন মহাপুরুষপ্রেরণদ্বারা ও কেহ বলেন হৃদয়স্থ বৃত্তি হিতাহিতজ্ঞানদ্বারা পরমেশ্বর আমাদিগকে কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়া থাকেন। সুতরাং একথা সর্ব্ববাদীসম্মত বলিতে হইবে যে, যাহা কর্ত্তব্য তাহা ঈশ্বর আমাদিগকে কোনও প্রকারে বলিয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু সপ্রমাণ হইল যে হিতাহিতজ্ঞান বা তদনুরূপ কোনও মনোবৃত্তি আমাদের হৃদয়ে নাই এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের লিখিত ব্যবস্থা যে ঈশ্বরেরই কৃত তাহারও কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া যে যায় না। তবে কি প্রকারে বুঝিব যে তিনি আমাদিগকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কি উপদেশ দান করিয়াছেন?

এ বিষয় বুঝিবার চেষ্টার পূর্ব্বে একটী বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। অর্থাৎ কর্ত্তব্য কি কেবল মানবেরই আছে, না অন্য জীবেরও কর্ত্তব্য আছে। যাঁহারা বলেন কেবল মানবেরই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করা আবশ্যক, অন্য জীবের কর্ত্তব্যা-

কর্ত্তব্য নাই, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কেননা ঈশ্বরাজ্ঞা পালনের নাম যখন কর্ত্তব্য, তখন অপর জীবের কর্ত্তব্য নাই বলিলে তাহাদিগকে ঈশ্বরের নিয়ম পালন করিতে হয় না বলিতে হয়। একথা কি নিতান্ত অসঙ্গত নয়? তাহা হইলে তাহাদের উৎপত্তি ও স্থিতিইবা হয় কি প্রকারে? বিশেষতঃ যখন শক্তিপ্রকাশের নাম কার্য্য ও যখন পদার্থ মাত্রেরই ঈশ্বরদত্ত শক্তি আছে ও সকলেই সে শক্তি প্রকাশ বা তদনুরূপ কার্য্য করে, তখন তাহাদের কার্য্য বা কর্ত্তব্য নাই কেন? ঈশ্বর যে পদার্থের যে শক্তি দিয়াছেন তাহাই প্রকাশ করা তাহার কার্য্য সুতরাং পদার্থমাত্রেরই কার্য্য ও কর্ত্তব্য আছে। কাহার কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য বা ঈশ্বরাভিপ্রেত তাহা সেই পদার্থের শক্তি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। যে পদার্থ দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদন করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত তিনি সে পদার্থে সেইরূপ শক্তিই প্রদান করিয়াছেন। অতএব পরমেশ্বরদত্ত শক্তি প্রকাশের নামই কর্ত্তব্য। ঈশ্বর যাহাকে যে শক্তি দিয়াছেন সেই শক্তি প্রকাশ করাই তাহার কর্ত্তব্য। পদার্থ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন শক্তিদানের ইহাই একমাত্র হেতু। লৌহ আকর্ষণ করা চুম্বকের শক্তি; সুতরাং লৌহাকর্ষণ চুম্বকের কার্য্য ও কর্ত্তব্য; মাংসাশী জীবের মাংস ভক্ষণ ও জীবনাশ করিবার শক্তি স্বাভাবিক, সুতরাং আহার জন্য প্রাণিনাশ করা তাহার কার্য্য ও কর্ত্তব্য। মানবের কর্ত্তব্যও ঐরূপ। ঈশ্বর মানবকে যে শক্তি দিয়াছেন তাহা প্রকাশ করা বা সেই শক্তির অনুযায়ী কার্য্য করাই মানবের কর্ত্তব্য। ঈশ্বরদত্ত শক্তি কখনও নিরর্থক নহে।

অনেকে হয় ত বলিবেন যে স্বাভাবিক শক্তি প্রকাশের

নামই যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে ত আর অকর্ত্তব্য কিছুই থাকে না। যে যে কার্য্য করে তৎসমস্তই ত স্বাভাবিক শক্তির অধীন হইয়া করিয়া থাকে। আমরা বলি সে কথা সত্য নহে। জীবগণ আত্মশক্তির পরিমাণ বুঝিতে না পারিয়া ও শক্তি সকলের সামঞ্জস্য না করিয়া অনেক সময়ে শক্তির অননুরূপ কার্য্য করে ও শক্তিবিশেষের কার্য্যের এককালে লোপ সাধন করে; তজ্জন্যই কার্য্য ও কর্ত্তব্যের প্রভেদ হইয়াছে, নতুবা কার্য্য ও কর্ত্তব্য একই কথা। যথাশক্তিজাত কার্য্য কর্ত্তব্য ও অযথাশক্তিজাত কার্য্য অকর্ত্তব্য।

পশ্বাদিরা কিরূপে কর্ত্তব্যরত হইয়া থাকে তাহাই প্রথমে দেখান যাইতেছে। ব্যাঘ্রের প্রাণিবধ করিবার শক্তি আছে, সুতরাং নরবধেও তাহার শক্তি আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মানব-সমাজে আসিয়া মানব বধ করিবার শক্তি তাহার নাই। সেই জন্য কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্যাঘ্র গ্রামনগরাদিতে প্রবেশ করে না। যদি কোনও ব্যাঘ্র নিতান্ত লোভপরবশ হইয়া গ্রামে প্রবেশ করে, তখন সে বিলক্ষণ সাবধান হইয়া চলে; কেননা সে জানে যে, সে শক্তির অতীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সুতরাং বিশেষ রূপ সাবধান না হইলে তাহাকে এই অকর্ত্তব্য কার্য্যকরণ জন্য বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হইবে। শৃগালের প্রাণিবধ করিবার শক্তি আছে, কিন্তু দুর্ব্বল বিধায় সকল প্রকার প্রাণিবধ করিবার শক্তি তাহার নাই, তজ্জন্য সে প্রবলতর প্রাণী আক্রমণের চেষ্টা করে না। কখন কখন তাহারা শিশু হরণ করে বটে, কিন্তু সে যে তাহাদের অকর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা তাহারা বুঝিতে পারে এবং সেই জন্য সে সময়ে বিশেষ রূপ সাবধান হয়। কিন্তু ক্ষিপ্ত শৃগাল সকল

মনুষ্যকেই আক্রমণ করে, কিছুমাত্র সাবধান হয় না। কেননা সে জ্ঞানশূন্য অর্থাৎ কর্ত্তব্য বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। গো মহিষাদির উদ্ভিজ্জ ভোজনের শক্তি আছে বটে, কিন্তু কোন মানবের অধিকৃত উদ্ভিজ্জ ভোজন করিবার শক্তি তাহাদের নাই; সেইজন্য যখন তাহারা কোন শস্যক্ষেত্রে গমন করে, তখন অতি সাবধানে থাকে, মানবের শব্দ পাইলেই পলায়ন করে। বিড়াল পরিত্যক্ত মৎস্য কণ্টকাদি ভক্ষণ করিতে পারে, কিন্তু ভোজন পাত্র হইতে কিছু লইবার শক্তি তাহাদের নাই। সেই জন্য যখন লোভপরবশ হইয়া ভোজনপাত্র হইতে কিছু লইতে যায়, তখন এমন ভাবে লইয়া পলায়ন করে যে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সে যে অন্যায় বা শক্তির অতীত কার্য্য করিতেছে তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছে। এ সকল দ্বারা কি বুঝা যাইতেছে না, যে পশ্বাদিরও কর্ত্তব্য আছে ও কর্ত্তব্য নিরূপণ করা তাহাদের আবশ্যকও বটে? ব্যাঘ্র যদি বিবেচনা না করে যে, তাহার মানবসমাজে যাওয়া উচিত নয়, শৃগাল যদি বিবেচনা না করে যে, তাহার মানবাদিকে আক্রমণ করা উচিত নয়, এবং গোমহিষাদি যদি বিবেচনা না করে যে, তাহাদের মানবের শস্যক্ষেত্রে যাওয়া অকর্ত্তব্য, তাহা হইলে কি তাহাদের ও মানবের সমূহ বিপদের কারণ হয় না? বাস্তবিক পশ্বাদি যদি কর্ত্তব্য পর না হইত, তাহা হইলে হয় ইতর জীব না হয় মনুষ্য ইহার একের একবারে লোপ হইত। হিতাহিতজ্ঞানবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, পশ্বাদির হৃদয়ে হিতাহিত-জ্ঞানবৃত্তি নাই, কিন্তু তবে ইতরপ্রাণিগণ কি প্রকারে কর্ত্তব্য নিরূপণ করে?

হিতাহিতজ্ঞানবাদীরা হয়ত বলিবেন যে, পশুদিগের স্বাভা-

বিক যে ভয় আছে, সেই ভয়ের অধীন হইয়াই তাহারা শক্তির অতীত কার্য্য করিতে বিরত হয়। কিন্তু তাহা হইলে আমরাও বলিব যে মানবও যে কর্ত্তব্যরত হয় তাহারও কারণ ভয়। কেননা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মানবগণ হয় পরকালভয়ে, নয় সমাজ বা রাজার ভয়ে অথবা আপনার অহিত ভয়ে কর্ত্তব্য-নিরত হইয়া থাকে। ভয় ব্যতিরেকে কোন মানবই কর্ত্তব্য পালনে রত হয় না। আর এক কথা, ভয় স্বাভাবিক হইলেও সম্পূর্ণরূপ জ্ঞানসহচর—অনিষ্ট হইবে এ জ্ঞান না জন্মিলে কেহ কোন বিষয় হইতে ভয় পায় না। তাই শিশুরা সর্প লইয়া খেলা করিতে ভয় করে না এবং শিশু গোমহিষাদি নির্ভয়ে মানবাধিকৃত শস্যক্ষেত্রে বিচরণ করে।

যাহার যে শক্তি আছে তাহা অবাধে প্রকাশ করিতে পারাকে স্বাধীনতা বলে; স্বাধীনতা চরিতার্থের অপর নাম সুখ। শক্তি প্রকাশের পূর্ব্বভাবের নাম ইচ্ছা। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ইচ্ছা পূরণ বা সুখই মানবের উদ্দেশ্য—সুখ সাধন হইলেই মানবের তৃপ্তি হয়। কেননা পরমেশ্বর যাহা দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদন করাইবার অভিপ্রায় করিয়াছেন, তাহাকে তদনুরূপ শক্তি দিয়াছেন। সুতরাং প্রাপ্ত শক্তির অনুরূপ কার্য্য করিলে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হয়। কিন্তু মানবে ঈশ্বর-দত্ত নানা প্রকার শক্তি নিহিত আছে, সুতরাং যত প্রকার শক্তি মানবে আছে, তৎসমুদায়েরই শক্তি প্রকাশ করিতে না পারিলে মানব প্রকৃত সুখী হইতে পারে না, তাহার কর্ত্তব্যও সাধিত হয় না। কিন্তু তাহা নিতান্ত অসম্ভব। কারণ মানবীয় শক্তি সকল এরূপ পরস্পরবিরোধী যে, একের তৃপ্তি সাধন করিতে

হইলে অপরের বিরোধাচরণ করিতে হয়। সুতরাং এক বিষয়ে সুখী ও কর্ত্তব্যপর হইতে হইলে, অপর বিষয়ে অসুখী ও অকর্ত্তব্য-পরায়ণ হইতে হয়। আবার মনুষ্য সকল পরস্পর সমধর্ম্মী প্রযুক্ত একের শক্তি প্রকাশ করিতে হইলে, অপরের শক্তি প্রকাশের বাধা হয়। সুতরাং একের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গেলে অপরের স্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মে। কিন্তু যখন প্রত্যেক মনুষ্য ও প্রত্যেক শক্তি বিশেষ কার্য্য সাধন জন্য নিযুক্ত, একটীও বৃথা সৃষ্ট নয়, তখন কাহারও স্বাধীনতা নষ্ট করিলে উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব শক্তি সকলের সামঞ্জস্য করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই সকলের সর্ব্বপ্রকার শক্তির চরিতার্থতা হয়। এক শক্তি কেবল উদর-পূরণে ব্যস্ত, কোন্ দ্রব্য ভোজনে পীড়া হইবে তাহার প্রতি তাহার কিছুমাত্র লক্ষ নাই, উদর পূর্ণ হইলেই তাহার হইল সুতরাং এই বৃত্তির মতানুসারে চলিলে মানব রোগাক্রান্ত ও অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। মানবের অপর শক্তি কেবল শরীর-রক্ষণে নিযুক্ত,—পাছে পীড়িত বা জীবন হারাইতে হয় এই ভয়ে সে সকল দ্রব্যই ভোজন করিতে ভয় পায়। সুতরাং তদনুসারে চলিলে অল্পাহারে শীর্ণ বা অনাহারে জীবন হারা-ইতে হয়। অতএব ঐ উভয় বৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া এরূপ পরি-মাণে এরূপ দ্রব্য ভোজন করিতে হইবে, যেন অধিক বা কুদ্রব্য ভক্ষণে শরীর নষ্ট না হয় অথচ অল্পাহারেও শরীর শীর্ণ না হয়। ঐরূপ একটী আম্র খাইতে রামেরও ইচ্ছা হইয়াছে, শ্যামেরও ইচ্ছা হইয়াছে, রাম লইলে শ্যামের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না অথবা শ্যাম লইলে রামের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। হয়ত ঐ জন্য উভয়ে

বিবাদ করিয়া একজন বা উভয়ে নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু সামঞ্জস্য করিয়া আম্রটী উভয়ে ভাগকরিয়া লইলে উভয়েই সুখী হয়। এই প্রকারে নিজের ও পরস্পরের শক্তিসকলের সামঞ্জস্য করাই বিশ্বনিয়মের উদ্দেশ্য, সুতরাং তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। বিবেক নামক মনোবৃত্তি এই সামঞ্জস্য করিবার মধ্যস্থস্বরূপ।

কর্ত্তব্য দুই প্রকার :—ব্যক্তিগত ও সামাজিক। আমাদের স্ব স্ব দেহে যে সকল পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তি আছে, তৎসমস্তের সামঞ্জস্য করাকে ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য এবং নিজের ও অপর সকলের মধ্যে যে সকল পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তি আছে তৎসমস্তের সামঞ্জস্য করাকে সামাজিক কর্ত্তব্য বলে। প্রত্যেক শরীরেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, সাহস, বীর্য্য প্রভৃতি ও ঐসকলের বিপরীত-ধর্ম্মী ধৈর্য্য, বিনয়, ক্ষমা, দয়া, ভয়, লজ্জা প্রভৃতি শক্তি আছে। ঐ আত্মগত প্রবল ও দুর্ব্বল বৃত্তি সকলের সামঞ্জস্য করার নাম ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য। আবার কোন মানবে ঐ সকল বৃত্তির কোনওটী অধিক ও কোনওটী অল্প পরিমাণে আছে। মানবগণের পরস্পরের মধ্যগত সেই সকল প্রবল ও দুর্ব্বল শক্তি সকলের সামঞ্জস্য করার নাম সামাজিক কর্ত্তব্য। কি ব্যক্তিগত কি সামাজিক যে কোন প্রকার কর্ত্তব্যের অবহেলা করিলেই আপনার ও সমাজের ক্ষতি হয়। কেননা সকলে বা অধিকাংশ লোকে ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যের অবহেলা করিলেই সমাজের ক্ষতি হইল। আবার ব্যক্তিগত পাপ অনুকরণ দ্বারা সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া সমাজকে নষ্ট করে। আরও দেখ, যে ব্যক্তি নিজে ক্ষতি করিয়া নাশ প্রাপ্ত হয় তাহা দ্বারা সমাজের যে উপকার হইত তাহা হইতে না পারায় সমাজের ক্ষতি হয়। ক্লাইব আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন;

যদি তিনি আত্মনাশ করিতেন তাহা হইলে ইংরাজসমাজের ভারতাধিকার রূপ উপকার হইত কিনা সন্দেহ। অতএব ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য পালনে সমাজের উপকার ও অপালনে সমাজের অপকার। এই জন্যই আমরা বলিয়াছি মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাই। সমাজের হিত বা অহিত দ্বারা যে আপনার হিত বা অহিত হয় তাহা বোধ হয় বুঝাইয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। কেননা সমাজের সহিত বিরোধ করিয়া কে টিকিতে পারে; এবং সমাজের মঙ্গল না হইলেই বা কাহার বা মঙ্গল সম্ভব?

শক্তিসামঞ্জস্যের নাম যেন কর্ত্তব্য হইল, কিন্তু শক্তিসামঞ্জস্য কাহাকে বলে? প্রবল শক্তির খর্ব্বতা ও দুর্ব্বল শক্তির পরিবর্দ্ধন করিয়া উভয় শক্তিকে সমান করাকে কি সামঞ্জস্য বলিব? আমাদের বোধ হয় তাহা নহে। কেননা তাহা হইলে সকল ব্যক্তিরই সকল শক্তির কার্য্য সমান হইবে; সুতরাং তাহা হইলে প্রবল ধী-শক্তিসম্পন্ন, অগ্রগণ্য বীর, মহাকবি, বিখ্যাত দানবীর, অত্যন্ত প্রণয়ী প্রভৃতি অধিক গুণবিশিষ্ট কেহই পৃথিবীতে থাকে না, সমস্তই মধ্যম প্রকারের হইয়া সাম্যভাব ধারণ করে। কিন্তু তাহার অসম্ভবত্ব সাম্য প্রকরণে সপ্রমাণ হইয়াছে। যখন স্বাভাবিক সাম্য অসম্ভব, তখন কৃত্রিম সাম্য কি প্রকারে সম্ভব হইবে? বিশেষতঃ যদি সকল ব্যক্তিকে একই প্রকার কার্য্য করিতে হইবে, তবে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বৃত্তি প্রদানের কোন উদ্দেশ্যই থাকে না। অতএব সকল বৃত্তি বা সকল ব্যক্তিকে সমান করার নাম সামঞ্জস্য নহে। সামঞ্জস্য করা কাহাকে বলে তাহা সামঞ্জস্য করার কারণ বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে। প্রবল শক্তির অনুরূপ কার্য্য হইলে

দুর্ব্বল শক্তির কার্য্য এককালে হয় না বলিয়াই, ঈশ্বরদত্ত সকল প্রকার শক্তির অনুরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্যই সামঞ্জস্য করিতে হয়। সকল শক্তি সমান করিলে, ঈশ্বর যে উদ্দেশ্য সাধন জন্য ব্যক্তিবিশেষে বৃত্তি বিশেষ প্রবল ও বৃত্তি বিশেষ দুর্ব্বল করিয়াছেন, তাঁহার সে অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়। অতএব যেরূপ সামঞ্জস্য করিলে প্রবল ও দুর্ব্বল শক্তি সমান না হয়, অথচ সকল গুলিরই আবশ্যক মত পরিচালন হয়, তাহাকেই কর্ত্তব্য বলিতে হইবে। প্রবল শক্তি এরূপে ব্যবহার করিতে হইবে, যেন তাহাতে কোন দুর্ব্বল শক্তি একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া না যায়, অর্থাৎ যে শক্তি প্রবল তাহার প্রবল কার্য্য হউক ও যে শক্তি দুর্ব্বল তাহার দুর্ব্বল কার্য্য হউক, কিন্তু কোনও শক্তির কার্য্যের যেন একবারে অভাব না হয়, তাহা হইলেই প্রকৃত কর্ত্তব্য করা হইল; এবং তাহাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি সাহসী সে নিতান্ত সাহসের কার্য্য করুক, কিন্তু তাহার যেন মনে থাকে যে, আত্মরক্ষা আবশ্যক, এজন্য সাবধানতাকে নিয়ত সঙ্গে রাখিতে হইবে। ঐরূপ যে অত্যন্ত দয়ালু সে নিয়ত পরহিত করুক কিন্তু তাহার যেন মনে থাকে যে, আত্মহিতও আবশ্যক। পরস্পর বিরোধী প্রবল ও দুর্ব্বল শক্তি সকল সমান করিবার চেষ্টা করিলে সাহস যেমন সাহস করিতে যাইবে, আত্মরক্ষা অমনি বাধা দিবে, দয়ালু যেমন দয়া করিতে যাইবে, স্বার্থপরতা অমনি বাধা দিবে, সুতরাং নিরতিশয় বীর ও দয়ালু প্রভৃতি হওয়া থাকুক মানব কোনও শক্তিরই অনুরূপ কার্য্য করিতে পারে না। কেননা সাহস ও সাবধানতা, দয়া ও স্বার্থপরতা, অহঙ্কার ও বিনয়, বিবেক ও স্বেচ্ছাচারিতা ঠিক সমান হইলে কোনও শক্তিরই কার্য্য হয় না।

সামাজিক কর্ত্তব্যও ঐরূপে নির্ণয় করিতে হইবে—একদেশে বা প্রদেশে এক ব্যক্তি প্রভৃত শক্তিমান ও বহু অল্প শক্তিমান থাকিলে, ঐ বহু শক্তিমানের শক্তি কমাইয়া ও দুর্ব্বল দিগের শক্তি বাড়াইয়া সমান করিলে হইবে না; এস্থলে কর্ত্তব্য এই যে, প্রবল শক্তিমান রাজা হইবেন ও দুর্ব্বল শক্তিমানেরা প্রজা হইবে। সামঞ্জস্য এই হইল যে, প্রবল শক্তিমান দুর্ব্বল শক্তিমান গণের শক্তি এককালে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না, তিনি প্রধান বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা হইবেন, দুর্ব্বলেরাও যাহার যেরূপ শক্তি তদনুরূপ প্রজা হইবে। ঐ প্রবলের রাজসত্ব ধ্বংস করিবার অধিকার দুর্ব্বলগণের নাই এবং ঐ দুর্ব্বলগণের প্রজা-সত্ব ধ্বংস করার অধিকার রাজার নাই। এরূপ হইলে রাজায় প্রজায় দ্বন্দ্ব হয় না, সবলে দুর্ব্বলে দ্বন্দ্ব হয় না, ধনীতে নির্ধনে দ্বন্দ্ব হয় না, বুদ্ধিমান নির্ব্বোধে দ্বন্দ্ব হয় না ও ব্রাহ্মণ শূদ্রে দ্বন্দ্ব হয় না। সকলেই যদি আত্ম শক্তি অবগত হইয়া তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে কাহারও সহিত কাহারও দ্বন্দ্ব হয় না, সুনিয়মে বিশ্ব কার্য্য চলিয়া যায়।

ইহাতে এই আপত্তি উত্থিত হইতে পারে যে, যদি সকলেই শক্তির অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে শক্তিসংঘর্ষ না হওয়ায় মানবের উন্নতি হয় না। আমাদের মতে কিন্তু এ প্রণালীতে সত্বর উন্নতি হইবারই সম্ভব। কেননা অভাবই মানবের উন্নতির কারণ এবং অভাব অবশ্যম্ভাবী। অভাব নিরাকরণ জন্য যখন সকল মানবকেই চেষ্টা করিতে হইবে, তখন নিশ্চয়ই মানবের উন্নতি হইতে হইবে; অধিকন্তু আত্মবিৎ হইয়া দুর্ব্বলেরা যদি বৃথা প্রবলের সহিত দ্বন্দ্ব না করিয়া নিয়ত আপনাদের

অভাব নিবারণের উপায় ও সম্ভবমত নিজ নিজ শক্তির উন্নতি চেষ্টা করে, তাহা হইলে বাধা প্রাপ্ত না হওয়ায় মানবসমাজের অতি সত্বর উন্নতি হয়'। সাম্যবাদীরা অনর্থক প্রবলে দুর্ব্বলে দ্বন্দ্ব বাধাইয়া দিয়া সময় নষ্ট ও পরস্পরের ক্ষতি করেন।

অনেকে বলেন মনুষ্যের সহজাত কোন শক্তি নাই, সকলই মানবের স্বোপার্জ্জিত। আবার কেহ কেহ কতকগুলি শক্তি সহ-জাত বলিয়া থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ শক্তি স্বোপার্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যদি একথা সত্য হয়, তবে শক্তি সামঞ্জস্যের নাম কর্ত্তব্য কি প্রকারে বলা যায়? তাহা হইলে যেরূপ কার্য্য কর্ত্তব্য হইবে তদনুরূপ শক্তি আমাদের উপার্জ্জন করিতে হইবে। সুতরাং কর্ত্তব্যের অন্য লক্ষণ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বাস্তবিক একথা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। কেননা মানবের স্বকীয় কিছুই নাই। তাহার দেহ, তাহার প্রাণ, তাহার সমুদয় শক্তিই প্রাকৃতিক অর্থাৎ ঈশ্বরদত্ত। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি জীব ও বিশ্বের অপরাপর পদার্থ হইতে মানবের যে প্রাধান্য তাহা কেবল প্রাকৃতিক বহুশক্তিসমাবেশ হেতু। সুতরাং মানবের স্বকীয় সম্পত্তি কোথা হইতে আসিবে? যখন মানব নিজেই আপনার অর্জিত নহে, তখন তাহার অংশবিশেষ শক্তি কিরূপে আপনার অর্জিত হইবে? যখন যন্ত্রাধিক্যই মানবের প্রাধান্যের কারণ, তখন যে মানবে ঐ যন্ত্রাধিক্য বা অধিক শক্তি নাই সে কিরূপে প্রধান হইবে? নবশক্তি উপার্জন করিবার শক্তি থাকিলে, প্রস্তর অথবা অশ্বকে শিক্ষা দ্বারা ইহজন্মে মনুষ্য করা যাইত। এবং তাহা হইলে কেহ কৃষ্ণবর্ণ ও কেহ শ্বেতবর্ণ হইত না; কেহ স্থূল কেহ কৃশ হইত না; কেহ উন্নতকায় কেহ খর্ব্বকায়

হইত না, কেহ মধুরকণ্ঠ কেহ কর্কশকণ্ঠ হইত না। শক্তি উপার্জ্জন করিতে পারা যায় না বলিয়াই, শত মণ সাবান দিয়া ধৌত করিলেও কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি শুভ্রবর্ণ হয় না, প্রত্যহ এক মণ ঘৃত ভোজন করিতে দিলেও কৃশকায় ব্যক্তি স্থূল হয় না, প্রতিদিন বীণার সহিত মিলাইয়া স্বর পবিচালন করিলেও কর্কশ-কণ্ঠ ব্যক্তি মধুবকণ্ঠ হয় না। যখন কেহ ঐ সকল বাহ্যিক শক্তি পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, অর্থাৎ যখন মানব নিজে বর্ণাদি উপার্জ্জন করিতে পারে না, তখন যে আন্তরিক শক্তি উপার্জ্জন করিতে পারে তাহার প্রমাণ কি? প্রত্যুত সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কবি হয় সে বাল্যকাল হইতেই কবিতায় নিপুণ, যে গণিত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হয় সে বাল্যকাল হইতেই তাহাতে আসক্ত, যে বীর হয় বাল্যকালেই তাহার সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়, যে ভীরু হয় সে বাল্যাবধিই গৃহের বহির্গত হইতে পারে না। অতএব সহজাত শক্তি যে সকলের মুল তাহার আর সন্দেহ নাই। তবে সংসর্গ ও শিক্ষাবলে যে নূতন প্রকার শক্তি প্রকাশ হইতে দেখা যায়, তাহা বাস্তবিক নূতন শক্তি নহে; প্রবল শক্তিবিশেষের প্রাবল্য বশতঃ যে সকল দুর্ব্বল শক্তির কার্য্য হইতে পারিত না জ্ঞানবলে বৃত্তি সামঞ্জস্য হওয়ায় তাহা প্রকাশ পায় মাত্র। জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ হইলে দুর্ব্বল সহজ শক্তির প্রকাশ হয় বলিয়াই শিক্ষার এত আদর। জ্ঞান যে স্বোপার্জ্জিত তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি। জ্ঞানকে শক্তি বলিয়া ভ্রম হওয়াতেই এই ভ্রান্তসংস্কার জন্মিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

শিক্ষা ও শাসন।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে কেবল কর্ত্তব্যের লক্ষণ ও কর্ত্তব্য নিরূপণের উপায় মাত্র নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু কি প্রকারে কর্ত্তব্যেরত হওয়া যায় তদ্বিষয়ে কিছু বলা হয় নাই। শক্তিসামঞ্জস্যের নাম কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে, কিন্তু কাহার কিরূপ শক্তি আছে ও কি করিলে সেই শক্তি সকলের সামঞ্জস্য হয়, তাহা পরীক্ষা ব্যতীত জ্ঞাত হওয়া যায় না। যে দুর্ব্বল সে যতক্ষণ বলবানের সহিত যুদ্ধ না করে ততক্ষণ তাহার দৌর্ব্বল্য বুঝিতে পারেনা, যে নির্ব্বোধ সে যতক্ষণ বুদ্ধিমানের সহিত একত্র পরীক্ষা না দেয় ততক্ষণ তাহার নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারেনা। আবার কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে পীড়া হয় জানিতে হইলে, সেই দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া পীড়িত না হইলে বুঝিতে পারা যায় না এবং যে দ্রব্য ভক্ষণে মৃত্যু হয়, তাহা ভক্ষণ করিলে যখন মৃত্যু হইল, তখন সে পরীক্ষায় তাহার নিজের কোন কার্য্য হয় না; অতএব দেখা যাইতেছে যে স্বশক্তি পরীক্ষা ও অন্য পদার্থ বা ব্যক্তির সহিত নিজের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা জানিতে হইলে, বারংবার নিজে বিপদে পড়িতে হইবে ও অপরকে বারংবার বিপদে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে দেখিতে হইবে। তাহা হইলে কিছু কিছু করিয়া জানিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তাহাও নিতান্ত অল্প। ঐরূপে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহার সমষ্টি করিলে বৃদ্ধবয়সেও অতি অল্প জানা হয়। এবং তাহাতেও যে অনেক ভ্রান্তি থাকে

তাহা জ্ঞান ও বিশ্বাসপ্রবন্ধে বুঝান হইয়াছে। এই জন্য জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হইলে, কেবল প্রত্যক্ষকে অবলম্বন করিলে চলে না। বিশেষতঃ আমাদের ২০।২৫ বৎসর বয়স কালেই কর্ত্তব্য কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে না। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই যখন আমাদের কার্য্য আরম্ভ হয়, তখন সেই সময় হইতেই আমাদিগকে কর্ত্তব্যপর হইতে হইবে। কিন্তু শিশুর জ্ঞানলাভের শক্তি কোথায় যে, সে কর্ত্তব্যাবধারণ করিবে? তাহার ক্ষুধা হয় বটে, কিন্তু কিরূপে সেই ক্ষুধা নিবারণ করিতে হয় তাহা সে জানেনা। খাওয়াইতে না শিখাইলে সে খায়না। আবার যখন সে খাইতে শিখে তখন যাহা পায় তাহাই খায়, খাদ্যাখাদ্য চিনিতে পারেনা। অখাদ্য খাইতে ও অতিরিক্ত খাইতে নিবারণ না করিলে, তাহাকে আহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যপর করা যায় না। এইরূপে দেখা যায়, তাহার যাহা কিছু আবশ্যক তাহা করাইবার জন্য নিয়ত তাহাকে শিক্ষা দিতে হয়, প্রলোভন দেখাইতে হয় ও ভয় প্রদর্শন করিতে হয়।

এরূপ কার্য্য যে কেবল বাল্যকালেই আবশ্যক এমত নহে। বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত মানব শিক্ষা ও শাসনের অধীন। প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া কেহই বাল্যকাল হইতে কর্ত্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হয় না; ভয়ের অধীন ও আশ্বাসে মুগ্ধ হইয়াই সকলে কর্ত্তব্য কার্য্য করে। এই কারণে বালকদের জন্য জুজু কল্পিত হইয়াছে, ও নিয়ত তাহাদিগকে ভাল খাদ্য, ভাল বস্ত্র ইত্যাদি দিবার আশ্বাস দেওয়া হইয়া থাকে; এবং এই জন্যই যুবা ও বৃদ্ধদের জন্য স্বর্গ, নরক এবং সামাজিক ও রাজকীয় দণ্ডাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। যিনি অতি জ্ঞানী ও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ তিনিও প্রথমে

শিক্ষা ও শাসনের অধীন হইয়া ক্রমে তত্ত্ব জানিবার শক্তি পাইয়াছেন; কোন ব্যক্তিই শিক্ষা ও শাসনাধীন না হইয়া প্রথম হইতেই আপনা আপনি তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারেন না। বিশেসতঃ অনেক মনুষ্য ভবিষ্যতে সুখ পাইব বলিয়া আপাতমধুর সুখ-ত্যাগে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, ও সকল মনুষ্যের মনোবৃত্তি সমান প্রকার না থাকায় সকলে ভবিষ্যৎ সমান রূপ বুঝিতে পারে না। আবার কাহারও কাহারও বৃত্তি-বিশেষ এত প্রবল যে কার্য্য কালে সে কিছুতেই তাহার শক্তিকে পরাস্ত করিতে পারে না। যখন প্রকৃতিই কার্য্য উৎপাদনের মূল, তখন কিরূপে সে তেজস্বিনী শক্তির প্রকৃতি উল্লঙ্ঘন করিবে? প্রবল তেজস্বী কিরূপে সর্ব্বদা বিনয়ী হইবে? এবং রাগান্ধ কি রূপে ক্ষমাশীল হইবে? এই বিঘ্ন নিবারণের উপায় কেবল মাত্র শিক্ষা ও শাসন। তাহারা সর্ব্বদা মনুষ্যদিগের শক্তি সামঞ্জস্য করিতে প্রবৃত্ত থাকে। সুতরাং শিক্ষা ও শাসন আমাদের নিতান্ত আবশ্যক।

শিক্ষা ও শাসন মানবের নূতন শক্তি উৎপাদন করিতে পারে না বটে, কিন্তু উহারা শক্তি-বিশেষের প্রবলতা ও দুর্ব্বলতা সম্পাদন করিতে পারে। কোন বৃক্ষকে দীর্ঘে উন্নত করিতে হইলে যেমন তাহার শাখা প্রশাখা ছেদন করিতে হয়, লৌহখণ্ডকে লম্বে বাড়াইতে হইলে যেমন তাহার পরিসর কমাইতে হয়, অধিক বহনে যেমন বাহক ও হলশকট-চালক গোসকলের স্কন্ধের স্থূলতা বৃদ্ধি হয়, কেবল মাত্র মানসিক বৃত্তিচালনে শরীর ও শরীরচালনে যেমন মনোবৃত্তি সকল দুর্ব্বল হয়, ব্যবহার না করিলে যেমন অস্ত্র সকলের তীক্ষ্ণতা থাকে না, নিয়ত নরহত্যা

করায় ঘাতকের] যেমন দয়া থাকে না, সেইরূপ যে বৃত্তির পরিচালন অধিক হয় তাহার প্রবলতা ও যাহার পরিচালন অল্প হয় তাহার দুর্ব্বলতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। শাসন ও শিক্ষা বৃত্তিবিশেষকে পরিচালিত করিয়া পরিবর্দ্ধিত ও শক্তিপ্রকাশে বাধা দিয়া বৃত্তিবিশেষকে অল্প পরিচালিত ও দুর্বল করে। অস্ত্র যেরূপ শাণিত হইলে তীক্ষ্ণধার ও বিনা ব্যবহারে স্থূল হয়, শিক্ষা দ্বারা সেইরূপ উৎকৃষ্ট বৃত্তি মার্জ্জিত ও নিকৃষ্ট বৃত্তি মন্দীভূত হয়; বেশ ভূষা করিলে শরীর যেরূপ শোভিত হয়, শিক্ষাদ্বারা অন্তরের সেইরূপ সৌন্দর্য্য সম্পাদিত হয়। শিক্ষাদ্বারা মানবগণ আত্মতত্ত্ব অবগত হয়, বৃত্তি সকলের সামঞ্জস্য করিবার শক্তি লাভ করে ও অপ্রকাশিত শক্তি সকল বিকশিত হইয়া এরূপ ভিন্ন ভাবাপন্ন হয় যে, অশিক্ষিতদিগের সহিত শিক্ষিতদিগকে এক পদার্থ বলিয়াই চিনিতে পারা যায় না। বিশিষ্ট রূপ অনুধাবন করিয়া না দেখিলে বোধ হয় যেন শিক্ষা নূতন শক্তি উৎপাদন করিয়া দিয়াছে। সুতীক্ষ্ণ তরবারি সামান্য লৌহ হইতে কোন দ্রব্যবিশেষে ভিন্ন নহে, কিন্তু ঐ উভয়ের শক্তির পার্থক্য দেখিলে যেমন কোন ক্রমেই উহাদিগকে এক পদার্থ বলিয়া চিনিতে পারা যায় না, সেইরূপ ভীল কুলি হইতে আর্য্যজাতি ভিন্ন পদার্থ না হইয়াও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন। কোন ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ বপন দ্বারা সামান্য বন্য শস্য উৎকৃষ্ট গোধুম রূপে পরিণত করিয়াছিলেন। অতএব শিক্ষা দ্বারা নূতন শক্তি উৎপন্ন না হইলেও, প্রাকৃতিক শক্তিসকল এরূপ মার্জ্জিত ও সুতীক্ষ্ণ হয় যে, তাহাদিগকে নূতন উৎপাদিত শক্তি বলিয়াই বোধ হয়।

এক্ষণে শিক্ষা ও শাসন কি তাহা জানা আবশ্যক। জ্ঞান

ও বিশ্বাসে যে রূপ প্রভেদ, শিক্ষা ও শাসনেও সেই রূপ প্রভেদ এবং প্রকৃত জ্ঞান বিশ্বাসরূপে পরিণত হইলে ঐ বিশ্বাস দ্বারা যেরূপ মানবের জ্ঞানের কার্য্য হয়, প্রকৃত শিক্ষা শাসন রূপে পরিণত হইলে, সেই শাসন দ্বারাও সেইরূপ শিক্ষার ফললাভ হয়। অতএব প্রথমে শিক্ষার বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। অর্থাৎ শিক্ষা কি, সকলেই শিক্ষা করিতে পারে কি না এবং শিক্ষা করিলে শিক্ষামত কার্য্য করিতে পারে কিনা জানা আবশ্যক।

শিক্ষা কাহাকে বলে? লিখিতে শেখার নাম শিক্ষা, না পড়িতে শেখার নাম শিক্ষা? বাঙ্গালা ভাষা শিখিলে শিক্ষা হয়, না সংস্কৃত শিক্ষাকে শিক্ষা বলে, অথবা ইংবাজি না শিখিলে শিক্ষা হয় না? বানান করিতে জানার নাম শিক্ষা, না অর্থ করিতে জানার নাম শিক্ষা? অধিকাংশ লোকেই বাস্তবিক উক্ত সকল প্রকারকে শিক্ষা বলিয়া থাকেন। আধুনিক প্রথা অনুসারে কোন প্রকারে ইংরাজি পড়িয়া একটী উপাধি গ্রহণ বা কোন রাজ কার্য্য করিতে পারিলেই উচ্চ শিক্ষা হইল; ইংরাজিতে হাত পাকাইয়া কেরাণীগিরি করিতে পারিলেও মধ্যবিধ শিক্ষা হয়; আর যিনি বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে অন্ততঃ আট আনা ইংরাজি মিশাইতে পারেন, দুই একটী সভায় গমন ও বক্তৃতা দিতে বা শুনিতে পারেন, ভ্রমান্ধ, দেশীয়াগণ ভারতকে মজাইল ইত্যাদি বুলি ঝাড়িতে পারেন ও দেশি বিলাতি মিশ্রিত খিচুড়ি ধরণে চলিতে পারেন, তিনি কোন চাকুরি না করিলেও শিক্ষিত; তিনি পৈত্রিক বিষয় নষ্টকারী হউন অথবা পরস্কন্ধারোহী বেয়ারিংপোষ্টভোজীই বা হউন তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই; কারণ তিনি শিক্ষিত। তিনি

যে শিক্ষিত তাহার প্রমাণ এই, যে, তিনি পুরাতন সমস্তই ঘৃণা করেন। প্রাচীন দলের মধ্যে যিনি ব্যাকরণ অভিধান মুখাগ্রে করিয়া, স্মৃতি সংগ্রহের দুই চারিটী তত্ত্ব শিখিতে পারিলেন তিনি মহা পণ্ডিত, আর যিনি দশকর্ম্ম করিতে শিখিয়াছেন তিনিও কম নহেন। বাস্তবিক ঐ সকলকে যে প্রকৃত শিক্ষা বলে না তাহা বোধ হয় অধিক বুঝাইবার আবশ্যক করেনা।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে, জ্ঞান ও শিক্ষা একই, অথবা জ্ঞানের জন্যই শিক্ষা। উহাদের মধ্যে প্রভেদ এই, যে, জ্ঞানের উপাদান কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি, শিক্ষার উপাদান তাহা হইতে অধিক; অন্যে যে জ্ঞান লাভ করে তাহা অবগত হওয়াকেও শিক্ষা বলে। মানব নিতান্ত অল্পায়ু ও অল্পশক্তিযুক্ত এবং বিশ্ব ব্যাপার অপরিসীম, কাজেই কোনও মানব একাকী বিশ্ব সম্বন্ধে অতিসামান্য জ্ঞান মাত্রও লাভ করিতে পারে না। এই জন্য পরস্পরের ও পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিজ্ঞাত বিষয় সকল শিক্ষা করিয়া মানব সমধিক জ্ঞান সম্পন্ন হয়। এক্ষণে পৃথিবীতে এত জ্ঞান সঞ্চাত হইয়াছে, যে, তৎ সমস্ত না শিখিয়া, কেবল মাত্র আপন ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে, তাহার সহিত তুলনায় কিছুই জ্ঞান হয় না। এই জন্য এক্ষণে শিক্ষালব্ধ জ্ঞানই জ্ঞানপদ বাচ্য হইয়াছে। কিন্তু অন্যের জ্ঞাত বিষয় শিক্ষা করিলেই প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। যে সকল বিষয় শিক্ষা করা যায়, তৎসমস্ত সত্য হওয়া আবশ্যক; যাহা শিক্ষা করা হইল তাহাই বেদবৎ সত্য বলিয়া মানিলে অনেক ভুল শিক্ষা হয়। কেননা অনেকে অনেক ভ্রান্তজ্ঞান প্রচার-করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য প্রকৃত শিক্ষা অত্যন্ত কঠিন এবং

এই জন্য অল্প শিক্ষা মহা অনিষ্টকর। অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিরা শিক্ষিত বিষয়ের ভ্রান্তি বুঝিতে না পারিয়া, ভ্রান্ত শিক্ষানুরূপ কার্য্য সম্পাদন দ্বারা মহান্ অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। যিনি প্রভূত শিক্ষা লাভ করিয়া সত্য নিষ্কাশন করিতে পারেন তিনিই-প্রকৃত শিক্ষিত। কিন্তু কয় জনের এরূপ শিক্ষা হইতে পারে! কেবল শিক্ষাই ত আমাদের কার্য্য নহে; অন্ততঃ জীবন-ধারণোপযোগী কার্য্যগুলিও ত আমাদের করিতে হইবে। আমাদের আয়ু এত অল্প, যে, তাহার সমুদায়ই যদি শিক্ষাকার্য্যে ব্যয় করা যায়, তাহা হইলেও উক্ত প্রকারে সমস্ত বিষয় শিক্ষা হওয়া দূরে থাকুক, নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় গুলির শিক্ষাও হইতে পারে না। কিন্তু যিনি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল শিক্ষাকার্য্যে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনিও সমগ্র জীবনের বিংশতি ভাগের এক ভাগও শিক্ষায় ব্যয় করিতে পারেন না। কেননা শৈশব, বার্দ্ধক্য, রোগ, শোক, নিদ্রা, বিশ্রাম, স্বাস্থ্যরক্ষা ও জীবিকার্জ্জন প্রভৃতিতে মানবের এত সময় অতিবাহিত হয়, যে, হিসাব করিয়া দেখিলে জীবনের বিংশতি ভাগের একভাগ সময়ও অবশিষ্ট থাকে না। ঐ অল্পা-বশিষ্ট সময় মধ্যে কোন একটী বিষয়েরও শিক্ষা হইতে পারে না।

আবার সকল মনুষ্যের অবস্থা সমান নহে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই শিক্ষা পাইবার উপযোগী কোন উপায়ই প্রাপ্ত হয় না। অনেকে অর্থাভাবে শিক্ষাগৃহে প্রবেশ করিতেই পারে না। অনেকে জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত দিবারাত্রি ভয়ানক পরিশ্রম করিতে বাধ্য, শিক্ষার জন্য তাহাদের কিঞ্চিৎ সময়

পাওয়াও দুরূহ; কি প্রকারে তাহাদের শিক্ষা লাভ হইবে? আবার যে সকল লোকে শিক্ষার জন্য যথাকথঞ্চিৎ সময় ও অর্থ ব্যয় করিতে পারে, তাহাদের সকলের প্রবৃত্তি সমান নহে। কেহ শিক্ষাকে কষ্টকর বলিয়া তাহার দিকে যাইতে চায় না, কেহ বিষয়বিশেষের প্রিয় ও কেবল সেই বিষয় মাত্র শিখিতে ইচ্ছুক, কাহারও বিষয়বিশেষ বুঝিবার শক্তি নিতান্ত অল্প বা তাহাতে তাহার রুচি নাই ও তজ্জন্য তাহা শিখিবার জন্য যত্ন করে না, যদিও যত্ন করে তাহাতে তাদৃশ ফল লাভ হয় না। এই কারণে অনেকে সাহিত্যে মহোপাধ্যায় পণ্ডিত, কিন্তু গণিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই; অনেকের বিজ্ঞানে বিলক্ষণ জ্ঞান জন্মিয়াছে কিন্তু ইতিহাস ভূগোল বিষয়ে তাঁহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সকল বিষয়ে প্রকৃত শিক্ষা মানবের হইতে পারে না। যদিও স্বীকার করা যায়, যে, দুই এক জন ব্যক্তি জীবনশেষে সর্ব্ববিষয়ে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, তাহাতেই বা ফল কি? দুই একজন শিখিলে সমগ্র পৃথিবীর লোকের কি হইবে এবং অতি বৃদ্ধ বয়সে শিক্ষা শেষ হওয়ায় ঐ দুই এক জনই বা কি উপকার পাইবেন? শিক্ষাই ত মানবের লক্ষ্য নহে, যে মৃত্যুর পূর্ব্বে যে কোন সময়েই হউক শিক্ষা পাইলেই মানব কৃতার্থ হইল। যখন কর্ম্মই মানবের প্রধান আবশ্যক এবং কি কর্ম্ম করা আবশ্যক তাহা জানার জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন, তখন মৃত্যুর দুই চারি দিন থাকিতে শিক্ষিত হইলে ফল কি? সমস্ত জীবনে যে সকল কার্য্য করিলাম শিক্ষালাভ না হওয়ায় তৎসমস্ত অন্যায় করিলাম, এক্ষণে মরিতে বসিয়াছি, কর্ম্ম করিবার আর সময় নাই, এক্ষণে

শিক্ষা ও কর্ত্তব্য জ্ঞান হইল, তাহাতে ফল কি? অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কেবল উক্তরূপ শিক্ষা দ্বারা কর্ত্তব্যজ্ঞান লাভ করিয়া কেহই কার্য্য করিতে পারে না। জন্মাবধি অন্ততঃ ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ত সকলকেই পরীক্ষানিরপেক্ষ হইয়া কেবল মাত্র শিক্ষা ও শাসনের অধীন হইতে হয়। কিন্তু শিক্ষা দ্বারা শিক্ষিত ব্যক্তির নিজের কার্য্যের সহায়তা অধিক না হউক, অন্যের কার্য্যের অনেক সহায়তা হয়। কেননা তিনি যাহা শিখিলেন তাহা অন্যকে শিখাইলে বা লিপিবদ্ধ করিলে অন্যে তাহা শিখিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারে।

পণ্ডিতগণ শিক্ষালব্ধ বিষয় সকল নানা উপায়ে সঞ্চিত করিয়া রাখেন। কেহ নীতিপুস্তক স্বরূপে, কেহ ধর্ম্ম শাস্ত্র স্বরূপে, কেহ সমাজতত্ত্বরূপে ও কেহ ব্যবহারশাস্ত্র রূপে প্রণয়ন করে। শিক্ষিত ব্যক্তি বহু অনুসন্ধান করিয়া যাহা অবগত হয়েন তাহা আমরা তৎপ্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থপাঠে নীতি বলিয়াই হউক, ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়াই হউক বা রাজাজ্ঞা বলিয়াই হউক জানিতে পারি। অতএব জ্ঞাতব্য বিষয় জানা সম্বন্ধে শিক্ষা ও শাসনের একই ফল। কিন্তু শিক্ষা দ্বারা যেরূপপ্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হওয়া যায়, শাসন দ্বারা সেরূপ হয় না। কেননা ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে জানা গেল, যে ব্যক্তি পরদারাভিগমন করে সে নরকে গমন করিয়া তপ্তলৌহসংযুক্ত হইয়া অনন্তকাল কষ্ট পায়। আর শিক্ষা দ্বারা জানা গেল যে পরদারাভিগমন করিলে সমাজ বিশৃঙ্খল হয়, কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া নিজের ও সমাজের বিবিধ অনিষ্ট সম্পাদিত হয়, রোগ জন্মে, ধন ক্ষয় হয় ও অকালে জীবন হারাইতে হয়। সুতরাং শিক্ষা ও ধর্ম্মশাস্ত্র উভয় দ্বারাই

পরদারাভিগমনাকে অন্যায় কার্য্য বলিয়া জানা গেল বটে, কিন্তু ঐ কার্য্যের ফল যাহা জানা হইল তাহা ভিন্ন; যে হউক অনুষ্ঠান-প্রবৃত্তি সম্বন্ধে উভয়েরই কার্য্যকারিতা প্রায় তুল্য। তবে ভ্রান্ত জ্ঞান দ্বারা অনেক কুসংস্কার জন্মিয়া অনেক সময়ে অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। যেমন ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে জানা গেল মদ্যপান মহাপাপ-জনক শিক্ষা দ্বারাও তাহাই জানা হইল বটে, কিন্তু শিক্ষা-নিরত ব্যক্তি আবশ্যক হইলে অর্থাৎ পীড়াদির সময়ে মদ্যপান অন্যায় মনে করেন না; ধর্ম্মশাস্ত্ররত ব্যক্তি হয়ত প্রাণান্তে মদ্য স্পর্শও করিতে স্বীকৃত হইবেন না। ইহাতে হয়ত উপযুক্ত ঔষধাভাবে কাহারও জীবন নষ্ট হইতে পারে। শাসনের যেমন এই দোষ লক্ষিত হয়, তেমনি মহৎ উপকারিতাও আছে; ধর্ম্ম-শাস্ত্ররত ব্যক্তি কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য যেমন ঐকান্তিক যত্ন করেন, শিক্ষানিরত ব্যক্তির কর্ত্তব্য পালনে তত ঐকান্তিকতা জন্মে না। অর্থাৎ জ্ঞানজ কার্য্য অপেক্ষা বিশ্বাসজ কার্য্য সম্পা-দনে দৃঢ়তা অধিক। একথা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই জন্য শাসনযন্ত্র ভ্রান্ত না হইলে শিক্ষা অপেক্ষা তাহা দ্বারা অধিক উপকার লাভ হয়। শাসন নানা প্রকার। তন্মধ্যে ধর্ম্মশাসন, সমাজশাসন, রাজশাসন ও পারিবারিক শাসন প্রধান। একে একে তৎসমস্তের বিবরণ করা যাইতেছে

ধর্ম্মশাসন।

মানব যখন সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীবাসী হইয়াছিল, তখন সমাজ ছিল না, রাজা ছিলনা, নৈসর্গিক বৃত্তির অভাব পূরণ করণ জন্য যে সকল নৈসর্গিক পদার্থের আবশ্যক তদ্ভিন্ন আর কিছুই

ছিল না। তখন মানব ইতর জন্তুর ন্যায় অনাচ্ছাদিত দেহে আবাস-শূন্য হইয়া অনায়াসলব্ধ ফলমূল ভক্ষণকরিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিত। তখন কিরূপে মেঘ উৎপন্ন হয়, কোথা হইতে নদীতে জল আইসে, বৃক্ষে কিরূপে ফল জন্মে, এবং কেনই বা ঐ সকলের অভাব হয়, কিছুই বুঝিতে পারিত না। সুতরাং নৈসর্গিক শক্তি-বিশেষকে ঐ সকলের কারণ জ্ঞান করিয়া তাহা-দিগকে দেবতা বিবেচনা করিত। ঐ দেবতা প্রসন্ন হইলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ঐ দেবতা অপ্রসন্ন হইলে ঐ সকল দ্রব্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, এই বিশ্বাস পরায়ণ হইয়া মানবগণ দেবতাগণকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং যে কর্ম্ম দেবতার অপ্রসন্নকর বিবেচনা করিল,তাহা করিতে বিমুখ হইল। ঐ দেবভক্তি ক্রমে এত প্রবল হইল যে, মানবগণ দেব-প্রীতিকরবোধে নিতান্ত নিষ্ঠুর ঘৃণাকর ও লজ্জাকর কার্য্য সকলও অবিকৃত মনে সম্পাদন করিতে লাগিল। ঐ দেব-ভক্তি-ভরে ও দেবতার প্রসন্নতা লাভের আশায়, আবার, মানবগণ এরূপ নিঃস্বার্থ হয় যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। দেবতার প্রীতি সম্পাদন জন্য মানবগণ রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, পুত্র, এমন কি আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। যাহা দেব-প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইবে, তাহা হিতকর হউক বা অহিতকর হউক, লজ্জাকর হউক বা শ্রদ্ধাকর হউক, ঘৃণাকর হউক বা প্রীতিকর হউক, নিষ্ঠুরতা হউক বা সদায়তা হউক, দেশ উৎসন্নকর হউক বা উন্নতি কর হউক, বিবেচনা না করিয়া প্রীত মনে সম্পন্ন করিবে। কেননা তাহারা কি, চতুঃপার্শ্বস্থ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, মৃত্তিকা, জল প্রভৃতিই

বা কি, এ সকল কোথা হইতে আসিল, কি জন্য আসিল, কেন এই সকলের বিনাশ ও পুনরায় উৎপত্তি হয়, কেন রথচক্রের ন্যায় সুখ ও দুঃখ আবর্ত্তন করিতেছে, কি জন্য রোগ, শোক, দারিদ্র্য মানবগণকে কষ্ট প্রদান করে, কি জন্য সম্পদ, সম্ভ্রম, প্রীতি প্রভৃতি মানবগণকে সুখী করে, এবং কি জন্য মানবগণ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় এবং মৃত্যুর পরেই বা কি গতি লাভ হয় এ সকলের মর্ম্ম কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া, দেবতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, সেই পরাৎপর দেবতাই সকল সুখ দুঃখের হেতু, এবং তিনি তুষ্ট হইলে সুখ হইবে ও তাঁহার অতুষ্টিতে দুঃখ জন্মিবে। সুতরাং যে কার্য্যে তাঁহার তুষ্টি হইবে বলিয়া বিশ্বাস জন্মে, তাহা সম্পাদন করিতে ও যে কার্য্য করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন বিবেচনা হয় তাহাহইতে নিবৃত্ত হইতে যে, মানবগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই সর্ব্বস্ব ধন দেবদেবের আরাধনা করিতে মানবগণ না করিতে পারে এমন কর্ম্মই নাই।

মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ইহা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, মানবগণকে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত করিতে ও কোন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে দেবাজ্ঞা যে রূপ উৎকৃষ্ট উপায়, এরূপ আর কিছুই নহে। তাই তাঁহারা যে সকল কার্য্য মানবের হিতকর বিবেচনা করিলেন, সে সকলকে দেবাজ্ঞা বলিয়া প্রচার করিলেন। সেই সকল ব্যবস্থা ক্রমে ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে পরিণত হইল ও তাহা দেব-প্রণীত বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিল। ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে চলাই মানবের মুখ্যকার্য্য বলিয়া স্থির হইল। ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিপরীতাচারী মানব-নামের যোগ্য নহে, তাহাকে স্পর্শ

করিলেও দেবতার অপ্রীতিভাজন হইতে হয়, এই বিশ্বাস জন্মিল।

অতি প্রাচীনকালে ধর্ম্মশাসন ভিন্ন আর কোনও প্রকার শাসন ছিল না। তখন লোকের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা ছিল, ধর্ম্মভয়ে কোন ব্যক্তিই বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত না। একমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্রই মানবের সকল জ্ঞানাভাব দূর করিয়া দিত। তখন ধর্ম্ম-শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা এবং ধর্ম্ম-শাসনই প্রধান শাসন ছিল। বাস্তবিক ধর্ম্মশাসনের তুল্য উৎকৃষ্ট শাসন আর নাই। কেন না, ধর্ম্মভাবে যে কার্য্য করা হয়, তাহা অন্তরের সহিত করা হয়; তাহাতে কিছুমাত্র কৃত্রিমতা বা কুটিলতা থাকে না। উহাতে অন্তরের মলিনতা দূর হয়; এবং উহার আরাধনায় মনের পবিত্রতা জন্মে। আহা! সেই প্রাচীন কাল—সেই সত্যকাল—সেই পুণ্যকাল মানবগণের কি সুখেরই ছিল! তখন ধর্ম্মরূপ বৃষ চারি পাদে অবস্থিতি করিতেন, তখন সকলেই ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু ছিলেন, ধর্ম্মই মানবের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এমন কি, সাংসারিক বিবাদাদি অনর্থ সকলও ধর্ম্ম দ্বারা মীমাংসিত হইত। ঐ প্রাচীন কালের ন্যায় যদি চিরকাল মানবের মনে ধর্ম্মভাব প্রবল থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবী কি সুখের স্থানই হইত! তাহা হইলে আর কোন প্রকার শাসনের আবশ্যক হইত না। কিন্তু জগতের কি আশ্চর্য্য প্রকৃতি! এমন সুন্দর ভাবও অধিক দিন থাকিতে পাইল না। ক্রমে মানবের ধর্ম্মের প্রতি সন্দেহ হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে সকলেই একই প্রকার দেবতা ও একই প্রকার দেবাজ্ঞা অবগত হইয়াছিল। ক্রমে তাহার ভিন্নত্ব উপলব্ধি

হইতে লাগিল। আদিম বৈদিককালে ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতারূপে পরিগণিত ছিলেন। পরে ঔপনিষদিক কালে এক-মাত্র নিরাকার ব্রহ্ম সকল দেবের দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইল। দার্শনিকগণ ঈশ্বরনির্ণয়ে যুক্তি খাটাইলেন ও পৌরাণি-কেরা কৃষ্ণ, কালী, শিব প্রভৃতি পরম দেবতার উল্লেখ করিলেন। আবার বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও নাস্তিকতা সঙ্গে সঙ্গে অবতারিত হইল। দেশ বিদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম প্রভৃতি সহস্র সহস্র প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারিত হইল। ধর্ম্ম নানা-প্রকার হইল, কিন্তু তাহার আধার এক মাত্র মানব রহিল। সুতরাং মানবের মহা বিপদ। কাহাকে ঈশ্বর বলিবে, কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্রলিখিত ব্যবস্থা ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া মানিবে, তাহা তাহাকেই নির্ণয় করিতে হইবে। পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস ছিল, তাহা স্খলিত হইল। সত্যা-সন্ধিৎসু নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। কিছু দিন পরে যখন জানিল যে, সে ধর্ম্মও প্রকৃত নহে, আবার নব ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এই রূপে, ধর্ম্মের প্রতি মানবের যে অচল বিশ্বাস ছিল, তাহা খর্ব্ব হইতে লাগিল। সুতরাং প্রাচীনকালে ধর্ম্ম-শাসন দ্বারা মানবের যে উপকার হইত, ক্রমে তাহার অল্পতা হইতে লাগিল। প্রত্যুত ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা এক্ষণে উপকার অপেক্ষা অপকারের ভাগই অধিক হইয়া উঠিয়াছে। কারণ এক্ষণে অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে অজ্ঞান ও স্বার্থপরতাদুষ্ট বহুতর ব্যবস্থা প্রবিষ্ট হইয়াছে। সেই সকল ধর্ম্মব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য করিয়া অনেক সময়ে অনেক অটল বিশ্বাসী দেশের মহান্ অনিষ্ট সাধন করেন। আলেক্‌জেণ্ড্রীয় পুস্তকালয়-দাহন ও সোমনাথ প্রভৃতির মন্দির ধ্বংস ইহার প্রমাণস্থল। আবার যাঁহাদিগের ধর্ম্মের প্রতি অটল

বিশ্বাস নাই, অর্থাৎ অযৌক্তিক ব্যবস্থা দেখিয়া যাঁহারা ধর্ম্ম ব্যবস্থায় সন্দিগ্ধ হয়েন, অথবা যাঁহারা নানা প্রকার ধর্ম্মে নানাবিধ বিপরীত ব্যবস্থা দেখিয়া ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া প্রকৃত ধর্ম্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা পরিশেষে প্রায়ই নাস্তিক হইয়া পড়েন। সুতরাং ধর্ম্ম-শাস্ত্র এক্ষণে কি অটলবিশ্বাসী কি সন্দিগ্ধচিত্ত কাহারও উপকার সাধন করিতে পারিতেছে না।

সামাজিক শাসন।

মানবের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে ধর্ম্মশাসন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও সামাজিকশাসনও আবশ্যক। কেননা অনেকে পরকালের ভাবীসুখ লাভের আশায় বা দণ্ড পাইবার ভয়ে আপাত-মধুর সুখত্যাগ করিতে পারে না। তাহারা প্রকৃত স্বার্থ বুঝিতে না পারিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া পরধন ও পরদার গ্রহণে লোলুপ হয়। তাহাদের ঐ সকল অনিষ্ট নিবারণের জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লৌকিক শাসনের নিতান্ত আবশ্যক।

মানব সমাজ-প্রিয়, সমাজ ভিন্ন মানব একাকী থাকিতে পারে না। স্ত্রী, পরিজন, প্রতিবাসী সতত মানবের প্রয়োজন: এমন কি পরস্পর বিনিময় করিয়া না লইলে সর্ব্বদা ব্যবহৃত দ্রব্য সকলও পাওয়া যায় না। এই জন্যে সমাজ কোন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলে সে আত্মরক্ষণে অসমর্থ হয়। কোন ব্যক্তি কোন অন্যায় কার্য্য করিলে সমাজ তাহাকে পরিত্যাগ করে অর্থাৎ সমাজস্থ কোন ব্যক্তি তাহার সহিত ভোজন করে না, তাহাকে কন্যাদান করে না, ও প্রয়োজনীয় কোনও দ্রব্য তাহার সহিত আদান প্রদান করে না। সুতরাং অন্যায়কারী ব্যক্তি নিরুপায়

হইয়া সমাজের শরণাগত হয়, এরূপ কর্ম্ম পুনরায় করিব না বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা ও সমাজের নিয়মানুসারে দণ্ড স্বীকার করে। সমাজের এই শাসনের নাম সামাজিক শাসন।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, সামাজিক শাসনও এক প্রকার ধর্ম্মশাসন এবং সমাজ আমাদের উপাস্য দেবতা। কেন না, সমষ্টির নামান্তর সমাজ। যখন বিশ্ব-সমষ্টি ঈশ্বর, তখন যে কোনও সমষ্টি অবশ্য দেবতা। সুতরাং সমষ্টিরূপ সমাজদেবতার আরাধনা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। যত সমষ্টি হইবে, তত ঈশ্বরত্ব ও যত ব্যষ্টি হইবে, ততই বিশ্বত্ব বা ঈশ্বর হইতে দূরত্ব। এই জন্য যাহারা সমাজবদ্ধ তাহারা উন্নত; এই জন্য উদ্ভিদ্ অপেক্ষা পশু পক্ষ্যাদি উন্নত ও পশ্বাদি অপেক্ষা মানব উন্নত এবং এই জন্য ঐক্য কার্য্যের প্রধান সাধন। ঐক্য ও সমষ্টিত্ব আছে বলিয়াই এক্ষণে য়ুরোপীয়েরা এতাদৃশী উন্নতিলাভ ও লৌহবর্ত্ম, বৈদ্যুতিক সংবাদ প্রভৃতি মহৎ ব্যাপার সকল সাধন করিতেছেন এবং পূর্ব্বকালে ভারতীয়গণ তাদৃশী মহীয়সী কীর্ত্তিকর কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। ঐক্যনিবন্ধন প্রাচীন ক্ষত্রিয়কুল কদাপি অপরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই, কিন্তু এক্ষণে সমষ্টি বা ঐক্যরূপ প্রাণাভাবে দেহ-মাত্রাবশিষ্ট বিংশতি কোটি মনুষ্য কএক সহস্রের সম্পূর্ণ অনুগ্রহাধীন হইয়া রহিয়াছে। এই বিশ্বব্যাপার অসীম, ইহার মধ্যে কে একাকী তিষ্ঠিতে পারে? কেহই একাকী এই অনন্তসাগরে বালুকাকণার তুল্যও নহে। সুতরাং কাহার এমত শক্তি আছে যে এই অনন্ত বিশ্ব সংঘর্ষে একাকী টিকিয়া যাইতে পারে? এই জন্যই যত কিছু কার্য্য আছে, যত কিছু ন্যায় বা অন্যায় আছে,

তৎসমস্তই সমাজঘটিত। ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও যে সকল ন্যায়ান্যায়ের বিধান আছে, তৎসমস্তও প্রায় সমাজসম্বন্ধীয়।

আমাদের উন্নতি, অবনতি, স্বাধীনতা, তেজস্বিতা প্রভৃতি সমস্তই সমাজ লইয়া। একের উন্নতি ও অবনতিতে কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সমাজের যৎসামান্য উপকার হইতে যদি সহস্র উন্নত ব্যক্তির ধনপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাও ভাল, কিন্তু সমাজের সামান্য ক্ষতি করিয়া লক্ষ ব্যক্তির অতিশয় উন্নতিও ভাল নহে। সমাজের উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি, ব্যক্তিগত উন্নতি উন্নতিই নয়। আজি ভারত পরাধীন, ভারতের কোটি ব্যক্তি ইংলণ্ডে যাইয়া স্বাধীনভাবে বাস করিলে, ভারতের কিছুই উপকার হইবে না, ভারত সেই পরাধীনই থাকিবে। কিন্তু ভারতের ঐ কোটি ব্যক্তি প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া যদি ভারতকে স্বাধীন করিতে পারে, তবে ভারত স্বাধীন হইবে। ঐরূপ, ভারতের আচারব্যবহার ভাল নয় বলিয়া নিজে সাহেব সাজিলে ভারতের কিছুই উপকার হইবে না, ভারতসমাজের আচারব্যবহার ভাল করিতে পারিলেই প্রকৃত উন্নতি করা হইবে।

যিনি নিজের উন্নতি-অভিলাষে সমাজকে পরিত্যাগ করেন তিনি নিজের উন্নতি না করিয়া অনিষ্টই করেন এবং তৎসঙ্গে সমাজেরও ক্ষতি করেন। সমাজমধ্যে থাকিয়া যিনি উন্নতি করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত উন্নতি করেন। কিন্তু এক্ষণে কেহই তাহা করেন না, সকলেই এক্ষণে সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া আত্মোন্নতির চেষ্টা পান, সুতরাং ধর্ম্মের ন্যায় সমাজের অবস্থাও এক্ষণে ভাল নয়। সামাজিক নিয়ম সকল দূষণীয় হওয়ায় ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অত্যন্ত প্রচার হওয়াতেই সমাজ ও সামাজিক শাসনের

এরূপ দুর্গতি হইয়াছে। আজি কালি সকলেই স্বাধীন হইতে চাহেন ও সমাজের অধীনতাকে বন্ধন মনে করিয়া তদধীন থাকা বিড়ম্বনা জ্ঞান করেন। লোকে এত স্বাধীনতা লুব্ধ হইয়াছে যে, ঈশ্বর, ধর্ম্ম, সমাজ সকলই প্রত্যেকের আপন আপন রুচির অধীন হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহার যেরূপ রুচি তিনি সেই রূপ ঈশ্বর, সেই রূপ ধর্ম্ম ও সেই রূপ সমাজ ভালবাসেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে, সমাজ তাঁহাদের অধীন নহে, তাঁহারাই সমাজের অধীন। অঙ্গসকল যেরূপ দেহের অধীন, ব্যক্তিবর্গও সেই রূপ সমাজের অধীন। কোন্ ব্যক্তি দেহের ক্ষতি করিয়া অঙ্গবিশেষের উন্নতি সাধন করিতে পারে? অঙ্গসকল দেহের অংশ জ্ঞান করিয়া দেহের উপকারক কার্য্য না করিলে যেরূপ দেহ ও অঙ্গ উভয়েরই নাশ হয়, ব্যক্তি সকলও সমাজের অংশ ভাবিয়া সমাজের হিতকর কার্য্য না করিলে সেইরূপ সমাজ ও ব্যক্তি উভয়েরই লোপ হয়। সুতরাং সমাজরক্ষাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য ও সামাজিক শাসন প্রধান শাসন।

সমাজ যেমন আমাদিগকে দণ্ড দানাদি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শাসন করেন, তেমনি আবার অপ্রত্যক্ষভাবেও শাসন করেন। আমাদিগের এমন কর্ত্তব্য কার্য্য অনেক আছে যে, তাহার করণে বা অকরণে সমাজ বা রাজা সাক্ষাৎভাবে কোন প্রকার দণ্ডবিধান করিতে পারেন না, অথচ সে সকলের নিবারণ বা অনুষ্ঠান না হইলে, আমাদিগের মহান্ অনিষ্ট সংঘটিত হয়। সমাজ ঐ সকল করণ বা অকরণ জন্য এ প্রকার গূঢ়ভাবে শাসন করিয়া থাকেন যে, তদ্দ্বারা ঐ সকল অনিষ্ট নিবারিত ও বহু প্রকার ইষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। কাহারও ক্ষতি না করিয়া,

অনেকে মিথ্যাপরায়ণ, মদ্যাসক্ত ও বেশ্যারত হয়েন। ঐরূপ মিথ্যাদি দ্বারা অন্যের ক্ষতি হয় না বলিয়া সমাজ বা রাজা প্রকাশ্যভাবে তাহার শাসন করেন না; কিন্তু ঐ প্রকারে মিথ্যাদির ব্যবহার অভ্যাস হইয়া পরিশেষে সমাজের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়া থাকে। ঐরূপ, কেহ ভিক্ষুককে ভিক্ষা, অতিথিকে অন্ন ও সাধারণহিতকর অনুষ্ঠানে অর্থ না দিলে, অথবা কোন বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধার সাধন না করিলে, সমাজ বা রাজা কিছুই বলিতে পারেন না, অথচ ঐ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান না হইলে, দেশের অনেক হিতকর কার্য্য অসম্পন্ন থাকে। এই সকল অহিত নিবারণ ও হিতানুষ্ঠানে মানবকে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য সমাজ গূঢ় ভাবে যে শাসন করেন তাহার নাম যশ ও নিন্দা।

কেহ কোন অন্যায় কার্য্য করিলে সমাজ তাহার নিন্দা ও কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহার প্রশংসা করেন। উক্তরূপ নিন্দা ওসাধুবাদে মানবের মন বিচলিত হয় ও তদনুসারে মানবগণ নিন্দনীয় কর্ম্ম না করিতে ও যশস্কর কর্ম্ম করিতে, সাধ্যানুসারে যত্নবান্ হয়। মানব, নিন্দাভয়ে অনেক বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে বিরত ও যশোলিপ্সু হইয়া অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে রত হইয়া থাকে। মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী কীর্ত্তি থাকিবে ভাবিয়াও অনেকআয়াসকর ও বহুব্যয়সাধ্য মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; যশোলিপ্সা না থাকিলে, ঐ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতই না। মৃত্যুর পর, যশ হইলে মানবের কোন লাভ আছে কি না, তাহা ভাল রূপে না বুঝিয়াও মানব পরকালের যশের জন্য—চিরজীবন লাভের জন্য নিতান্ত লালায়িত হয়। যখন আমরা ভক্তি-গদ্ গদ্ চিত্তে কালিদাস, আর্য্যভট্ট

প্রভৃতির বিমল যশের ব্যাখ্যা করি, তখন যে আমরা "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই মন্ত্রের সাধনা করিব তাহাতে আর কথা কি ?

* সমাজের সাক্ষাৎ দণ্ড অপেক্ষা মানব নিন্দারূপ দণ্ডে অধিক শাসিত এবং প্রত্যক্ষ পুরস্কার অপেক্ষা যশোরূপ পুরস্কারে অধিকতর উৎসাহিত হয়। সুতরাং নিন্দা-ভয় ও যশোলিপ্সা আমাদের বিলক্ষণ উপকারী। ইহার আরও গুণ এই যে, উহা কেবল মাত্র স্ব সমাজ মধ্যে আবদ্ধ নহে, সকল সমাজেরই লোকেরা পরস্পর পরস্পরের নিকট নিন্দাভাজন না হইতে ও যশোভাজন হইতে ইচ্ছা করে এবং এই শাসনাধীন মানবগণ একবারে স্বাধীনতা শূন্য হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ইহাদ্বারাও এক্ষণে মানবের তদনুরূপ উপকার সাধিত হইতেছে না। কেন না, এক্ষণে সমাজের বিশৃঙ্খলতাহেতু নিন্দাকর ও যশস্কর কার্য্যের নির্ণয় হওয়া সুকঠিন। এক্ষণে লোকে একবিধ কার্য্য করিয়া নিন্দনীয় ও যশস্বী উভয় প্রকারই হইতেছে। এক্ষণে যেমন অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিয়া নিন্দনীয় হয়, সেইরূপ যশস্বীও হয়, অধিক বয়সে বিবাহ দিয়াও নিন্দনীয় ও যশস্বী হইয়া থাকে ; স্ত্রীকে অন্তঃপুরে বদ্ধ রাখিয়া যেমন নিন্দনীয় ও যশস্বী হয়, বাহিরে বাহির করিয়াও সেইরূপ নিন্দনীয় ও যশস্বী হয় ; ইউরোপীয় বেশ ধারণ, ইউরোপীয় ভোজ্য ভোজন ও ইউরোপীয় ভাষা ব্যবহার করিয়া যেমন নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় হয়, দেশীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার ও দেশীয় রীতি নীতির অনুসরণ করিয়াও সেইরূপ নিন্দনীয় ও প্রশংসিত হয়। কেহ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীকে মূর্খ, কুসংস্কার-সম্পন্ন বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন, কেহ চস্‌মা-শ্মশ্রুধারী নব্য-ব্রাহ্মকে নাস্তিক ও দেশের কণ্টক

বলিয়া নিন্দা করিতেছেন। এইরূপে দেখা যায় যে, সমাজমধ্যে কোন্ কার্য্য নিন্দনীয় ও কোন্ কার্য্য যশস্কর তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। সুতরাং মানবের মনে নিন্দা-ভয় ও যশের আশা অনেক কমিয়া গিয়াছে। একই কার্য্য করিয়া, কোন স্থানে যশস্বী ও কোন স্থানে নিন্দনীয় হওয়ায়, নিন্দনীয় ও যশস্কর কার্য্যের অবধারণ করা একান্ত দুরূহ হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে নিন্দা ও যশকে কেহ গ্রাহ্য করে না, যাহার মনে যাহা ভাল বলিয়া বোধ হয়, সে তাহারই অনুষ্ঠান করে। লোকের মতামত শৃগাল কুক্কুরের ধ্বনিবৎ জ্ঞানে অগ্রাহ্য করে।

রাজশাসন।

রাজশাসনও একপ্রকার সামাজিক শাসন। সমাজপতির নামান্তর রাজা। কেহ আদিমকালে রাজাকে রাজক্ষমতা দেয় নাই, তিনি প্রথমে নিজ বাহুবলেই বহু লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ লোকসকল তাঁহার শাসনে বশীভূত হইয়া ও তাঁহার কার্য্যকলাপ দৃষ্টে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তাঁহার সহায় হইয়া উঠিল। তিনি ঐ সহায়-বলে ক্রমে বহু সমাজের অধিপতি হইলেন। সকল দেশেই ঐরূপ এক বা বহুসংখ্যক লোক জন্মিয়াছিল; তন্মধ্যে যিনি শক্তি ও গুণে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন, তিনিই প্রকৃত রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সকল লোক ধর্ম্মশাসন ও সামাজিক শাসন অগ্রাহ্য করিয়া অত্যাচারী হয়, রাজশাসন তাহাদের জন্য নিতান্ত আবশ্যক। রাজা কায়িকদণ্ড বিধান করিয়া তাহাদিগকে সুপথগামী করেন,

সুতরাং রাজা ধর্ম্ম ও সমাজ উভয়েরই রক্ষক। সুতরাং রাজদ্রোহ করিলে ধর্ম্ম ও সমাজের বিদ্রোহাচরণ করা হয়। কিন্তু কখন কখন রাজগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা ভ্রমবশতঃ প্রজাবর্গের অনিষ্টাচরণ করিয়া থাকেন। প্রজাবর্গ যখন সে অত্যাচার সহ্য করিতে না পারে, তখন তাহারা বিদ্রোহী হয় এবং সেই রাজার পরিবর্ত্তে অন্য কোন বলবান্ ও গুণবান্ ব্যক্তিকে রাজপদ প্রদান করে। পূর্ব্ব রাজাও আপনার পদ-রক্ষার জন্য বিলক্ষণ চেষ্টা করেন। সুতরাং এরূপ সময়ে দেশে সমরানল প্রজ্জলিত হয়, রাজ-শাসনের অভাবে দেশে সমূহ অত্যাচার হইতে থাকে, এবং দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দ্বারা দেশ উৎসন্ন হইয়া যায়। এই জন্য যাহাতে রাজ-বিপ্লব না ঘটে, তাহার চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। রাজা ও প্রজা উভয়েরই সে চেষ্টা করা বিধেয়। রাজাকে বিবেচনা করিতে হইবে যে, তিনি প্রজাগণের বেতনভুক্ কর্ম্মচারীমাত্র, প্রজাগণ যাহাতে সুখে থাকে, তাহার বিধান করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য, তিনি তাহাতে অবহেলা করিয়া স্বার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, অথবা অসাবধান হইয়া পদে পদে ভ্রম করিলে প্রকৃতিবর্গের সমূহ অনিষ্ট হইবে, সুতরাং তাঁহার পদ থাকিবে না এবং কর্ত্তব্য কার্য্যের অবহেলা জন্য তিনি পাপী হইবেন। প্রজাবর্গেরও বিবেচনা করিতে হইবে, যে রাজা তাঁহাদিগের হিতের জন্য দিবানিশি চিন্তা করিতেছেন, সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতেছেন এবং এমন কি অনেক সময়ে নিজের প্রাণপর্য্যন্তও দিতে প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহাকে এত অধিক বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় যে, তাহাতে পদে পদে ভ্রম হওয়া সম্ভব, অন্য এক জন রাজা হইলে তাঁহারও যে ঐরূপ ঐরূপ ভ্রম হইবে না, তাহারও

প্রমাণ নাই? বিশেষতঃ প্রজাগণ যে কার্য্য অন্যায় বিবেচনা করিতেছে, তাহা হয়ত প্রকৃত অন্যায় নহে।" অতএব রাজার বিদ্রোহাচরণ করিবার পূর্ব্বে ভালরূপ বিবেচনা করা আবশ্যক। তাই মনু লিখিয়াছেন—

বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ
মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥
দণ্ডোহি সুমহত্তেজো দুর্দ্ধর্ষশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবং ॥

কিন্তু রাজশাসন অত্যন্ত তীব্র ও বলপ্রযুক্ত বিধায় ও তাহার অপব্যবহারে সমধিক অত্যাচার সম্ভব হওয়ায়, আধুনিক লোকে রাজশাসনের প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। তজ্জন্য এক্ষণে স্বাধীন জাতি সকল রাজপদ উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতেছেন; সুতরাং এক্ষণে প্রজা রাজার অধীন নহে, রাজাই প্রজার অধীন। ভারত পরাধীন, ভারতের প্রজার কোন শক্তি নাই, বিদেশের রাজা ভারতের উপর প্রভুতা করিতেছেন। বিদেশীয় রাজা, সকল সময়ে দেশের হিতসাধন করিতে পারেন না। কেন না, অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য পররাষ্ট্রে উৎপাত করিতে হয় এবং পররাষ্ট্রের উপযোগী রীতি নীতির মর্ম্ম ভাল বুঝেন না বলিয়া তৎসমস্ত রক্ষণে যত্ন না থাকায়, দেশের সমূহ অনিষ্ট ঘটে। রাজ-সম্বন্ধীয় অধিক কথা আমরা বলিতে চাহিনা। ধর্ম্মবিজ্ঞানে ইহার কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ফলতঃ সকল দেশেই এক্ষণে রাজশাসনের উপকারিতা কমিয়াছে।

পারিবারিক শাসন।

পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তাহাদের একের সুখে অন্যে সুখী ও একের দুঃখে অন্যে দুঃখী হয়, এইজন্য তাহাদিগের পরস্পরের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি করিবার আবশ্যকতা ও অধিকার আছে। তদ্ভিন্ন ঐ সকলের সহিত আকর্ষণিক সম্বন্ধ থাকা হেতু নৈসর্গিক বলে পরস্পরের প্রতি নৈসর্গিক অনুরাগ জন্মে; সেই অনুরাগ-বলে পরস্পর পরস্পরের প্রিয়-চিকীর্ষু হয়। এই জন্য পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির শাসন অন্য শাসন অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ হয়। কেন না, শাসন-কারীর অন্তরে হিতাভিলাষ মূর্ত্তিমান রহিয়াছে এবং শাসিত ব্যক্তিও মনে মনে জানিতেছে যে, শাসনকারী তাঁহার একান্ত হিতাভিলাষী ও প্রিয়পাত্র। দেখ, পিতা মাতা, পুত্রের শুভ অভি-লাষে কি শাসনই না করিতেছেন? প্রহার, কারাবদ্ধ, অনশন প্রভৃতি সমস্ত প্রকার কঠিন শাসনেই পিতামাতা পুত্রাদিকে শাসন করেন; কিন্তু কেহই তাঁহাদের বিরোধী হয় না। মানব-গণ ধীরভাবে এই শাসনের অধীন হয়।

এই শাসন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হিতকারী। কেননা শিশু-গণ এই শাসনাধীন থাকিয়াই মনুষ্য নামের উপযোগী ও ধর্ম্ম রসাস্বাদনে সমর্থ হয়। এ শাসন না থাকিলে অনেকেই মনুষ্য নামের অযোগ্য হইত। কেননা পিতা মাতা যদি শাসন করিয়া শিক্ষাদি না দিতেন, তাহা হইলে কয় জন বালক শিক্ষা লাভ করিতে পারিত? কয়জন বালক স্বতঃ শিক্ষা পাইতে ইচ্ছা করে? পিতা মাতা প্রভৃতির ঐকান্তিক যত্ন,

শাসন ও উপদেশ না পাইলে বোধ হয়, কোন বালকই উপযুক্ত সময়ে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারিত না। তাহাহইলে শিক্ষা লাভ করা দূরে থাকুক, শিশুগণের জীবন রক্ষা হওয়াই দুর্ঘট হইত।

পৈতৃক শাসনের ন্যায় দাম্পত্য-শাসনও বিশেষহিতকর। দাম্পত্য শাসনের আশ্চর্য্য শক্তি এই যে, উহাতে কায়িক দণ্ড নাই, অবরোধ নাই, অর্থদণ্ড নাই, অথচ উহা এমনই মধুর তীব্র শাসন, যেন তাহাতে শাসিত হইতেই হইবে। অনেক দম্পতি, স্ত্রী বা স্বামীর নীরস বা সরস শাসনের অধীন হইয়া লাম্পট্য প্রভৃতি দোষ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। এমনও অনেক দেখা গিয়াছে যে, যে সকল দোষ শিক্ষায় সারে নাই, ধর্ম্মভয়ে শোধিত হয় নাই, সমাজ-ভয়ে শাসিত হয় নাই এবং রাজদণ্ডেও দমিত হয় নাই, সে সকল দোষও কেবলমাত্র স্ত্রীর সরল ও সরস শাসনে শোধিত হইয়া গিয়াছে। দেখা গিয়াছে, অনেক পুরুষ বিবাহের পূর্ব্বে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিল, বিবাহিত হইয়া ঐ শাসনের গুণে আশ্চর্য্য কর্ম্মদক্ষ হইয়াছে। অতএব পারিবারিক শাসন আমাদিগের নিতান্ত হিতকর—এমন কি, এই শাসন না থাকিলে, সমাজের দুর্গতির সীমা থাকিত না; জ্ঞান, বিদ্যা, উন্নতি, প্রণয় প্রভৃতির আস্বাদমাত্রও পাওয়া যাইত না; মানব অপর জীব হইতে কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ হইতে পারিত না। কিন্তু অপরাপর শাসনের ন্যায় পারিবারিক শাসনেরও এক্ষণে সেরূপ উপকারিতা নাই। এক্ষণে সকলেই স্বাধীনতার প্রয়াসী হইয়া পিতামাতাদির মতানুসারে চলিতে একান্ত অনিচ্ছুক।

দশম পরিচ্ছেদ।

সভ্যতা।

সভ্যতাও এক প্রকার শাসন বিশেষ। কেননা অসভ্য অপবাদ ভয়ে অনেকে সভ্যতানুমোদিত কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হয়েন। বাস্তবিক সভ্যতা ও উন্নতিই মানবের গৌরবের মূল ও মানবত্বের প্রধান কারণ; সুতরাং সভ্য ও উন্নত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু, সভ্যতা কাহাকে বলে? সভ্যতার কোন লক্ষণ নাই, অথবা সভ্যতা-নির্ব্বাচক কোন গ্রন্থও দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মের ন্যায় সভ্যতা-সম্বন্ধেও নানা মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তুমি যাহাকে সভ্যতা বল, আমি তাহাকে অসভ্যতা বলি। হিন্দুরা যাহাকে সভ্যতা বলেন, ইয়ুরোপীয়েরা তাহাকে অসভ্যতা বলেন। অতএব, প্রকৃত সভ্যতা কি তাহা কিরূপে নির্ণীত হইবে? সভ্যতার লক্ষণ কি? বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, প্রাকৃতিক অবস্থার নাম সভ্যতা, সুতরাং সভ্যতা অপ্রাকৃতিক। কেননা, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—যে জাতীয় মনুষ্য প্রাকৃতিক অবস্থায় বাস করে অর্থাৎ যাহারা অনাবৃত স্থানে থাকে, ফল মূল ভক্ষণ করে, যথেচ্ছ বিচরণ করে, উলঙ্গ থাকে, ইচ্ছামত স্ত্রী গ্রহণ করে, তাহারা নিতান্ত অসভ্য। যাহারা প্রাকৃতিকতা পরিত্যাগ করিয়া গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বসতি করে, কৃষিজাত দ্রব্য ভক্ষণ করে, বেশবিন্যাস করিয়া আপন অঙ্গ আবৃত করে, ইন্দ্রিয় দমন করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিণীতা স্ত্রী ভিন্ন অপর স্ত্রী গ্রহণ করে না, তাহারা সভ্য।

যে জাতি যত অধিক প্রাকৃতিকতা পরিত্যাগ করিয়া চলে, সে জাতি তত সভ্য, এবং যে জাতি যত অধিক প্রকৃতি অবলম্বনে চলে, সে জাতি তত অসভ্য। সুতরাং যাহারা অনাবৃত স্থানে বাস করে তাহারা নিতান্ত অসভ্য, যাহারা পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য, যাহারা বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে, তাহারা আরও সভ্য; যাহারা উলঙ্গ থাকে তাহারা অত্যন্ত অসভ্য, যাহারা বল্কল পরিধান করে তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য, যাহারা বস্ত্র পরিধান করে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য; যাহারা বন্য ফল মূল ও মাংস ভক্ষণ করে তাহারা অসভ্য, যাহারা কৃষি-জাত দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য, যাহারা মিঠাই মণ্ডা প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহারা আরও সভ্য; যাহারা ইচ্ছা হইলেই স্ত্রীগ্রহণ করে, তাহারা অসভ্য, যাহারা মনের মিলন পর্য্যন্ত বিবাহবন্ধন ছেদন করে না তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য, যাহারা যাবজ্জীবন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ থাকে তাহারা আরও সভ্য; যাহারা নিজের মাত্র ভরণ-পোষণ করে তাহারা অসভ্য, যাহারা স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণ করে তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য, যাহারা সকলেরই ভরণ-পোষণ করিবার চেষ্টা করে, তাহারা আরও সভ্য; যাহারা কেবল আপন সুখের জন্য ব্যস্ত, তাহারা অসভ্য, যাহারা প্রতি-বেশীকে আপনার ন্যায় দেখে, তাহারা তদপেক্ষা সভ্য, যাহারা সর্ব্বভূতকে আপনার ন্যায় দেখে, তাহারা আরও সভ্য; যাহারা প্রণয় জন্য ভালবাসে, তাহারা অসভ্য, যাহারা কর্ত্তব্য বলিয়া ভালবাসে, তাহারা সভ্য; যাহারা দুঃখ হইলেই কাঁদে এবং সুখ পাইলেই হাসে, তাহারা অসভ্য, যাহারা সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান

করে, তাহারা সভ্য; যাহারা অহঙ্কারমত্ত তাহারা অসভ্য যাহারা বিনয়ী তাহারা সভ্য; যাহারা ক্রোধ হইলেই জ্বলিয়া উঠে তাহারা অসভ্য, যাহারা ক্রোধ নিবারণ করিতে পারে, তাহারা সভ্য; যাহারা ক্ষতিকারকের ক্ষতি করে, তাহারা অসভ্য এবং যাহারা ক্ষমা করে, তাহারা সভ্য। এইরূপে প্রমাণিত হইবে যে, যে কার্য্য, প্রকৃতির যত অধীন, সে কার্য্য তত অসভ্য, এবং যে কার্য্য যত কৃত্রিম, তাহা তত সভ্য।

যুক্তি-অনুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিলেও একথা সত্য বলিয়া বোধ হয়। কেননা যাহা প্রাকৃতিক, তাহা আপনা হইতেই হয়, তাহার অনুষ্ঠান জন্য প্রয়াস পাইতে হয় না। যাহা কৃত্রিম তাহাই যত্নদ্বারা সাধন করিতে হয়। পরিধান জন্য যাহারা বল্কল ব্যবহার করে, তাহারা বিনা আয়াসে প্রকৃতিপ্রদত্ত পদার্থ লইয়া পরিধান করে, এজন্য তাহারা অসভ্য। যাহারা বস্ত্র ব্যবহার করে, তাহারা নানা প্রকার বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিয়া তুলা, পশুলোম ও গুটী হইতে সূত্র প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র বয়ন করে, সেই বস্ত্রকে নানা প্রকার বর্ণে রঞ্জিত করে, এবং স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি সংলগ্ন করিয়া তাহাকে সৌন্দর্য্যশালী করে, এজন্য তাহারা সভ্য। যাহারা যত বুদ্ধিকৌশল ও শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারে, তাহারা তত উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে, সুতরাং তাহারা তত সভ্য। যাহা আপনা হইতে হয়, তাহা যদি সভ্যতা হইত, তাহা হইলে বন্য মানব ও ইতর পশু পক্ষীরাও সভ্য হইত। অতএব প্রাকৃতিকতা অসভ্যতা এবং অপ্রাকৃতিকতা সভ্যতা।

কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রাকৃতিকমাত্রই সভ্যতা হইতে

পারে না। কেননা তাহা হইলে যাহারা আহার করে বা নিদ্রা যায় তাহারা অসভ্য এবং যাহারা আহার ও নিদ্রা ত্যাগ করে, তাহারা সভ্য; যাহারা স্ত্রী গ্রহণ করে, তাহারা অসভ্য এবং স্ত্রীত্যাগী সন্ন্যাসীরা সভ্য; যাহারা পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয় বন্ধুদিগকে ভালবাসে, তাহারা অসভ্য, এবং যাহারা এককালে মমতা-শূন্য, তাহারা সভ্য। কিন্তু তাহা হইলে মানবের অস্তিত্বই থাকে না। কেননা যাহা প্রাকৃতিক, তাহা আমাদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয়; পরমেশ্বর আমাদের প্রয়োজন সাধন জন্য তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং প্রাকৃতিক ত্যাগ করিলে, আমাদিগের অভাবমোচন ও প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিবার শক্তিও আমাদের নাই। সুতরাং আমরা প্রাকৃতিকতা পরিত্যাগ করিতে পারি না, ত্যাগ করিলেও সমূহ মঙ্গল। অতএব প্রাকৃতিকতা ত্যাগ সভ্যতা হইতে পারে না। তাহা হইলে সভ্যতাই অপ্রাকৃতিক হয়।

তবে সভ্যতা কাহাকে বলে? আমাদের বোধ হয়, যাহা প্রকৃতি-মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে না থাকিয়া গূঢ়ভাবে আছে, সেই হিতকর গূঢ় প্রকৃতির প্রকাশই সভ্যতা; প্রকৃতির অবাধ্যতা বাস্তবিক সভ্যতা নহে। গৃহ, বস্ত্র, অন্ন, ব্যঞ্জন প্রভৃতি কৃত্রিম পদার্থ সকল প্রাকৃতিক না হইয়াও, প্রাকৃতিক। যেহেতু ঐ সকল প্রস্তুত করিবার উপকরণ প্রাকৃতিক, যোগাকর্ষণাদি শক্তি প্রাকৃতিক এবং ঐ সকল সংযুক্ত করিয়া গৃহাদি প্রস্তুত করিবার যে শক্তি মানবের আছে, তাহাও প্রাকৃতিক। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে, মানব নির্ম্মিত কোন পদার্থকে কৃত্রিম বলা যায় না।

কেননা তাহা হইলে বাবুইয়ের বাসা উইএরঢিবি এবং লাক্ষা, মধু প্রভৃতি যে সকল পদার্থ ইতর জন্তুপ্রণীত তদ্‌সমস্তকেও কৃত্রিম বলিতে হয়। ইতর-জন্তু-প্রণীত পদার্থ যদি কৃত্রিম না হইল, তবে মানব-প্রণীত পদার্থ কৃত্রিম হইবে কেন? মানবও ত ইতর জন্তুর ন্যায় ঈশ্বরেরই সৃষ্ট। এ প্রবন্ধে আমাদের সে বিষয় আলোচনা করার আবশ্যকতা নাই। এপ্রবন্ধে আমরা মানব-প্রণীত পদার্থকে কৃত্রিম বলিতে প্রস্তুত আছি, কেবল এই মাত্র বলিতেছি যে মানব যাহা প্রস্তুত করে, তাহা মধুমক্ষিকাদির ন্যায় প্রাকৃতিক শক্তির বলে করিয়া থাকে, প্রকৃতির বিরুদ্ধ কিছু করিবার সাধ্য মানবের নাই, তাহা করিলে, মানব বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

প্রাকৃতিক আহারনিদ্রা জীবন-রক্ষার জন্য নিতান্ত আবশ্যক; প্রকৃতির প্রতিকূলাচরণ করিয়া তাহা বন্ধ করিলে নষ্ট হইতে হয়। সুতরাং তাহা মানবের সাধ্যাতীত। গৃহ-পরিচ্ছদাদি প্রকৃতির প্রতিকূল নয় বরং অনুকূল। কারণ, প্রাকৃতিক পর্ব্বত গুহা, বৃক্ষতল ও বল্কলাদির আদর্শে মানব গৃহ ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়াছে। আবার ক্রোধ যেমন প্রাকৃতিক, ক্ষমাও আবার তেমনি প্রাকৃতিক; ভাল-বাসা যেমন প্রাকৃতিক, বৈরাগ্যও তেমনি প্রাকৃতিক; স্বার্থপরতা যেমন প্রাকৃতিক, সহানুভূতিও তেমনি প্রাকৃতিক; সুখ যেমন প্রাকৃতিক, দুঃখও তেমনি প্রাকৃতিক এবং ঐ সকলের দমন ও বৃদ্ধি করিবার শক্তিও প্রাকৃতিক; সুতরাং মানব, হিতাভিলাষে ঐ সকলের সামঞ্জস্য করিতে পারে। অতএব মানব হিত-সাধন বা অহিত-নিবারণ জন্য প্রাকৃতিক উপকরণ লইয়া যাহা প্রকাশ করে, তাহাই সভ্যতা।

এই জন্য সভ্যতা মানবের এত কাঙ্ক্ষণীয়, এবং সভ্যজাতির এত আদর।

যাহা আপনা হইতে হয়, তাহার আবার প্রশংসা কি? তাহার যে প্রশংসা, তাহা প্রকৃতির বা ঈশ্বরের। ঈশ্বর চুম্বককে লৌহাকর্ষণের শক্তি দিয়াছেন, তাই সে লৌহাকর্ষণ করে, তাহার নিজের চেষ্টায় সে কিছুই করে না। তাহার এই মাত্র গৌরব যে, সে বলিতে পারে—আমি মৃত্তিকা না হইয়া চুম্বক হইয়াছি, আমি বড় ঘরে জন্মিয়াছি। ঐরূপ যে স্ত্রী, রূপে মুগ্ধ হইয়া কোন সুন্দর যুবককে ভালবাসে, তাহার সে ভালবাসার প্রশংসা কি? সে ত যুবার রূপে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াই ভালবাসিয়াছে, স্রোতে তাহাকে লইয়া গিয়াছে। পতি কুৎসিত ও ভালবাসার যোগ্য নয় দেখিয়াও যে নারী, কর্ত্তব্যের অধীন হইয়া চেষ্টা দ্বারা ভালবাসিতেছে, তাহারই ভালবাসা প্রশংসার যোগ্য। কেন না, এই ভালবাসার উৎপত্তি করিতে তাহার মনোবৃত্তি সকলের পরস্পর দ্বন্দ্ব হইয়াছে—ঐ ভালবাসা জন্মাইতে তাহাকে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। যদি ঐ কার্য্য করায় তাহার বৃত্তি-সামঞ্জস্য করা হইয়া থাকে, ও তদ্দ্বারা মানবসমাজের অহিত করা না হইয়া থাকে, তবে উহাকে সভ্য ব্যবহার বলিতে হইবে। ঐ কার্য্য নারীর প্রকৃত প্রশংসা-যোগ্য। যখন আমরা সভ্যতার বর্ণনা করিব, তখন আমরা এবম্বিধ রমণীরই প্রশংসা করিব। আর যখন স্বভাবের শোভা বর্ণনা করিতে করিতে ময়ূরময়ূরীর নৃত্য বর্ণন করিব, নীলাকাশে চন্দ্রিকাতাতির সুখ্যাতি করিব, যখন নির্ম্মল নদীর লহরী-লীলার শোভার বিষয় বলিব, যখন ভ্রমরের মধুপান ও ভানুদর্শনে কমলিনীপ্রকাশাদির বিষয় বর্ণনা করিব,

সেই সময়ে প্রথমোক্ত রূপমুগ্ধা যুবতীর প্রণয়ের প্রশংসা করিব। সৌন্দর্য্যে ঐ রমণীর প্রণয় শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু মানবীয় উচ্চ ভাব উহাতে কিছুমাত্র নাই; সুতরাং উহা মাহাত্ম্যহীন। এই জন্য ভারত-সতী সাবিত্রী ও ভারতীয় কুষ্ঠ-রোগ-গ্রস্ত ব্রাহ্মণ-পত্নীর সতীত্বের যত মাহাত্ম্য, অজ-রমণী ইন্দুমতী ও ভরতমাতা শকুন্তলার সতীত্বের তত মাহাত্ম্য নহে। কেননা এক বৎসর পরে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে জানিয়াও, সাবিত্রী সঙ্কল্পিত স্বামী সত্যবান্‌কে পরিত্যাগ করেন নাই এবং ঐ ভারতোক্ত পতিব্রতা রমণী কুষ্ঠ-রোগ-গ্রস্ত পতির মনস্তুষ্টি জন্য কত দুরূহ ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছেন। ইন্দুমতী ও শকুন্তলার প্রণয় অধিক বটে, ঐ প্রণয়ের মধুরতা অধিক বটে, কিন্তু তাহা তত শ্লাঘনীয় নহে। কেননা তাঁহাদের প্রণয় প্রাকৃতিক আকর্ষণজাত। তাঁহারা অজাদির রূপগুণে মুগ্ধ হইয়াই ভাল বাসিয়াছেন।

যাহা প্রাকৃতিক, তাহা হইতে যে উপকার পাওয়া যায়, তাহা সভ্য অসভ্য সকলেই পাইয়া থাকেন, কিন্তু কৃত্রিম পদার্থ হইতে যে উপকার পাওয়া যায়, তাহা সভ্য না হইলে, পাওয়া যায় না; এবং প্রাকৃতিক পদার্থ হইতে আমাদের যে অপকার হয়, তাহা নিবারণ করিবার প্রাকৃতিক যে সকল উপায় আছে, তাহা সকলেরই প্রাপ্য বটে, কিন্তু তৎসমস্তের কৃত্রিম উপায় সভ্যেরা ভিন্ন অন্যে পায় না। সুতরাং সভ্যদিগের সুখসম্পাদন ও দুঃখ-নিবারণ করিবার যত উপায় আছে, অসভ্যদিগের তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প। তাই তুলনায় সভ্যেরা দেবতা ও অসভ্যেরা পশু-তুল্য। কিন্তু অগ্নি যেমন রন্ধন ও গৃহদাহ উভয়ই সম্পাদন করে, সভ্যতাও

সেইরূপ হিত ও অহিত উভয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। কেননা অসভ্যদিগের শরীর দৃঢ়, মন অটল ও অভাব অল্প বিষয়ে, সুতরাং তদপূরণজনিত দুঃখও অল্প। আহার-বিহারাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য গুলি সম্পাদন করিতে পারিলেই, তাহারা সুখী হয়। কিন্তু সভ্যগণের শরীর শক্তিহীন, মন চিন্তাযুক্ত ও অভাব অনেক হওয়ায় তৎসমেস্তর অপূরণ-জনিত দুঃখ অনেক। অসভ্যদিগের যেমন মানসিক বল অল্প, সভ্যদিগের তেমনি শারীরিক বল অল্প। কারণ অসভ্যেরা কেবল শরীর চালনা করায় তাহাদের শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়। সভ্যগণ অধিক মানসিক চিন্তা করায় তাহাদের শরীর দুর্ব্বল হয়। অসভ্যেরা দৈহিক বল দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করে, সভ্যেরা অনেক কার্য্য যন্ত্রবলে সমাধা করে। সভ্যেরা আগ্নেয়াস্ত্রদ্বারা মুহূর্ত্ত মধ্যে সহস্র ব্যক্তির প্রাণনাশ করিতে পারে, তজ্জন্য অসভ্য মল্লযুদ্ধে তাহারা অক্ষম। তাহারা বাষ্পীয় রথে এক মাসের পথ একদিনে যায়, সুতরাং অসভ্যদিগের পথভ্রমণে তাহারা অসক্ত। শীতবাতাদি নিবারণোপযুক্ত যথেষ্ট দ্রব্য সভ্যদিগের আছে, তজ্জন্য তাহারা অসভ্যদিগের ন্যায় শীত বাতাদি সহ্য করিতে পারে না। এই প্রকারে সভ্যদিগের কায়িক শক্তি মাত্রেরই অল্পতা হয়। কিন্তু তৎ-পরিবর্ত্তে তাহাদের মানসিক শক্তি ও শ্রমের বৃদ্ধি হয়। সেই মানসিক শক্তি-প্রভাবে তাহারা নানা প্রকার আশ্চর্য্য বিজ্ঞান, দর্শনাদি বিষয়ে বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করে, নানা প্রকার উৎকৃষ্ট শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করে এবং নানা প্রকার সুখকর পদার্থ ও সমাজ-স্থিতির সুশৃঙ্খলা স্থাপন করে বটে, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল হওয়ায় নানাপ্রকার শারীরিক রোগযন্ত্রণা এবং পুনঃ পুনঃ অবস্থার বৈপরীত্য

ঘটায় নানা প্রকার মানসিক কষ্ট পাইয়া থাকে। আবার মনের সরলতা প্রাকৃতিক, সুতরাং উহা অসভ্যদিগের ধর্ম্ম। কুটিলতা কৃত্রিম, উহা সভ্যদিগের ধর্ম্ম। প্রতিবেশীকে আত্মবৎ দেখা সভ্যতার কার্য্য সত্য বটে, কিন্তু প্রতিবেশীকে বিরোধী বলিয়া সভ্য সেই প্রতিবেশীর সহিত অতিশয় কুটিল ব্যবহার করে। কুটিলতা হইতে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চাটুবাদ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়; এবং তাহা হইতেই ক্রমে নানা প্রকার বিবাদ বিসংবাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অসভ্যেরা শক্তি অনুসারে মাননীয় হয়; যাহার যত অধিক বল, সে তত প্রধান। এমন কি, বলই রাজত্বের কারণ। যাহার যেমন বুদ্ধি, সে তত সম্মানিত হয়, এবং যে যত কার্য্য করিতে পারে, সে তত যশস্বী হয়। নির্গুণেরা সমাজে অপদস্থ থাকে। কিন্তু সভ্যসমাজ তদ্রূপ নহে। সভ্যসমাজে প্রকৃতিবিরুদ্ধ সাম্যভাব ঘোষিত হয়, অথচ কার্য্যে অসভ্যদিগের অপেক্ষা অধিক বৈষম্য থাকে; এজন্য মানব মনোবেদনায় অস্থির হয়। চক্ষু থাকিতেও তাহারা অন্ধের ন্যায়। কেননা তাহারা মনে মনে জানিতেছে যে, কার্য্য মাত্রেই তাহারা সমান অধিকারী, কিন্তু কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে তাহার বিপরীতাচরণ দেখিয়া মনঃক্লেশে চঞ্চল হয়। সভ্যেরা কেবল মুখেই সর্ব্বস্ব দেখান অর্থাৎ ইতর, ভদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকে মহাশয় বলিয়াও মান্যবর পাঠ লিখিয়াই সাম্যের ফল প্রদান করেন।

সভ্যসমাজের এই সকল ব্যাপার দেখিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, সভ্যসমাজ বাহ্য চাক্‌চিক্যে পরিপূর্ণ ও নানাবিধ সুখকর পদার্থে পরিব্যাপ্ত হইলেও প্রকৃত পক্ষে অসভ্যদিগের ন্যায় সুখী নহে। বাস্তবিক সভ্যসমাজে যত রোগ, যত মারীভয়,

যত কলহ, যত মনঃকষ্ট—অসভ্য সমাজে তাহা অপেক্ষা অনেক কম। অসভ্য সমাজে সুখকর দ্রব্যের আধিক্য নাই সত্য, কিন্তু তাহাদের দুঃখের ভাগও অল্প। অসভ্যদিগের প্রার্থনীয় বিলাসের দ্রব্য বেশী না থাকায় তাহাদের তৃপ্তি-সুখ অল্প বটে, কিন্তু অভাব পূরণ হইল না বলিয়া যে দুঃখ, তাহা তাহাদিগের অল্প। সভ্যেরা সুখ-জনক দ্রব্যের অনেক আস্বাদ পাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে অভাবপূরণ-জনিত অনেক প্রকার দুঃখ পাইতে হয়। মানুষ সুখী না হউক, যদি দুঃখ না পায়, তাহাই ভাল।

কষ্ট দুই প্রকার;—দুঃখজনিত এবং অসুখজনিত। আবশ্যকীয় পদার্থের অভাবে দুঃখ জন্মে; এবং সুখকর পদার্থের অসদ্ভাবে অসুখ ঘটে। আমাদের শরীর রক্ষার নিমিত্ত আহার, পানীয় জল ও বায়ুর প্রয়োজন, তাহার অভাব হইলে ক্ষুধা, পিপাসা ও গ্রীষ্ম রূপ দুঃখ জন্মে। গোলাপ পুষ্পের সুগন্ধ পাইলে আমরা আমোদিত হই, তাহা না পাইলে পুষ্পাঘ্রাণ-জনিত সুখ পাইলাম না বলিয়া অসুখ হয়। ঐরূপ মিষ্টান্ন ভোজনে রসনার সুখ, সঙ্গীত শ্রবণে কর্ণের সুখ, সুশোভিত পদার্থ দর্শনে চক্ষুর সুখ, এবং সুকোমল পদার্থ স্পর্শনে অঙ্গের সুখোৎপত্তি হয়। যদি ঐ সকল সুখের অভাব হয় অর্থাৎ ঐ সকল সুখভোগ করিবার উপযুক্ত পদার্থ আমরা না পাই, তবে আমাদের ঐ সকল সুখের অভাব অর্থাৎ অসুখ হয়। কিন্তু যে সকল সুখের অভাব হয়, সে সকল সুখ যদি আমরা কখনও ভোগ না করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহার অভাবে আমাদের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। যদি সুখকর বস্তুর কচিৎ আস্বাদ পাইয়া থাকি, তাহা হইলেই তাহার

অপ্রাপ্তিতে কষ্ট হয়। অসভ্য মানবগণ যখন উৎকৃষ্ট হর্ম্ম্যে বাস, সুকোমল শয্যায় শয়ন, বিবিধ সুমিষ্ট ভক্ষ্য ভোজন, বিশুদ্ধ তান-লয়-সংযুক্ত সঙ্গীত শ্রবণ, ও বহুবিধ ভোগ্য বিলাস দ্রব্য উপ-ভোগ জনিত আনন্দের কিছুমাত্র আস্বাদন পায় নাই, তখন ঐ সকলের অভাবে তাহাদিগের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। সভ্য-দেশবাসী পল্লীগ্রামস্থ নিম্নশ্রেণীর লোকদিগেরও ঐ সকলের অভাবজন্য মনে নিরানন্দ উদিত হয় না। যেহেতু তাহারা কখনও ঐ সকল সুখের রসগ্রহ করে নাই, সুতরাং সে সকলের অভাব তাহাদের অভাব বলিয়াই বোধ হয় না, তাহার প্রার্থীও হয় না।

সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সুখ ও ভোগবিলাসের অশেষবিধ কৃত্রিম পদার্থের সৃষ্টি হয়। যত অধিক বস্তু প্রস্তুত হয়, ততই সেই সকল পাইবার অভিলাষ বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং সেই অভিলাষ যত অপূর্ণ থাকে, ততই মানবের অসুখ বৃদ্ধি হয়। সভ্যসমাজে থাকিয়া সুখকর দ্রব্য ভোগ করিতে করিতে আমরা এমত অভ্যস্ত হইয়া যাই যে, তদভাবে আমাদিগের প্রাকৃতিক অভাবজনিত দুঃখের ন্যায় অসুখ ভোগ করিতে হয়। য়ুরোপীয় সভ্যতা ঐরূপ কষ্টের মূলীভূত কারণ। কেননা য়ুরোপীয় সভ্যতা সকলকেই স্বাধীন ও সমান বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে ও সকল-কেই সুখোপভোগে তুল্য অধিকারী বলিয়া উদ্ঘোষণ করিতেছে। সুতরাং সকলেই সর্ব্বপ্রকার সুখ লাভের জন্য লোলুপ—সকলেই বড় চাকুরি, বড় পদের নিমিত্ত লালায়িত, অথচ অতি অল্প লোকেই তাহা পায়; অধিকাংশই বিফল-মনোরথ হইয়া দুঃখ পায়। আবার কেহ কেহ কিছুদিনের জন্য পরমর্য্যাদাসম্পন্ন হইয়া

সুখ ও বিলাস ভোগে অভ্যস্ত হইয়া অপদস্থ হয়; তখন তাহার কষ্টের সীমা থাকে না। তখন সে পদ নাই, সে অর্থ নাই, সুতরাং সে বিলাসের দ্রব্য কোথায় পাইবে? তখন তাহাকে অট্টালিকা ছাড়িয়া কুটীরে বাস করিতে হয়, শকট-ভ্রমণ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে বেড়াইতে হয়, পলান্ন, পিষ্টক, সুমিষ্ট ভোজ্য বর্জ্জন করিয়া, শাকান্ন আহার করিতে হয়, বহুমূল্য বেশ পরিত্যাগ করিয়া সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হয়, ভৃত্যাভাবে সমস্ত কার্য্য স্বয়ংই নির্ব্বাহ করিতে হয়। সুখ লাভ করিতে গিয়া দুঃখই লাভ করে। অসভ্যদিগের সুখের সামগ্রী অধিক না থাকায় তাহা পাইবার জন্য তাহাদিগের লালসা জন্মে না—না পাওয়ায় কষ্টও হয় না। তাহাদিগের কেবল স্বাভাবিক নিত্যনৈমিত্তিক পদার্থের প্রয়োজন, কেবল তাহারই জন্য তাহারা চেষ্টা করে, এবং সেই চেষ্টা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে প্রায়ই সফল হয়। অবশিষ্ট সময় তাহারা বিশ্রাম ও মনোমত ক্রীড়া-সুখে অতিবাহিত করে। সভ্যগণের সুখের সামগ্রী অনেক এবং তাহা পাইবার দ্বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, তন্নিমিত্ত তাহারা বাল্য হইতে বৃদ্ধ কাল পর্য্যন্ত দিবারাত্রি ভয়ানক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করে, তাহাতে শরীর ও মন উভয়ই অসুস্থ হয়; কিন্তু যাহা পাইবার জন্য এই কঠোর তপস্যা করিয়া দেহ ও মন নষ্ট করে, তাহা না পাইয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হয়; প্রকৃত সুখের স্বাদগ্রহণ তাহাদের অদৃষ্টে আদৌ ঘটে না। শুদ্ধ রোগ, শোক, নৈরাশ্য প্রভৃতি-জনিত কষ্ট ভোগ করিতে করিতেই তাহাদের জীবন শেষ হয়।

সভ্য সমাজের এই সকল দুরবস্থা দেখিয়া অনেকে অসভ্যতাকে প্রকৃত সুখকর মনে করেন। তাই গোল্ডস্মিথ প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ কৃষি-জীবনের প্রশংসা করিয়াছেন এবং শিহ্লণ মিশ্র প্রভৃতি আর্য্য পণ্ডিতগণ মানব অপেক্ষা পশু-জীবনের প্রশংসা করিয়াছেন। শিহ্লণ মিশ্র বলিয়াছেন,—

যদ্বক্ত্রং মুহুরীক্ষসে ন ধনিনাং ব্রূষে ন চাটুং মৃষা
নৈষাং গর্ব্বগিরঃ শৃণোষি ন পুনঃ প্রত্যাশয়া ধাবসি।
কালে বালতৃণানি খাদসি সুখং নিদ্রাসি নিদ্রাগমে,
তন্মে ব্রূহি কুরঙ্গ! কুত্র ভবতা কিন্নামতপ্তং তপঃ॥

হে মৃগ তুমি কখনও প্রত্যাশাপন্ন হইয়া ধনীর নিকট যাও না, কাহারও তোষামোদ কর না, কাহারও গর্ব্ববাক্য শ্রবণ কর না। অথচ ক্ষুধা হইলেই তৃণ ভোজন কর ও নিদ্রাকর্ষণ হইলেই সুখে নিদ্রা যাও। বল তুমি কি তপস্যার ফলে এই সুখের অবস্থা পাইয়াছ?

কিন্তু বাস্তবিক মানব সভ্য না হইয়া চিরকাল অসভ্যই থাকিবে, একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। সভ্যতাই মানবের মানবত্ব এবং অসভ্যতাই মানবের পশুত্ব। পশুতে ও মানবে প্রভেদ এই যে, পশুরা কেবল প্রকৃতির অনুসরণ করে, মানব তাহা করে না। পশুগণ চিরকালই প্রকৃতির নির্দ্দেশ মত আহার, নিদ্রা ও স্ত্রীসম্ভোগাদি করিয়া কালযাপন করে। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পশুরা যে প্রকারে বিচরণ করিত, এখনও ঠিক সেইরূপ রহিয়াছে, তাহার অণুমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের মানবের সহিত তুলনা করিয়া দেখ, কত প্রভেদ

দৃষ্ট হইবে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বকার বৃটনীয়দের সহিত এক্ষণ-কার বৃটনদিগের তুলনায় পশু ও দেবতার প্রভেদ লক্ষিত হইবে। সভ্যতাই ইহার হেতু। যদি সভ্যতা না হইত, তাহা হইলে পশুদিগের মত ইহারাও চিরকাল প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তন করিয়া এক রূপই থাকিত। তাহা হইলে পশুতে আর মানবে বৈলক্ষণ্য কি থাকিত? তাহা হইলে মানব পৃথি-বীর শ্রেষ্ঠ জীব হইতে পারিত না! ঈশ্বর মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ ও পরিবর্ত্তনশীল করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত সভ্যতা মানবের স্বাভাবিক, সুতরাং অবশ্যম্ভাবী। জন্মিলে যেমন প্রথমে বাল্যকাল ও পরে যৌবন আপনা হইতেই আইসে, সমাজেরও সেইরূপ অসভ্য কালের পরে সভ্যকাল আসিবে। সমাজের পক্ষে অসভ্যাবস্থা শৈশব কাল এবং সভ্যাবস্থা যৌবন কাল। বাল্য-কাল যেরূপ স্বভাবতঃ ক্রীড়াসুখের কাল, অসভ্য কাল সেইরূপ সমাজের স্বভাবতঃ মানসিক সুখের কাল। যৌবন কাল যেরূপ মানবের চিন্তাজটিল কার্য্যকাল, সভ্যকাল সেইরূপ সমাজের সুখদুঃখমিশ্রিত উন্নতির কাল। যৌবন কালে নানা দুঃখে ব্যাপৃত হইতে হয়, ও নানাবিধ চিন্তাভার স্কন্ধে পতিত হয় বলিয়া যদি চিরবাল্যের প্রার্থনা সঙ্গত হয়, তাহা হইলেই সভ্যকালের নানা প্রকার কষ্ট দেখিয়া চির অসভ্য কালের কামনা যুক্তিসিদ্ধ হইবে; কিন্তু চিরকালই বাল্য-ক্রীড়ায় ও পিতা মাতার হস্তাবলম্বনে প্রতিপালিত হইয়াই যদি জীবন অতি-বাহিত করিতে হইল, তবে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কোথায় থাকিল? অতএব অসভ্যাবস্থার কামনা কখনও উচিত নহে। বিশেষতঃ সভ্যতা কেবল মানবের যত্নে আইসে না ও মানবের

যত্নে যায় না। উহা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আপনিই আসিয়া পড়ে। তাহা না হইলে কখনই উহা আসিত না। যত্ন করিয়া সভ্যতা আনার কোন কারণ নাই। কারণ, অসভ্য কালেও যেমন মানব জন্মিত ও মরিত, সভ্যকালেও সেইরূপ জন্মে ও মরে; বরং এক্ষণে অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। অসভ্যকালে মরিলে মানবের যে গতি লাভ হইত, সভ্যকালে মরিলেও সেই গতি লাভ হয়। অধিকন্তু তখন মানবের সুখ ছিল, এখন সে সুখের অভাব হইয়াছে। সুতরাং অসভ্যকালের অনায়াসলভ্য ফলমূল পরিত্যাগ করিয়া সভ্যকালোচিত শ্রমার্জ্জিত খাদ্য অর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। যখন পরিণামফল মন্দ বই ভাল নয় তখন কষ্ট বাড়াইবার প্রয়োজন কি? কেবল চাকচিক্যে বিমোহিত হইয়াই কি মানব কষ্টকর সভ্যতা আনয়ন করিয়াছে? কখনই না। প্রাকৃতিক অভাবই সভ্যতা আনয়নের একমাত্র হেতু।

ক্ষুধা অর্থাৎ আহার করিবার ইচ্ছা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। আহার না করিলে অত্যন্ত যাতনা হয় ও পরিশেষে মৃত্যু হয়। আদিমকালে মানবগণ প্রাকৃতিক ফলমূলাদি ভোজন করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিত, নদীপ্রভৃতির জল পানে পিপাসা নিবারণ করিত, গিরিগুহা ও বৃক্ষতলাশ্রয়ে রৌদ্রবৃষ্টিপ্রভৃতিজনিত দুঃখ দূর করিত। কিন্তু ক্রমে যখন মানবের সংখ্যা বহুল হইয়া পড়িল, তখন প্রাকৃতিক ফলে আর সকলের কুলাইল না, সুতরাং তখন মানবের কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিতে হইল; নদীনীরে পিপাসাশান্তির উপায় হইল না দেখিয়া অগত্যা পুষ্করিণী খনন করিতে হইল, গিরিগুহা প্রভৃতি অপ্রাপ্য হইল দেখিয়া

গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইল। অভাব হওয়াতেই তাহা নিরাকরণ করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মিল। বুদ্ধিবলে তাহাতে মানব কৃতকার্য্যও হইল। এইরূপে অভাব মোচনের নিমিত্ত মানব সভ্যতার সৃষ্টি করিল ও সুখদ কৃত্রিম দ্রব্যের আস্বাদ পাইয়া তদুৎপাদনে অধিকতর যত্নশীল হইল। ক্রমে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, দাসত্ব প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য আরব্ধ হইল; বিজ্ঞান, দর্শন ও জ্যোতিস্তত্ত্বাদিগ্রন্থ প্রণীত হইল; সমাজের পূর্ণ যৌবন কাল হইল,—মানবনাম সার্থক হইল। কিন্তু যেমন যৌবনের পরে বার্দ্ধক্য ও তদন্তে মৃত্যু হয়, সমাজেরও সেইরূপ সভ্যতার পরে শান্তি ও তদন্তে ধ্বংস হয়। কোনও সমাজ চিরকাল সমভাবে থাকে না। পূর্ণ সভ্যতার পরে কিছু কাল সমাজ স্থির থাকে; তদানীং সমাজের আর উন্নতি দৃষ্ট হয় না। পরে আবার ক্রমে ক্রমে অবনতি হইতে থাকে ও পরিশেষে সে সমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও থাকে না। বৃদ্ধের অন্তে তাঁহার পুত্র যেরূপ তৎস্থলাভিষিক্ত হইয়া কার্য্য করে, তদ্রূপ ঐ বৃদ্ধ সমাজের পরে আবার নূতন সমাজ সভ্য হইতে থাকে। এই জন্য প্রাচীন সভ্য মিসর, আসিরিয় প্রভৃতি জাতির লোপ হইয়াছে এবং নবীন সভ্য য়ুরোপীয়েরা তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পৃথিবীর শোভা বিস্তার করিতেছেন; ভারত এক্ষণে জীবিত মাত্র রহিয়াছে।

এই সকল দেখিয়া অনেকে ভাবিতে পারেন, যখন সভ্যতা মানবের অবশ্যম্ভাবী এবং উহাতে যখন মানবের কষ্ট বৃদ্ধি হয়, তখন সভ্যতা মানবের বিড়ম্বনা। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যৌবন কাল যদি মানবের বিড়ম্বনা হয়, তবে সভ্যতাও বিড়ম্বনা হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সভ্য জাতির যে

এত কষ্ট, সভ্যতা নির্ব্বাচনের দোষই তাহার প্রধান কারণ। সভ্যতার প্রকৃত লক্ষণ বুঝিতে না পারিয়া, মানব অনেক অহিত-করী বিষয় সভ্যতা মধ্যে পরিগণিত করিয়াছে, তাহাতেই সভ্য-সমাজের এত দুর্গতি হইয়াছে। যদি বিশেষ রূপ পর্য্যবেক্ষণ সহকারে সভ্যতা নির্ব্বাচন করা যায়, তাহা হইলে কখনই সভ্যজাতির কষ্ট হয় না, প্রত্যুত তাহা হইলে সভ্যসমাজ দীর্ঘ-জীবী ও সুখী হইতে পারে। আসিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশের সভ্যতায় দোষের ভাগ অধিক ছিল বলিয়া অকালে সে সকল সমাজ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ভারতীয় সভ্যতায় দোষের ভাগ অত্যল্প ছিল বলিয়া ক্রমাগত ৭।৮ শত বৎসর অপরাপর যুবা শত্রুদিগের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়াও ভারত-সমাজ জীবিত ও শক্তি-সম্পন্ন রহিয়াছে। এখনও ভারতের নব উন্নতির বিলক্ষণ আশা আছে। কেবল ভারতীয় সভ্যতার উৎকৃষ্টতাই এই প্রাচীন শরীরে উন্নতির আশার হেতু। এক্ষণে য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রবেশ করিয়া ভারতকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে, কিন্তু ধন্য ভারতীয় সভ্যতার মহিমা, যে, এখনও ইহা য়ুরোপীয় সভ্যতাকে পরাজয় করিবে বোধ হইতেছে। য়ুরো-পীয় সভ্যতা অপেক্ষা ভারতীয় সভ্যতা যে অনেক উৎকৃষ্ট তাহা আমরা পদে পদে সপ্রমাণ করিতে পারি, কিন্তু গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে এ গ্রন্থে সে চেষ্টা করা হইল না। কেবল মাত্র স্ত্রীপুরুষ ও জাতি-ভেদ সম্বন্ধীয় কয়েকটী কথার আলোচনা দ্বারা ভারতীয় সভ্যতার উৎকর্ষের উদাহরণ দেখাইয়া গ্রন্থের উপসংহার করিব। ভিন্ন গ্রন্থে সমস্ত বিস্তারিত রূপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীপুরুষ।—স্ত্রীস্বাধীনতা।

আজি কালি স্ত্রীজাতি লইয়া বড় গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। য়ুরোপীয় সভ্যতা স্ত্রীজাতিকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা করিতেছে। স্ত্রী-স্বাধীনতামতপক্ষপাতীদিগের মূল যুক্তি এই যে, ঈশ্বর স্ত্রী পুরুষ সকলকেই সমান করিয়াছেন, কাহাকেও কাহারও অধীন করেন নাই; সুতরাং কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই আপন আপন ইচ্ছা মত কার্য্য করা তাঁহার অভিপ্রেত সুতরাং উচিত। কিন্তু আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, পৃথিবীস্থ কোন পদার্থই পরস্পর সমান নয়। সর্ব্বাবয়বে সম্পূর্ণ সমান কোনও পদার্থই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং কি প্রকারে স্ত্রী পুরুষ পরস্পর সমান হইবে? যখন আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি স্ত্রী ও পুরুষ আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকারে ভিন্ন, তখন তাহাদিগকে কি প্রকারে সমান বলিব? পুরুষের বল অধিক, শরীর ও মন দৃঢ়, হৃদয় কঠিন ও সাহস অপর্য্যাপ্ত, কিন্তু স্ত্রী অবলা, কোমলাঙ্গী, লজ্জাশীলা ও সাহস-হীনা।

অনেকে বলেন প্রাকৃতিক শক্তি এই পার্থক্যের কারণ নহে, অভ্যাসই ইহার মূল কারণ। পুরুষেরা বাল্যাবধি যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, স্ত্রীদিগকে যদি সেইরূপ কার্য্য করিতে দেওয়া যাইত, তাহা হইলে, তাহারাও পুরুষের ন্যায় দৃঢ়কায়াদি গুণ-সম্পন্ন হইত। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি স্ত্রীজাতির পুরুষের ন্যায় হইবার শক্তি থাকিত, তবে কেন হয় নাই? পুরুষ তাহাকে কি প্রকারে উক্ত সকল শক্তিবর্জ্জিত করিয়া আপনার অধীনে

আনিল? যদি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সমান শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তবে স্ত্রী কেন পুরুষের অধীন হইল? পুরুষ কেন স্ত্রীর অধীন হইল না? এই প্রকাণ্ড পৃথিবী মধ্যে কোনও স্থানেই যে স্ত্রী পুরুষকে অধীনে আনিতে পারে নাই, অথবা পুরুষের সমান হইতে পারে নাই তাহার কারণ কি? যদি বাস্তবিক পুরুষের ন্যায় শক্তি স্ত্রীর থাকিত, তাহা হইলে অবশ্য কোন না কোন কালে এবং কোন না কোন দেশে স্ত্রী পুরুষকে অধীন করিতে পারিত। কিন্তু তাহা যখন পারে নাই, যখন সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে স্ত্রীজাতি পুরুষের অধীন, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, স্বভাবতঃ স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল। তাই অসমর্থ বলিয়া স্ত্রীদিগকে পুরুষের ন্যায় কার্য্য করিতে দেওয়া হয় নাই; পুরুষের ন্যায় কার্য্য করিতে না দিয়াই স্ত্রীদিগকে দুর্ব্বল করা হয় নাই। সেরূপ করিবার সামর্থ্যও অসম্ভব। ইতর জন্তুর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেও একথা সপ্রমাণ হয়। প্রায় সকল জাতীয় প্রাণীরই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতি দুর্ব্বল—ষণ্ড অপেক্ষা গাভী দুর্ব্বল, অশ্ব অপেক্ষা অশ্বিনী দুর্ব্বল, হস্তী অপেক্ষা হস্তিনী দুর্ব্বল। যে দন্ত হস্তীর প্রধান অস্ত্র, হস্তিনীর তাহা নাই। পুরুষত্ব হানি না করিলে অশ্বকে অশ্বিনীর ন্যায় শাসন করিতে পারা যায় না। একটি গোদা হনুমান বহু সংখ্যক স্ত্রী-হনুমানের উপর প্রভুত্ব করে। ইতর প্রাণীর মধ্যে ত আর সামাজিক শাসন বা পুরুষের কোন প্রকার অপ্রাকৃতিক অত্যাচার নাই। সকল দেশেই সমান রূপ অপ্রাকৃতিক অত্যাচার বা সমান রূপ ভ্রম হওয়া সঙ্গত নয়। অতএব স্ত্রীজাতি যে স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই?

স্ত্রী ও পুরুষের প্রাকৃতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এ বিষয় আরও বিশদ হইবে। স্ত্রীজাতির মাসিক ঋতু, গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, স্তন্যদান ও সন্তানপালন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই অত্যন্ত বলের হানিকর। তাহাদের লজ্জাশীলতা অর্থাৎ ঈপ্সিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠতা কার্য্যনাশের প্রধান হেতু। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে সন্তান জন্মিবার শক্তি জন্মে, এজন্য তাহাদিগকে অল্প বয়স হইতেই গর্ভধারণ ও সন্তানপালনাদি-জনিত কষ্টকর কার্য্যে ব্রতী এবং সর্ব্বতোভাবে সন্তানের সুখ-দুঃখের অধীন হইতে হয়; সুতরাং স্ত্রীজাতি জ্ঞানাদির অর্জ্জন করিবার জন্য অতি অল্পমাত্র সময় প্রাপ্ত হয়। পুরুষের এ সকল প্রতিবন্ধক কিছুই নাই। তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন, কোনও প্রাকৃতিক কার্য্য তাহাদের বল বা স্বাধীনতার বাধা দিতে পারে না। অধিক কি সভ্যতা প্রবিষ্ট না হইলে, সন্তানের ভরণপোষণের ভারও তাহাদের স্কন্ধে পতিত হইত না; সন্তান জন্ম দেওয়ার সুখ-ভাগেরই অংশমাত্র তাহারা গ্রহণ করিত, প্রতিপালনাদি কষ্টকর ভাগের কিঞ্চিন্মাত্র অংশও গ্রহণ করিত না। ইতর জন্তুই তাহার প্রমাণস্থল। এই সকল বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পুরুষ প্রাকৃতিক স্বাধীন ও স্ত্রী প্রাকৃতিক পরাধীন এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী কি বল কি জ্ঞান সকল বিষয়েই নিকৃষ্ট। নিকৃষ্ট হইলেই উৎকৃষ্টের অধীন হইতে হইবে; নচেৎ সবলে দুর্ব্বলে সমান বলিলে, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা বলা হয়।

অনেকে বলেন, যে, কতকগুলি শক্তি যেমন স্ত্রীজাতির পুরুষাপেক্ষা দুর্ব্বল, তেমনি কতকগুলি শক্তি স্ত্রী-জাতি অপেক্ষা

পুরুষের অল্প দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং পরস্পরে পরস্পরের অধীন বা উভয়েই পড়ে সমান। আমরা স্বীকার করি যে, কতকগুলি শক্তি স্ত্রীজাতির তেজস্বিনী বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, যে, যে সমস্ত শক্তি স্ত্রীজাতির তেজস্বিনী তৎসমস্তই দুর্ব্বলতা-ব্যঞ্জক ও অধীনতা-সহায়। স্ত্রীজাতির দয়া, স্নেহ, প্রণয়, লজ্জা ও ধৈর্য্য পুরুষাপেক্ষা অধিক, কিন্তু তৎসমস্তই দুর্ব্বলতাব্যঞ্জক ও অধীনতার কারণ। কেননা দয়া, স্নেহ ও প্রণয় দ্বারা যে কার্য্য হয়, তাহা আপনার ক্ষতি করিয়া হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দয়াদির অধীন হয়, সে আত্মবিস্মৃত হইয়া পরের সুখের প্রতি দৃষ্টি করিতে বাধ্য হয়, সুতরাং সে তাহার অধীন হয়; যে প্রণয়ী হয় সে প্রণয়পাত্রের অধীন হয়; যে লজ্জা করে সে ঈপ্সিত কার্য্য করিতে অপারগ বা কুণ্ঠিত হয়; যাহার ধৈর্য্য আছে সে পরকৃত অত্যাচার বা উপস্থিত কষ্ট সহ্য করে। এ সমস্তই আত্ম-কষ্ট-জনক ও পর-মুখাপেক্ষী, সুতরাং অধীনতাসহায়। এই সকল শক্তিবলে স্ত্রী আত্মবিস্মৃত হয়। যে আত্মবিস্মৃত অর্থাৎ আত্মহিতের দিকে যাহার দৃষ্টি অল্প, সে যে পরের অধীন হইবে তাহাতে আর কথা কি? যে জাতি পুত্রের ও স্বামীর মঙ্গলের জন্য আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে, যে জাতি নিন্দা ও লজ্জাভয়ে অতি সুখকর কার্য্য করিতেও বিমুখ হয়, যে জাতি অকাতরে সহস্র কষ্ট সহ্য করিতে পারিলে সুখী হয়, অধীনতাই তাহার সুখকর। এই জন্যই স্ত্রীজাতি সর্ব্বতোভাবে পুরুষের অধীন। নতুবা যদি অধীনতা স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক না হইত, তাহা হইলে কখনই তাহারা পুরুষের অধীন হইত না। বৃহৎকায় হস্তী, অশ্ব পোষ মানে, কিন্তু ব্যাঘ্র ত পোষ মানে না।

আর এক কথা এই যে, স্ত্রী যদি পুরুষের অধীন না হয়, তাহা হইলে সংসারিক কার্য্য এক কালে অচল হইয়া পড়ে। যদি স্ত্রী আপনার ইচ্ছামত কার্য্যই করিত, তাহা হইলে তাহাকে পুরুষের সমান কার্য্য করিতে হইত (বিবাহপ্রকরণ দেখ)। কিন্তু তাহা হইলে নিতান্ত অমঙ্গলকর ব্যাপার ঘটিত। কেননা, শারীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, গর্ভাবস্থায় স্ত্রীজাতির কোনও প্রকার শ্রমকর কার্য্য করা উচিত নয়। সে সময়ে তাহাদের সেরূপ করিবার সামর্থ্যও থাকে না। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীর অধীন অর্থাৎ তাহার মতানুযায়ী না হয়, তবে স্বামী কেন সে সময়ে তাহাকে সাহায্য করিবে? যখন উভয়েই সমান অর্থাৎ যখন স্ত্রী স্বাধীন বলিয়া আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া স্বামীর মতের বিরুদ্ধাচারী হয়,—স্বামীর মতানুযায়ী কার্য্য করে না, তখন স্বামী যেরূপ শ্রম করিবে স্ত্রীকেও সেইরূপ করিতে হইবে;—যে পুরুষ যান বহন করে তাহার স্ত্রীকেও যানবহন করিতে হইবে, যে পুরুষ কৃষিকার্য্য করে তাহার স্ত্রীকেও সেই কৃষিকার্য্য করিতে হইবে; কিন্তু গর্ভাদিকালে স্ত্রী যখন তাহা পারে না ও পারিলেও অমঙ্গলের কারণ হয়, তখন অবশ্যই তাহাকে পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। স্ত্রী ঐরূপ অধীনতা স্বীকার করিয়াছে বলিয়াই পুরুষ অধিক কষ্টকর কার্য্য সকলের ভার নিজে গ্রহণ ও অল্প কষ্টকর কার্য্য সকলের ভার স্ত্রীর প্রতি প্রদান করিয়া, সুব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। আরও দেখ, যে সময়ে পুরুষের সন্তান জন্মিবার শক্তি জন্মে, তদপেক্ষা অন্ততঃ ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রীজাতির সন্তান জন্মিবার শক্তি জন্মে। সুতরাং যে স্ত্রীপুরুষ মিলিত অর্থাৎ দম্পতী-সম্পর্ক বিশিষ্ট হয়,

তন্মধ্যে পুরুষেরই বয়োধিক হওয়া স্বাভাবিক ও উচিত। স্বভাবতঃ, কনিষ্ঠ অপেক্ষা বয়োধিকের জ্ঞান ও বল অধিক হইয়া থাকে। এই জন্য সর্ব্বত্রই কনিষ্ঠ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠের সম্মান অধিক। যখন কনিষ্ঠপুরুষ জ্যেষ্ঠের অধীন হয়, তখন কনিষ্ঠস্ত্রী জ্যেষ্ঠস্বামীর অধীন হইবে তাহাতে আর কথা কি? এই সকল কারণেই মনু লিখিয়াছেন—"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি"।

যাঁহারা স্ত্রীর অধীনতাকে বন্দীর অধীনতার সহিত তুলনা করেন, তাঁহাদের একথায় অনেক ভ্রম দৃষ্টি হইবে। কিন্তু বাস্তবিক স্ত্রীর অধীনতা সে প্রকার নহে। পুত্র যেরূপ পিতার অধীন, কনিষ্ঠ যেরূপ জ্যেষ্ঠ সহোদরের অধীন, স্ত্রীও সেইরূপ পুরুষের অধীন; অর্থাৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পুত্র অপেক্ষা পিতার জ্ঞান অধিক বলিয়া পুত্রকে যেরূপ পিতৃনির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হয়, স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের জ্ঞান ও বল অধিক বলিয়া স্ত্রীকেও সেইরূপ পুরুষের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। নচেৎ পুরুষ যে স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করিবে এমত নহে। পুত্র যেরূপ পিতার শাসনে সুখী ও নিরাপদ থাকে, স্ত্রীও সেইরূপ স্বামীর শাসনে সুখী ও নিরাপদ হয়; উহাতে পুরুষও স্ত্রীর অধীন হয়। পিতা যেমন পুত্র-স্নেহের অধীন হয়েন, স্বামীও সেইরূপ স্ত্রীর প্রণয়ের অধীন হইয়া পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়েন।

অন্তঃপুর।

একণে এই আপত্তি উত্থিত হইতে পারে, যে পুত্রের ন্যায় স্ত্রীকে স্বামীর অধীন হইতে হইলে স্ত্রীকে অন্তঃপুরবদ্ধ থাকিতে

হয় কেন? কেন স্ত্রীগণ পুরুষের ন্যায় ইচ্ছামত সকল স্থানে গমনাগমন ও অবস্থান করিতে পারে না? কেন স্ত্রীগণ পুরুষের ন্যায় পতিবিয়োগে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না, এবং পুরুষ যেমন ব্যভিচারী হইয়া সমাজে থাকিতে পারে কি জন্য স্ত্রীগণ সেরূপ পারে না? পুরুষ শত রমণী লইয়া নিয়ত আমোদ করিয়াও পদস্থ থাকেন, কিন্তু স্ত্রী ভ্রম ক্রমে অন্য পুরুষ সংসর্গ করিলেও এককালে পরিত্যক্ত হয়েন। এ সকল কি ঘোরতর বৈষম্য ও অত্যাচার নহে? এ সকল কি পুরুষের একান্ত যথেচ্ছাচার নহে? আমরা বলি, না। বিবাহ ও ব্যভিচার সম্বন্ধীয় কথার আলোচনা বিধবাবিবাহ প্রবন্ধে করা হইল। অন্তঃপুর সম্বন্ধীয় কথার আলোচনা এই স্থলে করা যাইতেছে।

এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটী বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। পরমেশ্বর ত মানবের সমস্ত অঙ্গই সমানরূপ প্রকাশ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন অঙ্গই ত আবৃত করিয়া দেন নাই। তবে কেন মানব সকল অঙ্গ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করে না? কি জন্য কতকগুলি অঙ্গ অশ্লীলপদবাচ্য হইয়াছে? অশ্লীল অঙ্গ সমস্ত এত দূষণীয় ও ঘৃণাকর যে, তৎসমস্ত সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করা দূরে থাকুক, যে ব্যক্তি সে সকলের নামমাত্র উচ্চারণ করে, তাহাকে লোকে নিতান্ত নীচ মনে করিয়া অশ্রদ্ধা করে। ইহার কারণ কি? যখন অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় সে সকল অঙ্গও ঈশ্বরের সৃষ্ট ও যখন তৎসমস্ত এত প্রয়োজনীয়, যে, সে সকলের চালনা না হইলে বিশ্ব এককালে জীবশূন্য হয়, তখন কেন সে সকল অঙ্গবোধক শব্দ উচ্চারণমাত্র পাপজনক? বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে,

যে কারণে অশ্লীল অঙ্গ আবরণ ও অশ্লীল বাক্য কথন নিষেধের নিয়ম হইয়াছে, সেই কারণেই অন্তঃপুরপ্রথার বিধান হইয়াছে।

মানবের সন্তান-জননেচ্ছা পশুদিগের ন্যায় নিয়মবদ্ধ নহে, অর্থাৎ পশ্বাদি যেরূপ নির্দ্দিষ্ট সন্তানজননোপযোগী কাল ব্যতিরেকে অন্য কোনও সময়ে স্ত্রী পুরুষে মিলিত হয় না, মনুষ্য সেরূপ নহে। মানবের স্ত্রীপুরুষ সম্মিলনেচ্ছা সকল সময়েই হইয়া থাকে। কিন্তু নিয়ত স্ত্রীপুরুষ সাম্মিলনে যে বহু রোগ জন্মে, প্রয়োজনীয় কার্য্য নষ্ট হয় ও অহরহ পরস্পর কলহ জন্মে, তাহা বোধ হয় প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা নাই। নিয়ত স্ত্রী পুরুষ সম্মিলনে রত হইলে মানবসমাজের যে কি ক্ষতি হয় তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। এই মহানিষ্ট দূর করিবার জন্যই মানব বস্ত্র পরিধান করিয়াছে, অশ্লীল বাক্য পরিত্যাগ করিয়াছে এবং স্ত্রী পুরুষ পরস্পর ভিন্ন স্থানে বাস করিবার নিয়ম করিয়াছে। কারণ সংসর্গ দোষে অনেক দোষ ঘটে। লোভনীয় পদার্থ নিয়ত সম্মুখে ও স্মরণপথে থাকিলে তল্লাভে নিয়ত চেষ্টা হয় ও তদ্‌গ্রহণপ্রবৃত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কোন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হইলে, যাহাতে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া যায় ও যাহাতে তাহা স্মরণাতীত হয়, তাহারই চেষ্টা করা উচিত। এই জন্য সুরাপান ও বেশ্যাশক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্য উক্তরূপ সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের নাম বিস্মৃত হইবার জন্য সাধু সমাজে প্রবিষ্ট বা নিয়ত কার্য্যলিপ্ত হইতে হয়। পুত্রশোকরূপ মহাদুঃখও মৃত পুত্রকে বিস্মৃত হইবার উপযোগী কার্য্যে নিযুক্ত হইলে নিবারিত হয়। অতএব নিয়ত স্ত্রীপুরুষ সম্মিলন পরিত্যাগ করিতে হইলে, সর্ব্বদা স্ত্রী সহবাস,

অশ্লীল অঙ্গ দর্শন ও অশ্লীল শব্দ শ্রবণ ত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা হইলেই রিপু-উত্তেজক-বিষয় সর্ব্বদা মানবকে উত্তেজিত করিতে পারে না।

মানব যখন উলঙ্গ ছিল তখন নিয়ত ব্যভিচাররত ছিল। বস্ত্রাবৃত হইয়া সে দোষের কিঞ্চিৎ লাঘব হইল বটে, কিন্তু তাহাতেও দোষের শান্তি হইল না দেখিয়া, অশ্লীল অঙ্গের নাম করিতে নিষেধ হইল, অর্থাৎ যাহাতে ঐ সকল স্মরণ না হয় তাহার চেষ্টা হইল। তাহাতেই অশ্লীল বাক্যকথন নিষেধ হইয়াছে। নতুবা অশ্লীল বাক্য কথনে বা উলঙ্গ অবস্থানে অন্য কোনও পাপ নাই। পরে স্ত্রীপুরুষ একস্থানে বাস ও একত্র বিচরণ করাতে রিপুর উত্তেজনা বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া "ঘৃতকুম্ভ সমা নারী তপ্তাঙ্গার সমঃ পুমান্" ইত্যাদি বলিয়া পণ্ডিতেরা স্ত্রীপুরুষের পৃথক্ অবস্থান স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। তাহাতেই পুরুষনিবাস বা বহির্বাটী ও স্ত্রী-নিবাস বা অন্তঃপুর হইল। যে কারণে অন্তঃপুর অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের পৃথক্ বাসস্থান আবশ্যক হইল, সেই কারণে গমনাগমনের জন্য স্ত্রীপুরুষের পৃথক্ বর্ত্ম ও কার্য্যের জন্য পৃথক্ স্থান আবশ্যক হইল। অহরহ সুন্দরী রমণী দর্শনে ঋষিরও মনশ্চাঞ্চল্য জন্মে দেখিয়া, স্ত্রীর স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষের নিকট যাওয়া উচিত নয় ব্যবস্থা হইল এবং ভ্রাত্রাদি যে সকল পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীজাতির অনেক সময়ে একত্র অবস্থান করিতে হয়, তাহাদিগের পরস্পর সম্মিলন নিতান্ত পাপজনক বলিয়া বিহিত হইল।

অন্তঃপুর না থাকিলে ও স্ত্রীদিগকে যথেচ্ছ ভ্রমণে বাধা না দিলে যে ব্যভিচার বৃদ্ধি হয়, তাহা য়ুরোপ ও ভারতে তুলনা

করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইংলণ্ডে যে এককালে অন্তঃপুরপ্রথা নাই এমত নহে—তথায় যে ইচ্ছা হইলেই স্ত্রীজাতিরা পুরুষের ন্যায় যথেচ্ছ ভ্রমণাদি করিতে পারে তাহা নহে। তথাপি অন্তঃপুর প্রথায় কিঞ্চিৎ শিথিলতা থাকাতেই তথায় কত ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। কিন্তু অন্তঃপুরপ্রথার দৃঢ়তা থাকাতে ভারত সতীর আকর স্থান হইয়াছে। এক্ষণে সেই ভারতে য়ুরোপীয় সভ্যতার আগমনে অগণিত ব্যভিচার ও ও বেশ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে।

অনেকে বলেন এরূপে গৃহে আবদ্ধ করিয়া সতীত্ব রক্ষা করিলে, সে সতীত্বের মাহাত্ম্য কি? যাহারা সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীন থাকিয়া সতী থাকিতে পারে, তাহাদের সতীত্বই প্রশংসনীয়। আমাদের কিন্তু বোধ হয়, ঈশ্বর আমাদিগকে এরূপ প্রশংসা লাভের অধিকারী করেন নাই। কেননা ক্ষুধা থাকিতে সম্মুখস্থ মিষ্টান্ন ভোজন করিবে না, চক্ষু থাকিতে সম্মুখস্থ সুন্দর বস্তু দর্শন করিবেনা, কর্ণ থাকিতে প্রাপ্ত সুমধুর গীত শ্রবণ করিবেনা, ইহা যেরূপ অসম্ভব, সর্ব্বেন্দ্রিয়মনোহারিণী রমণী দর্শনে পুরুষের মন চঞ্চল হইবে না একথা তাহা অপেক্ষাও অসম্ভব। চুম্বক সম্মুখস্থ লৌহকে আকর্ষণ করিবে না এ কথাও যদি বলিতে পারা যায়, তথাপি সর্ব্বজনমনোহারিণী রমণী দর্শনে পুরুষের মন চঞ্চল হইবে না, একথা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। কেননা ঈশ্বর যে শক্তি দিয়াছেন, সে শক্তির কার্য্য হইতেই হইবে? পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেই ঐ শক্তির অধীন হইয়া স্ত্রী-পুরুষে মিলিত হইবার যত্ন করে। ঈশ্বর তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন করিয়াছেন বলিয়া, তাহারা যথেচ্ছাচার করে না,

আমাদিগকে তদ্রূপ নিয়মাধীন না করায় যথেচ্ছাচারজনিত অনিষ্ট নিবারণ করিবার জন্য আমাদিগকে সভ্যতানুমোদিত নিয়ম করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। তাই বিবাহ, স্ত্রী পুরুষের পৃথক্ স্থানে অবস্থান পরস্ত্রীসহবাসনিষেধ প্রভৃতি নিয়মসকল কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত নিয়ম না হইলে, কখনই মানব ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারিত না। এত নিয়মের অধীন থাকিয়াও ব্যভিচার ও অধিক স্ত্রীসম্মিলন জনিত রোগ, শোক, অর্থনাশ ও বিবাদাদিরূপ বিষম দুঃখ হইতে মানব অব্যাহতি পায় নাই। যদি ঐ সকল নিয়ম না হইত তাহা হইলে কি মানবসমাজের দুর্গতির পরিসীমা থাকিত? কেবল মাত্র নৈতিক উপদেশ দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তির নাশ হইতে পারেনা। চক্ষুর নিকট সুন্দর পদার্থ রাখিয়া বলিবে উহা দেখিতে নাই বা এরূপ দ্রব্য লইবার ইচ্ছা করিতে নাই ও সেই উপদেশমাত্রেই চক্ষুর কার্য্য বন্ধ হইবে বিবেচনা করা নিতান্ত অসম্ভব। অতএব ব্যভিচার যদি দোষাবহ হয়, যথেচ্ছ স্ত্রী পুরুষের মিলন যদি অনিষ্টকর হয় ও সতীত্বের আদর যদি আবশ্যক হয়, তবে অন্তঃপুরপ্রথা অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের পৃথক্ স্থানে অবস্থান, পৃথক্ ভাবে ভ্রমণ ও পৃথক্ রূপে কার্য্য করার নিয়ম যে একান্ত আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নচেৎ যাঁহারা বিবেচনা করেন, লোভনীয় বস্তু নিয়ত সুপ্রাপ্য ও দৃষ্টিপথারূঢ় থাকিয়াও মানবগণ জিতেন্দ্রিয় হইবে, তাঁহারা পদার্থতত্ত্ব বুঝেন না—বিজ্ঞানে তাঁহাদের কিছু মাত্র অধিকার নাই।

আজি কালি বঙ্গবাসিগণ যে পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইতেছেন, নিয়ত স্ত্রী সন্নিধানে অবস্থান যে তাহার একটী

প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে বঙ্গে বেশ্যাসংখ্যা অধিক হইয়াছে এবং এক্ষণে যুবকগণ য়ুরোপীয় প্রথার অনুবর্ত্তন করিয়া দিনদুপরে সকল সময়েই স্ত্রীসন্নিধানে অবস্থান করেন। সর্ব্বদা স্ত্রীসন্নিধানে থাকিলে রিপুর অধিক পরিচালনা হয় ও তজ্জন্য শারীরিক দুর্ব্বলতা জন্মে, সন্তান দুর্ব্বল হয়, আকাঙ্ক্ষা পূরণজনিত তৃপ্তিলাভ হয় না ও পরস্পরের প্রতি প্রণয়ের অল্পতা হইতে থাকে। অতি উৎকৃষ্ট পদার্থও নিয়ত দর্শন, স্পর্শন ও আস্বাদনাদি করিলে তাহার সেরূপ স্বাদুতা থাকে না। দূরাগত বন্ধুকে দেখিলে যেরূপ উল্লাস জন্মে, নিয়ত বন্ধুদর্শনে সেরূপ আনন্দ হয় না, প্রত্যুত নানাবিধ কারণে নিকটস্থ বধূর প্রণয়ে সন্দেহ বা তাহাকে বধূর অনুপযুক্ত মনে হয়। এতদ্ভিন্ন, স্ত্রী পুরুষের পরস্পর নিয়ত দেখার সুবিধা হইলে সুযোগ পাইয়া পুরুষ প্রলোভন দ্বারা অন্যের স্ত্রীকে ভুলাইয়া কুপথে আনিতে ও নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে পারে।

এই সকল বিষয় এবং স্ত্রীজাতির লঘুচিত্ততা ও দৌর্ব্বল্যাদির বিষয় বিবেচনা করিলে, স্ত্রী পুরুষের পৃথক স্থানে বাস ও পৃথক ভ্রমণাদির ব্যবস্থা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। সেই জন্যই অন্তঃপুর ও বহির্বাটীর ব্যবস্থা হইয়াছে, স্ত্রীদিগকে আবদ্ধ করিয়া কষ্ট দিবার জন্য অন্তঃপুর ব্যবস্থা নহে। কেননা স্ত্রীগণ যেমন পুরুষসমাজে যাইতে পারেনা, পুরুষগণও সেইরূপ স্ত্রীসমাজে যাইতে পারেনা এবং পুরুষগণ যেমন পুরুষ সমাজে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে, স্ত্রীগণও সেইরূপ স্ত্রীসমাজে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে। অদ্ভুতস্বপ্ন নামক পুস্তকে এতৎ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা করা হইল, দেখিতে অনুরোধ করি।

বিবাহ।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতীয় বিবাহপ্রথাকেও উন্মূলিত করিবার যত্ন করিতেছে। তদনুসারে আজি কালি বিবাহ সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচারিত হইয়াছে। কেহ বলেন আদৌ বিবাহের আবশ্যকতা নাই, ইতর প্রাণীর ন্যায় যাহার সহিত যখন যাহার মিলনের ইচ্ছা হইবে, তখন সে তাহার সহিত মিলিত হইতে পারিবে; কেহ বলেন যে স্ত্রীর সহিত যে পুরুষের প্রণয় হইবে, সেই পুরুষ সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করিবে ও যতদিন তাহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ থাকিবে ততদিন তাহারা পরস্পর মিলিত থাকিবে, মনের মিলন ভঙ্গ হইলেই বিবাহ ভঙ্গ হইবে। এবং কেহ বলেন চিরজীবন বিবাহবন্ধন দৃঢ় থাকা আবশ্যক। কাহারও মতে স্ত্রী পুরুষ পরস্পর আপনাপন স্বামী বা স্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়া লইবে, ও কাহারও মতে পিতা মাতাই পাত্র ও পাত্রী স্থির করিয়া দিবেন। কেহ বলেন অধিক বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত, কেহ বলেন অল্পবয়সে বিবাহ হওয়া উচিত। কেহ বলেন স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী পুরুষ সকলেরই পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত, কাহারও মতে স্ত্রীর মৃত্যু হইলে পুরুষ পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীজাতির পুনর্ব্বার বিবাহ কোন মতেই উচিত নয়।

এই সকল বিবাহমতের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে অন্য একটী বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। অর্থাৎ এমত কার্য্য বা এমত নিয়মই জগতে নাই, যাহা করিলে বা যদনুসারে চলিলে সর্ব্বাঙ্গীন ভাল কি সর্ব্বাঙ্গীন মন্দ হয়। মনুষ্যকৃত সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলময় নিয়ম ত দূরের কথা ঈশ্বরকৃত এমন একটী নিয়ম

দেখিতে পাওয়া যায় না, তদনুসারে চলিলে সকলের সকলদিকেই ভাল হয়, কাহারও কোন দিকে মন্দ হয় না। যে আহার অস্মাদের শরীররক্ষার একমাত্র উপায়, তাহাই আবার শরীরনাশের কারণ; যে প্রণয় সংসারবন্ধনের মূল, তাহাই বৈরাগ্যের হেতু; যে জল, বায়ু ও অগ্ন্যাদি ব্যতিরেকে কোনও কার্য্যই নির্ব্বাহ হয় না, তৎসমস্তই আবার সকল সর্ব্বনাশের মূল। অতএব ভাল বলিলে এমত বুঝিতে হইবেনা যে, তাহার কোনও স্থানে মন্দ নাই। যাহাতে মন্দ অপেক্ষা উত্তমের ভাগ অধিক তাহাকেই ভাল বলিতে হয়। নচেৎ সর্ব্বাঙ্গীন ভাল কি সর্ব্বাঙ্গীন মন্দ পদার্থ কি কার্য্য পৃথিবীতে নিতান্ত দুর্লভ। কোন নিয়মকে উৎকৃষ্ট বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ঐ নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে যে পরিমাণ মন্দ হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ভাল হয়। কোন অনিষ্ট হইতেছে দেখিলে মনুষ্য নানা উপায়ে সেই অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা পায়। সমুদয় অনিষ্ট নিবারণ না হউক চেষ্টা করিলে যথাসম্ভব অধিকতর অনিষ্ট নিবারিত হইয়া থাকে। যে নিয়মানুসারে চলিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপকার বিদূরিত হয়, তাহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিয়ম বলে। অতএব কোন্ নিয়মটী ভাল ও কোন্ নিয়মটী মন্দ বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, কোন্ নিয়ম অবলম্বন করিলে অল্প অনিষ্ট ঘটে ও কোন্ নিয়ম অবলম্বনে অধিক অনিষ্ট ঘটে; যদবলম্বনে অল্প অনিষ্ট ঘটে তাহাকেই উৎকৃষ্ট নিয়ম বলিতে হইবে। বিবাহ সম্বন্ধীয় কোন নিয়ম ভাল তাহা স্থির করিতে হইলে যেন ঐরূপে বিচার করা হয়।

বিবাহপদ্ধতি যে পশুব্যবহার অপেক্ষা হিতকর তাহা সপ্রমাণ

করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। কেননা যাঁহারা বলেন বিবাহপ্রথা ভাল নয়, তাঁহাদের মূল যুক্তি এই যে, বিবাহ একটী বন্ধন বিশেষ; কেন স্বাধীন মানব স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ বন্ধন-রজ্জু গলে দিয়া কষ্ট পাইবে? পশুরা যেরূপ ইচ্ছামত স্ত্রী পুরুষে মিলিত হয়, অথচ পরস্পর আবদ্ধ হয় না, মনুষ্যেরাও যদি সেইরূপে ইচ্ছাপরতন্ত্র হইয়া মিলিত হয়, তাহা হইলে অভিপ্রেত কার্য্য সম্পন্ন হয় অথচ বন্ধনজন্য কষ্ট পাইতে হয় না। তাঁহাদের এই যুক্তি যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক তাহা একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কেননা যদি বিবাহ প্রথা প্রচলিত না হইয়া পশ্বাদির ন্যায় স্ত্রীপুরুষ সম্মিলনের নিয়ম থাকিত, তাহা হইলে কোনও মনুষ্যই পিতৃ অবগত হইতে পারিত না ও কোনও পুরুষই পুত্রমুখাবলোকনসুখ অনুভব করিতে পারিত না; সকলেই কেবল মাতৃমাত্র অবগত হইত এবং কেবল মাতাই মানবের সর্ব্বস্ব হইত; তাহা হইলে স্ত্রীজাতিই কেবল সন্তানপালনে বাধ্য হইত, সন্তানেরা পিতার কিছুমাত্র সাহায্য পাইত না। তাহা হইলে পুরুষ জাতির কেবল নিজের ভরণ পোষণমাত্র কার্য্য হইত, সমস্ত কার্য্যই এক স্ত্রীজাতির উপরে নিপতিত থাকিত। সুতরাং পুরুষজাতি পশু অপেক্ষা কোনও অংশে উৎকৃষ্ট হইতে পারিত না।

বিবাহপ্রথা না হইলে সংসার হইত না, সুতরাং মানবত্ব, সভ্যতা ও উন্নতির মূলীভূত সমাজ সংগঠিত হইতে পারিত না। কেননা তাহা হইলে পুরুষেরা পশ্বাদির ন্যায় নিজের আহারমাত্র চেষ্টা করিত ও ইচ্ছামত স্বাভাবিক নিয়মানুসারে যে কোন স্ত্রীতে রিপু চরিতার্থ করিয়া অবশিষ্ট কাল নিদ্রা ও

বিশ্রামে কাটাইয়া দিত; সুতরাং সংসার স্থাপনের আবশ্যকই হইত না। কেবল ইহাই নহে, বিবাহপ্রথা না থাকিলে মানবের অদৃষ্টে কোন রূপ সুখই ঘটিত না—মানব দুঃখের সময় স্ত্রীপুত্রাদির সহায়তা পাইত না এবং প্রণয়জন্য যে মনোসুখ তাহার কিছুমাত্র আস্বাদ পাইত না; বিবাহ না থাকিলে পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি কাহাকেও অবগত হইতে পারা যাইত না। সুতরাং মাতৃ ব্যতিরেকে মানবের ভালবাসার পাত্র পৃথিবীতে আর কেহই থাকিত না। মাতাও পুত্রকে চিরকাল আপনার নিকট রাখিতে পারিতেন না। কেননা নারী একাকিনী আপনার ও সন্তানগণের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবে কেন? একটু বয়স হইলেই সন্তানদিগকে আপনাপন জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইত। কাযেই মাতার পুত্রস্নেহ ও পুত্রের মাতৃ-ভক্তি বিদূরিত হইত—পশুদিগের ন্যায় মাতা ও সন্তান চির-বিচ্ছিন্ন থাকিত। অধিকন্তু অল্পবয়সেই প্রত্যেককে জীবনো-পায়ের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হওয়ায় কেহই জ্ঞানোন্নতি করিবার চেষ্টা করিতে পারিত না। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্যই বিবাহপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। যখন কোন পুরুষ কোন স্ত্রীগ্রহণে লোলুপ হইল, তখন ঐ স্ত্রী বলিল তুমি যদি সন্তান-পালনের ভারগ্রহণ কর, যদি তুমি আমাকে বিপন্নাবস্থায় ফেলিয়া না যাও, তবে আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি; স্বাভাবিক শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া পুরুষকে স্ত্রীর ঐ সকল প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল; স্ত্রীকেও ঐ উপকার প্রাপ্তির আশায় স্বামীর আজ্ঞা পালনে সম্মত হইতে হইল; তাহা হইতেই বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং পুরুষেরা পুত্রস্নেহ, ভ্রাতৃপ্রীতি, পিতৃ-

ভক্তি ও রমণী-প্রেমের মর্ম্ম অবগত হইয়া, বিবাহবন্ধন দৃঢ় করিয়াছেন। নচেৎ বিবাহ না করিলে যদি মানবের অসুবিধা না হইত, তাহা হইলে কেহই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই বন্ধনরজ্জু গলে পরিত না ও কথনই পৃথিবীর সকল দেশে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইত না। মানব সভ্য হইয়া পশুরীতি পরিত্যাগ করিয়া সভ্য বিবাহপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। বিবাহ প্রথাই মানবের এতাদৃশী উন্নতির মূল কারণ। অতএব যাঁহারা বলেন বিবাহপদ্ধতি ভাল নহে, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত।

প্রণয়ান্ত বিবাহ বিবাহনামেই পরিগণিত হইতে পারে না। কেননা যতদিন মনোমিলন থাকে ততদিন বিবাহবন্ধন থাকিবে, তাহার অভাব হইলে বিবাহ ভঙ্গ হইবে ও অপরকে বিবাহ করিবে যদি এই নিয়মে বিবাহ হয়, তাহা হইলে প্রায় পশু প্রথাই রহিয়া যায় অর্থাৎ বিবাহ না হওয়ার তুল্য ফলই হয়। কেননা জগতে যত স্ত্রী পুরুষের মনোমিলন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকংশই অবস্থা সাপেক্ষ। যেমন কোনও ব্যক্তি দরিদ্রাবস্থায় থাকিয়া মাসিক দশ টাকা পাইয়া সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু ঐ ব্যক্তির অবস্থা যখন উন্নত হয় তখন তাহার শত মুদ্রায়ও সংকুলন হয় না এবং যদি সে কখনও রাজা হইতে পারে তাহা হইলে তখন তাহার লক্ষ মুদ্রাতেও তৃপ্তি হয় না, সেইরূপ মানবের যখন স্ত্রী মাত্রই পাওয়া দুর্ঘট, তখন একটী সামান্যা স্ত্রী পাইলেই সে তুষ্ট হয়। কিন্তু যখন সে দেখে যে, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্ত্রী পাইতে পারে, তখন আর পূর্ব্বপরিণীতার উপর তাহার অনুরাগ থাকে না, উৎকৃষ্টতর স্ত্রী গ্রহণে তাহার লালসা হয়। আবার এমনও অনেক সময়ে

ঘটে যে, প্রথমে যে স্ত্রীকে উৎকৃষ্ট ভাবিয়া কেহ বিবাহ করিয়াছে পরে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট দেখিতে পাইয়া, পূর্ব্বার প্রতি অশ্রদ্ধা এবং নবীনার প্রতি লালসা হয়। তদ্ভিন্ন অনেক মানব বয়স্থা অপেক্ষা নবীনা রমণীকে অধিক ভাল বাসে। এইরূপ অনেক কারণে পূর্ব্ব পরিণীতা স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা ও নূতন স্ত্রী বা পুরুষের প্রতি অনুরাগ জন্মে। সুতরাং মনোমিলনান্তবিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, বিবাহ প্রায়ই স্থায়ী হয় না, নিয়তই বিবাহ ভঙ্গ হইতে থাকে। সুতরাং তাহাতে বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয় না, স্ত্রী ও স্বামীর প্রতি সহানুভূতি থাকেনা এবং পিতা, ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতির প্রতি তাদৃশ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও স্নেহ থাকে না। কেননা এরূপ হইলে, মাতার অনেক স্বামী, পিতার অনেক স্ত্রী এবং মাতৃ ও পিতৃ সম্বন্ধে বহুতর ভ্রাতা ভগিনী হইবার সম্ভব। বিশেষতঃ এরূপ হইলে সন্তানদিগকে পিতা বা মাতা পরিত্যাগ করিতে হয় এবং পুরুষ কিম্বা স্ত্রীকে সন্তান পরিত্যাগ করিতে হয়। কেননা অধিক স্থলে বিবাহের অল্প দিবস পরেই সন্তান হইয়া থাকে; সুতরাং যত বিবাহ ভঙ্গ হয়, তাহার অধিকাংশই সন্তান জন্মের পরে হওয়া সম্ভব। সে সময় পিতা মাতা বিচ্ছিন্ন হইলে একতরকে সন্তান পরিত্যাগ করিতে হয় এবং সন্তানেরও একতর বিচ্ছেদ ঘটে। এতদ্ভিন্ন নিয়ত স্ত্রী পরিবর্ত্তন হইলে কোনও গৃহেরই সুশৃঙ্খলা থাকেনা। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা লইয়াই মানবের সংসার এবং ঐরূপ সংসার সমষ্টিই সমাজ। যে গৃহে স্বামী, স্ত্রী, ভ্রাতা, ভগ্নী ও পিতা মাতার দৃঢ় সম্বন্ধ নাই, সে গৃহ গৃহই নহে ও তদ্রূপ গৃহ-সমষ্টি সমাজই নহে।

এই সকল কারণে বিবাহবন্ধন দৃঢ় করা অতীব আবশ্যক। তাই হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বিবাহবন্ধন আজীবন রক্ষণীয় করিয়াছেন, সেই দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে বলিয়া হিন্দুর যেরূপ পিতৃমাতৃভক্তি, অপত্যস্নেহ, দাম্পত্যপ্রেম, ভ্রাতৃবৎসলতা, আত্মীয়স্বজনপ্রীতি, অন্য কোন জাতিরই সেরূপ নহে। কোন জাতিই হিন্দুর ন্যায় দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ সম্পন্ন ও ধর্ম্মভূষণে ভূষিত নয়। বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইয়াই মানব স্বার্থত্যাগ করিতে ও পরার্থপরায়ণ হইতে শিক্ষা করে। পশ্চাত্যগণের ঐ বন্ধনের শিথিলতা থাকাতে তাহাদের সকল কার্য্যই স্বার্থপরতামূলক।

ব্রাহ্ম বিবাহ।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, গান্ধর্ব্ব বিবাহ ভাল কি ব্রাহ্ম বিবাহ ভাল অর্থাৎ দয়িত নির্ব্বাচনের ভার যুবক যুবতীর উপর থাকিলে ভাল হয়, কি পিতা মাতার হস্তে থাকিলে ভাল হয়। যাঁহারা প্রথমোক্তের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন, যে, আজীবন সম্বন্ধ বিশিষ্ট বিবাহই যখন আমাদের হিতকর ও যখন স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে মনোমিলন না থাকিলে চিরজীবন কষ্ট পাইতে হয়, তখন স্ত্রী বা স্বামী গ্রহণকালে পরস্পরের মনোজ্ঞ দেখিয়া গ্রহণ করাই উচিত এবং যাহারা ঐ সুখ দুঃখের ভাগী, তাহাদেরই হস্তে সে নির্ব্বাচনভার থাকা উচিত; অন্যে কখনও অন্যের মনোজ্ঞ বিষয় স্থির করিতে পারে না। আমাদের মত কিন্তু উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা উৎকৃষ্ট পাত্র নির্ব্বাচন করিবার শক্তি অল্পবয়স্ক অনভিজ্ঞ যুবকযুবতীর অপেক্ষা অধিক বয়স্ক জ্ঞানী পিত্রাদিরই অধিক থাকা

সম্ভব। যে বয়সে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ হয় বা হওয়া উচিত, সে বয়সে মানব পৃথিবীর কোন বিষয়ই জ্ঞাত হইতে পারে না। কি প্রকারে এমত অজ্ঞানাবস্থায় জটিল মানবচরিত্র বুঝিবার শক্তি জন্মিবে? এমন অনেক লোক আছে যে, তাহাদের বাহ্যিক ব্যবহার অতি মধুর বোধ হয় কিন্তু তাহাদের হৃদয় ভয়ানক হলাহলপূর্ণ এবং অনেকের হৃদয় অমৃতময় কিন্তু তাহাদের বাহ্যিক দৃশ্য অতি কর্কশ। আবার অনেক মনুষ্য স্বীয় অভিপ্রেত সাধন-মানসে আত্ম কুটিল প্রকৃতি গোপন করিয়া এরূপ সাধুশীলতা প্রদর্শন করে, যে তাহা দেখিয়া অতি জ্ঞানী ব্যক্তিও প্রতারিত হয়েন। অনেক সময়ে অভিজ্ঞ প্রাচীন দিগেরও ঐ দুশ্চরিত্র-দিগকে সাধু বলিয়া ভ্রম জন্মে। অতএব বাহ্যদর্শনকুশল সরল-প্রকৃতি অল্পবয়স্ক যুবকযুবতীর ঐ সকল বুঝিবার শক্তি কোথায়? তাহারা ত নিতান্ত সরলপ্রকৃতি, কুটিলতা কাহাকে বলে তাহা এখনও তাহারা শিখে নাই। এ সংসার এরূপ কুটি-লতাপূর্ণ যে, অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিও বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত নিয়ত একত্র থাকিয়াও নিতান্ত আত্মীয় ও নিকটস্থ প্রতিবেশির প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না, প্রাচীন কালেও তাঁহারা অনেক সময়ে নিতান্ত আত্মীয় কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হয়েন। এরূপ অবস্থায় যুবক যুবতীরা যে পদে পদে বঞ্চিত হইবেন, তাহাতে আর কথা কি?

বিশেষতঃ রূপই যুবক যুবতীর মনোজ্ঞতার প্রধান উপকরণ। রূপলালসার অধীন হইয়া মানবগণ প্রায়ই কঠিনত্বগাবৃত নারি-কেল ত্যাগ করিয়া সুন্দর-দর্শন বিষফল গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। পণ্ডিতগণ ভূয়োদর্শন বলেই বলিয়াছেন—

"কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং।
বন্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্ন মিতরেজনাঃ॥

কিন্তু রূপে মুগ্ধ হইলে গুণ দেখিবার শক্তি কোথায় থাকে? পাত্র ও পাত্রীর কেবল দৈহিক রূপ ও মানসিক গুণ দেখিলেই চলে না। তাহাদের সম্বন্ধে অনেক বিষয় দেখা আবশ্যক; অর্থাৎ পাত্র ও পাত্রী পরস্পর অনুরূপ বয়স্থ কি না, সমুচিত বিদ্যাসম্পন্ন কি না, সুস্থ ও সবলশরীর কি না, তাহাদের ধনসঞ্চয় বা ধনোপার্জ্জনশক্তি কিরূপ, কিরূপকুলে তাহাদের জন্ম, তাহাদের পিতামাতা সচ্চরিত্র কি না কুল-সংক্রামক কোন রোগ আছে কি না, তাহাদের পরস্পরের ব্যবসা ও অবস্থাগত চরিত্রে মিলন হইতে পারে কি না, জন্ম-শোণিতবিষয়ে পরস্পরের নৈকট্য কিরূপ ও তাহাতে জনিষ্যমাণ-সন্তান দোষযুক্ত হইবে না ইত্যাদি অনেক বিষয় দেখা আবশ্যক। বিংশবর্ষীয় যুবা ও ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীর কি এই সকল অনুসন্ধান করিবার শক্তি আছে? না রূপে মুগ্ধ হইলে ঐ সকল অনুসন্ধান করিতে যুবক যুবতীর প্রবৃত্তি হয়? প্রত্যুত, প্রণয় জন্মিলে নির্গুণ প্রণয়পাত্রকেও সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট বোধ হওয়াই সঙ্গত, অথবা প্রণয় পাত্রকে মনোমত গুণসম্পন্ন বোধ হওয়াতেই তাহার সহিত প্রণয় জন্মে। সুতরাং গুণ দেখার অবসর থাকে না। প্রণয়াকর্ষণে আকৃষ্ট হইলে, মানব দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হয়। এইজন্য "যার সঙ্গে যার মজে মন কিবা হাড়ী কিবা ডোম" প্রবাদ প্রচলিত। বাস্তবিক প্রণয়াকর্ষণ জন্মিলে কিছুতেই চিত্তকে নিবৃত্ত করা যায় না; তখন নিজে প্রণয়পাত্রের দোষ অনুসন্ধান

করা দূরে থাকুক, অন্যে দেখাইয়া দিলেও দেখিতে চায় না। কিন্তু কেবলমাত্র আন্তিকাকর্ষণজ গুণনিরপেক্ষ প্রণয় মানবের অধিক দিন স্থায়ী হয় না। নবযৌবনের প্রারম্ভে বা প্রণয় জন্মিবার আরম্ভ কালে, যতদিন মত্ত থাকে, ততদিন প্রণয় থাকিতে পারে বটে, কিন্তু যখন দোষাবলী বুঝিবার অবসর হয়—যখন অযথা মিলনের অপকারিতা বুঝিতে পারে, তখন কষ্টের সীমা থাকে না।

দয়িত নির্ব্বাচনের ভার যুবক যুবতীর প্রতি থাকিলে আরও অনেক দোষ ঘটে। যে যুবক যে যুবতীর প্রতি অনুরাগী হয়, সে যুবতী যে সেই যুবকের প্রতি অনুরাগিণী হইবে তাহার নিশ্চয়তা কি? অনেক সময়ে দেখা যায় যে যুবা যে যুবতীকে ভালবাসিয়াছে, সে যুবতী সে যুবককে ঘৃণা করে, এবং যে যুবতী যে যুবকের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছে সে যুবক তাহাকে ইচ্ছা করে না। এরূপ স্থলে কি প্রকারে উভয়েরই মনোমত দয়িত লাভ হইবে? অধিকন্তু এরূপ অবস্থায় চির-কালের জন্য তাহাদের মনের শান্তি নষ্ট হইয়া যায়। আবার অনেক যুবক যুবতী আপনার অবস্থা বিবেচনা না করিয়া দুর্লভ পাত্রে প্রণয় স্থাপন করে। কিন্তু এরূপ প্রণয়প্রবৃত্তি প্রায়ই চরিতার্থ হয় না, হইলেও সমূহ অনিষ্টের কারণ হয়। দরিদ্র সন্তান ধনিকন্যা, মূর্খপুত্র বিদ্যাবতীকন্যা, কৃষকপুত্র বণিগ্বালা ও বঙ্গ যুবা ইংরাজ যুবতীর প্রতি আসক্ত হইলে পরস্পরের মিলন হওয়া দুর্ঘট হয়, হইলেও শুভ ফলপ্রদ হয় না। অতএব যুবক যুবতীর প্রতি দয়িত নির্ব্বাচনের ভার দিলে কোনও অংশে শুভফল হয় না। যুবক যুবতীর হিতৈষী

ও বহুজ্ঞ পিতার প্রতি নির্ব্বাচনের ভার থাকিলে সকল দিকেই মঙ্গল হইবার সম্ভব। তাহা হইলে তিনি অভিজ্ঞতাবলে উপযুক্ত পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদিগের সুখসম্পাদন করিতে পারেন ও যুবক যুবতীকে নৈরাশ্যজনিত কোন প্রকার মনস্তাপ পাইতে হয় না। বাস্তবিক যুবক যুবতীর অপেক্ষা পিত্রাদির নির্ব্বাচন যে অধিক হিতকর, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে। ইংলণ্ডে বিবাহ-ভঙ্গের বাহুল্য ও ভারতীয় নরনারীর দাম্পত্যানুরাগ ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ভারতীয় নির্ব্বাচন-প্রণালীর তাদৃশ উৎকৃষ্ট ফল এক্ষণে দেখাইবার উপায় নাই। কারণ সমাজমধ্যে কতকগুলি দোষ প্রবিষ্ট হওয়াতে অনেক পিতামাতাই উপযুক্ত পাত্রপাত্রীনির্ব্বাচনে অশক্ত হয়েন। যদি ঐ সকল দোষ সংশোধিত হয়—যদি ভাক্তকৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, কন্যা বিক্রয়, অযথা পণগ্রহণ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র-বিরোধী কদর্য্য ব্যবহারগুলির সংশোধন হয়, তাহা হইলে পিত্রাদির কৃত পাত্রপাত্রীনির্ব্বাচন সর্ব্বদোষশূন্য হইতে পারে। তাহা হইলে ভারত দম্পতি-প্রণয়ের চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্থান হয়।

আর এক কথা। কেবল পতিপত্নীর পরস্পরে মনোম্মিলন হইলেই সংসার সুখের হয় না। পিতামাতারও বধূটী মনোনীত হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে যুবকগণ পিতৃপরায়ণ হইতে পারে না। অনেকে স্ত্রীর দোষে পিতামাতা ও ভ্রাতাভগিনীগণকে অশ্রদ্ধা করে, এমন কি তাহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াও যায়। এই জন্য ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার দেখিতে পাওয়া যায় না। তত্তৎদেশে কত কত বৃদ্ধ বিলক্ষণ সঙ্গতিসম্পন্ন বহুপুত্রসত্ত্বেও আহারাদির ক্লেশে ম্রিয়মাণ

হয়েন। বিবাহ কি কেবল আত্মসুখের জন্য? অবশ্য কখনই না। অনায়াসে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবারই জন্যই বিবাহ আবশ্যক। বিবাহ করিয়া সুনিয়মে সুসন্তান জন্মদান করিবে, তাহাদের যথোচিত প্রতিপালন ও শিক্ষাদানাদি করিবে, পিতামাতার সেবা করিবে, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, সজাতি, স্বদেশী, অতিথি ও বিপন্নগণের যথাসম্ভব সহায়তা করিবে, এবং এক হৃদয়ে পরমেশ্বরের আরাধনা করিবে। এইসমস্তই বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য; ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করা বিবাহের উদ্দেশ্য নহে—কর্ত্তব্য বা ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদন করাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিবাহ না করিলে মানব একাকী সকল প্রকার ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে না, স্ত্রীর সহযোগে ঐ সকল সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয় বলিয়াই স্ত্রীর নাম সহধর্ম্মিণী। ইন্দ্রিয়াদির অধীন হইয়া নির্বাচন করিয়া বিবাহ করিলে সে দম্পতীর ধর্ম্মাচরণের প্রতি মন থাকে না, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ ও পরস্পরের প্রতি প্রণয় প্রকাশ করাই তাহাদের মুখ্যকার্য্য হয়। পিতামাতা সকল দিক্ দেখিয়া যে পাত্র পাত্রী স্থির করেন, তাহারা মিলিত হইয়া সকল প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে সক্ষম হয় ও আপনার সুখ অপেক্ষা আত্মীয় ও দেশের হিতের দিকে তাহাদের দৃষ্টি অধিক থাকে।

যুবকযুবতীর মতানুসারে বিবাহ হওয়ার পদ্ধতি যে ভাল নয়, তাহা আরও একটী বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝা যায়। ভারতে উক্ত পদ্ধতি নিতান্ত অজ্ঞাত ছিল না, পূর্ব্ব কালে গান্ধর্ব্ব বিবাহ ও স্বয়ম্বর প্রথা ভারতে বিশেষরূপ প্রচলিত ছিল। ঋষিগণ উহার অপকারিতা বুঝিতে পারিয়াই উক্ত প্রথা রহিত

করিয়াছেন। অনিষ্টকর না হইলে কখনই উহা রহিত হইত না। গান্ধর্ব্ব বিবাহ ও স্বয়ম্বরপ্রথা স্বাভাবিক, সুতরাং উহা অসভ্যতা, ব্রাহ্ম বিবাহ কৃত্রিম ও উপকারক সুতরাং উহা সভ্যতা। সভ্যতা যদি অসভ্যতা অপেক্ষা ভাল হয়, তবে ব্রাহ্ম-বিবাহ যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই জন্যই পৃথিবীর কোনও সভ্যদেশে কেবলমাত্র যুবক-যুবতীর মতানুসারে বিবাহ দেওয়া হয় না। যাঁহারা মনে করেন য়ুরোপে যুবকযুবতীর মতানুসারেই বিবাহ হইয়া থাকে, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। বাস্তবিক ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের উচ্চঘরে পিতামাতার অনভিমতে কোন বিবাহ হয় না। তথায় যুবক যুবতীদিগের মত লওয়া হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহারা যে পাত্র বা পাত্রী নির্ব্বাচন করে, তাহা যদি পিতার অনভিমত হয়, তাহা হইলে সে বিবাহ হইতে পারে না। সুতরাং তাহাকে প্রকৃত গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলা যায় না। অধিকন্তু তাহাতে, অনেক অঘটন ঘটিয়া থাকে। অনেকে প্রণয়াকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন করিতে না পারিয়া আত্মবিনাশ সাধন করে ও অনেকে চিরকালের জন্য প্রণয়নৈরাশ্যজনিত দুঃখে ভাসিতে থাকে। অতএব উক্তরূপ মত গ্রহণ করা অপেক্ষা আদৌ তাহাদের মতের অপেক্ষা না করাই ভাল। তবে যে সকল পাত্র বা পাত্রী পিতামাতার অভিমত, সে সকলের মধ্য হইতে মনোজ্ঞ নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা পুত্রকন্যাকে দেওয়ায় উপকার আছে। কেননা তাহাতে নৈরাশ্য বা মন্দ নির্ব্বাচনের আশঙ্কা নাই, প্রত্যুত পিতা ও নিজে উভয়ের নির্ব্বাচন করায় তাহা আরও দোষ-শূন্য হয়।

বাল্য বিবাহ।

এক্ষণে কিরূপ বয়সে বিবাহ দেওয়া উচিত দেখা আবশ্যক। য়ুরোপীয় সভ্যতানুরাগী ব্যক্তিগণ বাল্যবিবাহের নিতান্ত বিরোধী। কিন্তু যখন সপ্রমাণ হইল, গান্ধর্ব্ববিবাহ সমূহ অনিষ্টকর। তখন বিবাহ করিবার ইচ্ছা জন্মিবার পূর্ব্বেই বিবাহ হওয়া উচিত। কেননা অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না হইলে কাহারও না কাহারও প্রতি অনুরাগ জন্মিতে পারে। সে অনুরাগ অপাত্রে স্থাপিত হইলে পিতামাতা তাহাদের বিবাহে বাধা দেন, সুতরাং যুবকযুবতী অতিশয় কষ্ট পায়। অল্পবয়সে বিবাহ হইলে এ দোষ ঘটিতে পারে না। বিশেষতঃ বাল্যবিবাহে বিবাহ-বন্ধন যেরূপ দৃঢ় হয়, যৌবনবিবাহে সেরূপ হয় না। কেননা বাল্যকালে যেরূপ অকৃত্রিম প্রণয় জন্মে অর্থাৎ বাল্যকালজাত প্রণয় যেরূপ দৃঢ় ও স্থায়ী হয়, অন্য কোনও সময়ে সেরূপ হয় না। তাইবালসখা হৃদয়ের অতি যত্নের ধন। যাহাদিগের সহিত একত্র বাল্য-ক্রীড়া ও বিদ্যাভ্যাস করা যায়, তাহারা অকৃত্রিম প্রণয়পাত্র, কোন কালেই তাহাদের প্রণয় বিস্মৃত হইতে পারা যায় না। যে কালে হৃদয় কোমল ও নির্ম্মল থাকে, যখন স্বার্থপরতা বা ইন্দ্রিয়বিকার মনকে কলুষিত করে না, যখন সাংসারিক জটিল ভাবে হৃদয় বক্রীভূত হয় নাই, যে সময়ে সন্দেহ ও অবিশ্বাস হৃদয়ে স্থান পায় নাই, সেই পবিত্র বাল্যকালে যে সহচরের সহিত নিতান্ত অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধ প্রণয় জন্মিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বাল্যকালের হৃদয়স্থ প্রণয়াঙ্কন প্রস্তরে লৌহাঙ্কনের ন্যায় চিরস্থায়ী হয়। বয়স যত অধিক হইতে থাকে, ততই স্বার্থপরতা, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ইন্দ্রিয়বিকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে

থাকে ও ততই সাংসারিক চাতুরী শিক্ষা করিয়া মানব কুটিল-হৃদয় হয়। সুতরাং বয়োধিকের প্রণয় প্রায়ই নিমিত্ত-সম্ভূত হইয়া থাকে। তখন কেহ রূপ ও কেহ গুণে মুগ্ধ হইয়া, কেহ অর্থলুব্ধ হইয়া ও কেহ কোন স্বার্থসাধনমানসে প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকে। বালক বালিকার ন্যায় নিঃস্বার্থ ও অনৈমিত্তিক প্রণয় সে সময়ে হইবার যোই নাই। স্বার্থের ব্যাঘাত হইলে বা নিমিত্তের অভাব হইলে তজ্জাত প্রণয়ও দূরীভূত হয়। কিন্তু বাল্যকালের প্রণয় কোনও স্বার্থ বা নিমিত্তমূলক নহে, কোনও স্বার্থ বা নিমিত্তও সে প্রণয়কে নষ্ট করিতে পারে না। বাল্যমিলন-জাত প্রণয় পুত্রস্নেহাদি নিসর্গোৎপন্ন প্রণয়ের ন্যায় হইয়া হৃদয়ের সহিত দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়া যায়, প্রাণ থাকিতে তাহা নষ্ট হয় না। ইংলণ্ড ও ভারত এ বিষয়েব প্রমাণ স্থল; অধিক বয়সে বিবাহ হয় বলিয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে সহস্র সহস্র বিবাহভঙ্গ হইতেছে, কিন্তু বাল্যবিবাহপরায়ণ ভারতে বিবাহ ভঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, তথায় পতির মৃত্যুতে সতী আত্মদেহ বিসর্জ্জন করে।

যাঁহারা বলেন, পরে বিবাহ করিতে পারিবে না, এই সামাজিক নিয়ম থাকাতেই ভারতীয় স্ত্রীরা দুঃখ সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়া সহমৃতা হইত, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। তাঁহারা কি জানেন না যে, যে সকল স্ত্রীরা সহমৃতা হইত, তাহার অধিকাংশই অধিকবয়স্কা, এমন কি অনেকে ৮।১০ পুত্রের মাতা? এরূপ বয়স্থা স্ত্রীর ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা এত প্রবল মনে করা নিতান্ত হাস্যাস্পদ। বিশেষতঃ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে না পারার ভয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যুক্ত হওয়া সম্ভব নহে। তাহা

যদি হইত, তাহা হইলে যে সকল কুলীনকন্যা ও য়ুরোপীয় কুমারীদিগের বিবাহ হইবার আশা ত্যাগ হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ একজনও প্রাণত্যাগ করিত এবং আধুনিক হিন্দু বিধবাগণও উপায়ান্তর অবলম্বনে প্রাণত্যাগ করিত। কিন্তু তাহা যখন কেহ করে না, তখন উক্তরূপ কল্পনা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। অকৃত্রিম প্রণয় ও তদুপযোগী কর্ত্তব্য জ্ঞানই যে সহমরণের কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই। যদি বল, তবে পুরুষেরা স্ত্রীর সহিত সহমৃত হইত না কেন? অকৃত্রিম প্রণয় কি কেবল স্ত্রীর হয়, পুরুষের হয় না? বিধবা-বিবাহ প্রকরণ পাঠ করিলে ইহার কারণ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বাল্যবিবাহে অধিক প্রণয় জন্মিবার আর এক কারণ এই যে, তখন স্ত্রী পুরুষ কোন বিশেষ সংস্কারাধীন হয় না, সুতরাং বিবাহান্তে উভয়ই এক রূপ সংস্কারবিশিষ্ট হওয়াতে অধিক প্রণয়বান হয়। অধিক বয়সে বিবাহ হইলে স্ত্রী ও পুরুষের ভিন্নরূপ বিশ্বাস ও সংস্কার জন্মিতে পারে। সুতরাং তাহাদের মনোভঙ্গ হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। পুরুষের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ও স্ত্রীর হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া যাওয়ার পর উভয়ে যদি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে কখনও তাহাদের মনোমিলন হইতে পারে না। কেননা তখন কেহ কাহারও বদ্ধমূল সংস্কার ও বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে পারে না। 'যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা' স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধে এই যে প্রবাদটী আছে, তাহা এক কালে মিথ্যা হয়। অতএব যখন বিবাহ-বন্ধন যাবজ্জীবনের জন্য দৃঢ় করা একান্ত আবশ্যক, তখন বাল্যকালে বিবাহ হওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত।

বাল্য বিবাহের আর একটী উৎকৃষ্ট গুণ এই যে, বিবাহ কালে দম্পতীর মনে কোনও প্রকার অপবিত্র ভাবেরই উদয় হয় না। তাহারা যেন কোন স্বর্গীয় ভাবে মিলিত হইতেছে বোধ করে। অধিক বয়সের বিবাহে সে পবিত্রতা থাকা দূরে থাকুক, তাহা কেবল অশ্লীল ও অপবিত্র ভাবেই পরিপূর্ণ। তাহাতে কেবল ইন্দ্রিয় ও রিপুর ব্যাপারই প্রকাশিত হয়। বিশেষতঃ স্ত্রী জাতির অতি কদর্য্য ব্যবহার প্রকাশ পায়। কেননা বিবাহিতা স্ত্রীকে পিতৃমাত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বামী-গৃহে যাইতে হয়। ইন্দ্রিয়াধীন হইয়া আজন্মসহচর, হৃদয়-সর্ব্বস্ব, পরমোপকারী পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর স্নেহরজ্জু ছেদন করিয়া অপরিচিত বা ক্ষণপরিচিত পুরুষের সহিত অপবিত্র ভাবে যাওয়া কি যুবতীর পক্ষে নিতান্ত লজ্জাকর ও কৃতঘ্ন ব্যবহার নয়? উহা কি রমণীর মানবোচিত কার্য্য না সভ্যতার চিহ্ন? ঈশ্বর কি রমণীহৃদয় এমন নির্লজ্জ ও কঠিন করিয়াছেন, যে যুবতীগণ কেবল রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া অক্ষুণ্ণ মনে সমস্ত স্নেহ মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃদয়সর্ব্বস্ব প্রাণসম পিতা মাতাকে চিরজীবনের মত পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণপরিচিতের সহিত চলিয়া যাইতে পারে? সেই ষোড়শী কি বিংশীকে ধিক্, যে পিতামাতাদির এবম্বিধ অকৃত্রিম প্রণয় উপেক্ষা করিয়া এক জন পথিকের সহিত অপবিত্র ভাবে গমন করে। এই পাশবদৃশ্য অতি ঘৃণাকর। এই পশুব্যবহার কখনও মানবোচিত নহে। বাল্যবিবাহিতা বালিকাকে এরূপ রাক্ষসোচিত ব্যবহার প্রকাশ করিতে হয় না। পিতা বালিকার উপযোগী পতি স্থির করিয়া যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা অল্প বয়সেই

এরূপ ভাবে তাহার সহিত মিলাইয়া দেন যে, বালিকা পিতা-মাতাকে পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই ঐ যুবাকে পিতৃনির্দ্দিষ্ট ঈশ্বরদত্ত পরমবন্ধু বলিয়া জানিতে পারে। বাল্যকাল হইতে পুনঃ পুনঃ পিতৃভবনে ও শ্বশুরালয়ে তাহাকে দেখিয়া, স্বামীকে চিরপরিচিতের ন্যায় মনে করে ও ক্রমে ক্রমে স্বামী, ভ্রাত্রাদি বালসহচর তুল্য হইয়া পড়ে। কখন পিতৃ গৃহে ও কখনও স্বামী গৃহে বাস করে, কখনও পিতামাতার ও কখন স্বামীর সেবা করে। অতএব যদি পবিত্রতা, প্রণয়, কৃতজ্ঞতা ও লজ্জা সভ্য ব্যবহার হয়, অশ্লীলতা পরিত্যাগ যদি মানবীয় ব্যবহার হয়, তবে বাল্যবিবাহ যে সভ্যতানুমোদিত, তাহাতে সন্দেহ নাই? অধিক বয়সে বিবাহ স্বাভাবিক, সুতরাং পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট লক্ষণা-নুসারে উহা অসভ্যতা এবং বাল্যবিবাহ কৃত্রিম ও উপকারক সুতরাং উহা সভ্যতা।

কিন্তু তাহা বলিয়া নিতান্ত অল্পবয়সে বিবাহ হওয়া উচিত নয়। কেননা নিতান্ত অল্প বয়সে বিবাহ হইলে মানবগণ অল্পবয়সে প্রণয়মগ্ন ও সন্তান-ভারে জড়িত হইয়া জ্ঞানার্জ্জনে অশক্ত ও অর্থাভাবে ক্লিষ্ট হয় ও অপক্ক বীজে দুর্ব্বল সন্তান জন্মিতে পারে, পাশ্চাত্য সভ্যতা-পরায়ণগণ এই সকল দোষের উল্লেখ করিয়াই বাল্যবিবাহের নিন্দা করেন, উহার গুণগুলি দেখেন না। কিন্তু পুরুষজাতির কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে বিবাহ দিলে এই সকল দোষ নিবারিত হইতে পারে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরাই সপ্রমাণ করিয়া-ছেন, অধিক-বয়স্ক পুরুষের ঔরসে অল্প-বয়স্কা নারীর গর্ভে জাত সন্তান দুর্ব্বল হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেও দেখা যাইতেছে, স্ত্রী অপেক্ষা অন্ততঃ ৫।৬ বৎসর পরে পুরুষের

সন্তানজননশক্তি জন্মে। সুতরাং অধিক-বয়স্ক পুরুষের সহিত অল্প-বয়স্কা স্ত্রীর বিবাহ হওয়া স্বভাবতঃ উচিত্। বিদ্যাশিক্ষা ও ধনোপার্জ্জনাদির শক্তিলাভ করিবার জন্যও পুরুষের কিছু বিলম্বে বিবাহ হওয়া আবশ্যক। স্ত্রীজাতির ন্যায় পুরুষকে বিবাহান্তে পিতৃগৃহ্ পরিত্যাগ করিতে হয় না বলিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে পুরুষের বিবাহ হইলে তাদৃশ দোষও ঘটে না। এই জন্য মনুর মতে ৮ বৎসরের স্ত্রীর সহিত ২৪ বৎসরের পুরুষ অথবা ১২ বৎসরের স্ত্রীর সহিত ৩০ বৎসরের পুরুষের বিবাহ হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, এক্ষণে ১০।১২ বৎসরের স্ত্রীর সহিত ২০।২২ বৎসরের পুরুষের বিবাহ হওয়া উচিত। কেননা পূর্ব্বকালের ন্যায় মানব এক্ষণে দীর্ঘজীবী নয় এবং এক্ষণে পূর্ব্বকালের ন্যায় বেদপাঠের আবশ্যকতাও নাই। এক্ষণে ২০।২২ বৎসর বয়ঃক্রম-মধ্যে সিবিল সার্ভিস পর্য্যন্ত পরীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যে সকল ধনী সন্তান শিক্ষা বা উপার্জ্জনাদিতে নিযুক্ত নয়, আমাদের মতে তাহাদের আরও ২।৪ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া উচিত। কেননা কোনও কার্য্য না থাকায় যৌবনলাভের পরেই তাহাদের দুষ্ক্রিয়াশক্তি জন্মিতে বা অপাত্রে প্রণয়-স্থাপন হইতে পারে। ঐরূপ চেষ্টার পূর্ব্বে তাহাদের বিবাহ দিলে ঐ দোষ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা।

অনেকে বলিতে পারেন যে, বিদ্যাশিক্ষার অনুরোধে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীর বিবাহকাল বৃদ্ধি করা হইল না কেন? স্ত্রী কি শিক্ষা করিবে না? আমরা বলি, স্ত্রীজাতিরও বিদ্যাশিক্ষা করা আবশ্যক বটে, কিন্তু পুরুষের ন্যায় তাহাদের অধিক শিখি-

ক্ষার আবশ্যকতা নাই। স্ত্রীজাতির যেরূপ শিক্ষা আবশ্যক, অল্প বয়সে বিবাহে সে শিক্ষার বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা নাই।

যত অল্প বয়সেই বিবাহ হউক, একথা মনে রাখিতে হইবে, যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সন্তানজননের শক্তি না জন্মিলে স্ত্রীপুরুষের একত্র সহবাস উচিত নয়। এরূপ করিলে সন্তান দুর্ব্বল হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। তাই ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ গর্ভাধান সংস্কারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ঐ সংস্কারের পূর্ব্বে কোনমতেই স্ত্রীপুরুষের সহবাস করা উচিত নয়। সুতরাং যত অল্প বয়সেই বিবাহ হউক, তাহাতে কোন দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। তবে বৈধব্যাশঙ্কা করিয়া নিতান্ত অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া উচিত নয়।

অনেকে বলেন, অল্প বয়সে বিবাহ হইলে বরকন্যা বিবাহের মর্ম্মই বুঝে না, সুতরাং তাহা বিবাহ-পদবাচ্য হইতে পারে না। বিবাহসময়ে পরস্পরে যে প্রতিজ্ঞা করে, তাহারা তাহার মর্ম্ম বুঝে না—সুতরাং সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তাহারা বাধ্য নহে। আমরা কিন্তু একথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। কেননা অল্প বয়সে যে বিবাহের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না—তাহার অর্থ কি? সে সময়ে পাপবৃত্তির বিকাশ হয় নাই বলিয়া বিবাহের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না, যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থমাত্রই বিবাহের উদ্দেশ্য মনে করেন, সুতরাং তাঁহাদের কথার উত্তর দেওয়াই উচিত নয়। বাস্তবিক বিবাহ এরূপ ঘৃণের ব্যাপার নহে। কেবল প্রতিজ্ঞারক্ষা করিবার জন্য বিবাহবন্ধন আজীবন স্থায়ী হয় না। লোকে ত নিয়তই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া থাকে। বিবাহ

প্রতিজ্ঞামূলক হইলে বিবাহভঙ্গও নিয়তই হইবে। অতএব মন্ত্র বুঝা অপেক্ষা না বুঝাই ভাল। উহাকে মন্ত্রপূত দৈববন্ধন বলিয়া জানাই উচিত।

সবর্ণ-বিবাহাদি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কেবল স্ত্রীপুরুষের মনোমিলনই বিবাহের উদ্দেশ্য নহে। সুপুত্রোৎপাদন ও সাংসারিক কার্য্যাদি সুনির্ব্বাহই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং কেবল পরস্পরের মনোমিলনের উপায় অনুসন্ধান করিলে চলিবে না। যেরূপ বিবাহে সুস্থ গুণবান পুত্র জন্মিতে পারে ও পরস্পরের সহায়তায় সাংসারিক কার্য্যাদি সুনির্ব্বাহ হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। ভারত ভিন্ন অন্য কোনও দেশে সে সকলের প্রতি লক্ষ্য নাই। কেবল দম্পতীর পরস্পরের মনোমিলনের প্রতিই তাহাদের দৃষ্টি। তাই ইংলণ্ডাদি দেশে অধিক-বয়স্কা স্ত্রীর সহিত অল্প বয়স্ক পুরুষের এবং জ্ঞাতি ও নিতান্ত আত্মীয় কুটুম্বের পুত্রকন্যার পরস্পর বিবাহ হইয়া থাকে; এবং তথায় স্ত্রীপুরুষের আভিজাত্য ও ব্যবসাদি বিষয়ে কিছুমাত্র বিচার করা হয় না। যদি পরস্পরের মনোমিলন হয়, তবে অন্য সহস্র দোষও তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু তাহা যেমন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, তেমনই অনিষ্টকর। কেননা, যখন স্বভাবতঃ যে বয়সে স্ত্রী যুবতী হয়, সে বয়সে পুরুষ বালক থাকে, তখন অধিক-বয়স্কা স্ত্রীর সহিত অল্প-বয়স্ক পুরুষের অথবা পরস্পর সমবয়ীয়ের বিবাহ যে স্বভাববিরুদ্ধ ও ক্ষতিকর তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের দেশে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা উহার অপকারিতা বিলক্ষণ অনুভব

করিয়া থাকেন। জ্ঞাতি ও পিতৃমাতৃবন্ধুর পুত্রকন্যাদিগের পরস্পর বিবাহে অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা দোষ, বিবাদবিসম্বাদ ও নানা অসুবিধা জন্মে। তদ্ভিন্ন জ্ঞাতি বা সমান রক্তের স্ত্রীপুরুষের সম্মিলন-জাত সন্তান অনেকদোষযুক্ত হয়। একথা য়ুরোপীয়েরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। যে স্ত্রীপুরুষের বিবাহ হয়, তাহারা যদি পরস্পরে স্বজাতি অর্থাৎ সমব্যবসায়ী ও সমান অবস্থা-সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে পরস্পরের কার্য্যের সুবিধা ও মনের মিলন হইবার অধিক সম্ভব। নতুবা উভয়ের প্রকৃতি ও অভ্যাস ভিন্ন প্রকারের হইলে মনের তাদৃশ মিলন হয় না, কার্য্যেরও অনেক অসুবিধা ঘটে। স্বভাবতঃ পুত্র পিতৃগুণ প্রাপ্ত হয়, এজন্য সুপুত্র-প্রাপ্তিজন্য গুণবানের অভিজাতোৎপন্ন পুত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া উচিত। এই সকল কারণে ভারতে কৌলীন্য প্রথা, সবর্ণ-বিবাহ নিয়ম, জ্ঞাতিকুটুম্বের পুত্রকন্যা বিবাহ নিষেধ ও বর অপেক্ষা কন্যা কনিষ্ঠ হইবার বিধান হইয়াছে। সবর্ণ-বিবাহ সম্বন্ধীয় আর আর কথা জাতিভেদপ্রকরণে বিবৃত হইল।

ভারতীয় বিবাহ-পদ্ধতির আর একটী অতি উৎকৃষ্ট গুণ এই যে, ঐ প্রণালী-অনুসারে বিবাহকালে বরকন্যার মনে কোন প্রকার ইন্দ্রিয়বিকার উপস্থিত হয় না, প্রত্যুত, অতি পবিত্র স্বর্গীয় ভাবেরই উদয় হয়। হৃদয়সর্ব্বস্ব, আজন্মসহায়, পরম প্রণয়াস্পদ, পিতামাতাদি পরিত্যাগ করিয়া সরলা বালিকাকে যে অপরিচিতের সহিত চিরকাল বাস করিতে হইবে, তাহার সহিত মিলন করিয়া দিবার জন্য ভারতীয় বিবাহপদ্ধতি অতি উৎকৃষ্ট উপায়। উহা নিতান্ত হৃদয়গ্রাহী ও প্রকৃত নব-হৃদয়-

সংযোজনের উপযুক্ত। ভারতীয় বরকন্যা ও সর্ব্বসাধারণে বিবাহকে একটী অবশ্যকর্ত্তব্য যজ্ঞবিশেষ ও বিবাহদিনকে একটী পবিত্র শুভদিন মনে করেন। বিবাহব্যাপারে নানাবিধ গীতবাদ্য, আত্মীয় ও বহুবিধ লোকসমাগম, ভূরিভোজন, দরিদ্রাদিকে অর্থ দান, উপগত পিত্রাদির শ্রাদ্ধ, গৃহাদির পারিপাট্য ও সজ্জা, বরকন্যা ও সহযাত্রীদিগের বেশভূষা ও নানাবিধ আমোদ, আত্মীয়তা ও সৌহার্দ্দ মিশ্রিত থাকায় উহা একটী মহোৎসবের ন্যায় হয় ও বিবাহের সংস্কার নাম সার্থক হয়। উহাতে নর-নারীর মন এরূপ মিলিত করে যে, বিবাহ দৃঢ়ীকরণ জন্য সাক্ষী ও রেজিষ্টারির প্রয়োজন হয় না। এরূপ পবিত্র ও মনোমিলনকর বিবাহপদ্ধতি পৃথিবীর আর কোনও দেশেই নাই। সাক্ষী ও রেজেষ্টরী ভিন্ন প্রায় কোন দেশেরই বিবাহ সম্পন্ন হয় না। ঐ সকল দেশে বিবাহ বিষয়ব্যাপারের চুক্তিবিশেষের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্রণয়ের চুক্তি, ভক্তির চুক্তি ও শ্রদ্ধার চুক্তি কি নিতান্ত হাস্যাস্পদ নয়? উহাতে কি মানবীয় উচ্চতার চিহ্নমাত্রও প্রকাশ পায়? না প্রণয়ের কিছুমাত্র পবিত্রতা ও মুগ্ধকারিতা থাকে? ভারতীয় বিবাহ ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ এবং ভারতে স্ত্রীর নাম সহধর্ম্মিণী ও অর্দ্ধাঙ্গ। ভারতীয় পতিপত্নীর ন্যায় যুগলমূর্ত্তি পৃথিবীর আর কোনও দেশে নাই। যে য়ুরোপীয় সভ্যতানুরাগী মহাশয়েরা এমত উৎকৃষ্ট বিবাহ-পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া য়ুরোপীয় প্রথার অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই, সভ্যতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই ও মানবের দেবত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

বিধবা-বিবাহ।

এই সকল হিতসাধনের জন্যই ভারতে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু নবযুবকগণ উহার হিতকারিতা বুঝিতে না পারিয়া বিধবাগণের বিবাহ দিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন। স্ত্রীবিয়োগান্তে পুরুষ পুনর্বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু পতিবিয়োগে স্ত্রী পুনর্বিবাহ করিতে পারে না, ইহা দেখিয়া আধুনিক নব্যসম্প্রদায় ভারতীয় পুরুষসম্প্রদায়কে নিতান্ত নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যদি ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বিধবাবিবাহের অপকারিতা ও তন্নিষেধের কারণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, সকল দেশেই কতকগুলি করিয়া স্ত্রীর বিবাহ বন্ধ থাকে, অর্থাৎ দেশ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রূপ এমত কতকগুলি নিয়ম আছে যে, তদবলম্বনে চলিলে সকল স্ত্রীর বিবাহ হইতে পারে না। সকল স্ত্রীর চিরকাল স্বামী সংযুক্ত থাকিতে পারিবার অনুকূল ব্যবস্থা প্রায় কোন দেশেই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, সকল নারীর চিরকাল স্বামীসহবাস ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। ইংলণ্ডে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তথায় কত কুমারী চিরকাল অবিবাহিত থাকে? ভারতে বহুবিবাহ প্রচলিত ও বিধবা-বিবাহ নিষেধ আছে, তথাপি কন্যার বিবাহের জন্য কোন্ ব্যক্তি চিন্তিত না হয়েন? পশ্চিম দেশের লোকেরা কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইবার জন্য কত কন্যার প্রাণ নষ্ট করে। অতএব যখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কতকগুলি স্ত্রীকে চির-

স্বামীসহবাসসুখ হইতে বঞ্চিত হইতেই হইবে, তখন কুমারীর বিবাহ বন্ধ না করিয়া বিধবাবিবাহ বন্ধ রাখাই উচিত? কেননা তাহা হইলে সকলের প্রতি পক্ষপাতশূন্য ন্যায় ব্যবহার করা হয়, এবং গার্হস্থ্য প্রণালীও সুনিয়মে চলে। নচেৎ কোনও রমণী দশবার বিবাহ করিবে ও কেহ একবারও বিবাহ করিতে পারিবে না, এরূপ নিয়ম নিতান্ত পক্ষপাত-দূষিত।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিলে, গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আদৌ দৃঢ়তা থাকে না। গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা স্ত্রীজাতির বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে গৃহের নির্দ্দিষ্টতা থাকে না। স্ত্রীজাতি বাল্যকালে পিতৃভবনে থাকে, পরে স্বামীভবনে আসিয়া স্থির হয় বলিয়া, স্বামীভবনের সুশৃঙ্খলা-সম্পাদনে তাহাদের যত্ন হয়, পিতৃগৃহেব কোনও কার্য্যে তাহাদের তত মনোনিবিষ্ট হয় না। কিন্তু স্ত্রী যদি জানে যে স্বামীর মৃত্যু-অন্তে তাহাকে অন্য স্থানে যাইতে হইবে, তাহা হইলে সে গৃহকার্য্যে দৃঢ়রূপে মনোযোগী হইবে কেন? তাহা হইলে স্থায়ী কোনও কার্য্যেই তাহার মনোযোগ হইতে পারে না। আবার স্বামিও যদি জানে, যে, তাহার মৃত্যুব পর তাহার স্ত্রী অন্যত্র গমন করিবে ও তৎসঙ্গে তাহার অল্পবয়স্ক পুত্রেরাও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইবে, তাহা হইলে তাহারও স্থায়ী গৃহ-নির্ম্মাণে প্রবৃত্তি হয় না। ইংলণ্ড তাহার প্রমাণ। তথায় বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে বলিয়া তথাকার প্রায় কোনও লোকেরই স্বকীয় স্থায়ী বাসগৃহ নাই। সকল লোকেই চিরকাল ভিন্ন ভিন্ন সরাই প্রভৃতিতে বাস করিয়া জীবন অতিবাহিত করে। এই জন্য তথায় দরিদ্রের এত দুরবস্থা এবং গার্হস্থ্য-প্রণালীর এত বিশৃঙ্খলা। ভারতে যে অতি দরিদ্র,

তাহারও নিজের গৃহ ও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান আছে, এজন্য পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। অতি দরিদ্রও বিপদ্‌কালে প্রতিবেশীর সহায়তা প্রাপ্ত হয়। গৃহ ও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান থাকায় কুসীদ-ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতেও আপদ্ কালে তাহারা ঋণগ্রহণ করিতে পারে। ইংলণ্ডে মধ্যবিধলোককেও ঋণ দিতে লোকে আশঙ্কা করে। কেননা তাহার প্রকাশ্য কোনও বিষয় বা নিজের গৃহ নাই। বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিলে ভারতেও যে ঐ দুর্দশা ঘটিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

পুত্রবতী বিধবার বিবাহ আরও অনিষ্টকর। কেননা পুত্রবতী বিধবার বিবাহ হইলে, পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবার পুত্রকে হয় মাতৃত্যাগ করিতে হইবে, অথবা পিতৃ-গৃহ, পিতামহ, পিতামহী ও খুল্লতাত প্রভৃতি পিতৃপরিজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র মাতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বিমাতা হইতে যে কি কষ্ট, তাহা এদেশীয় অনেকে জানেন, কিন্তু বিপিতার কষ্টের আস্বাদ এদেশবাসীরা জানেন না। তাহা যে আরও কষ্টকর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পুত্রবতী বিধবার বিবাহ হইলে পুত্রকে ঐ নিদারুণ কষ্টে জর্জ্জরীভূত হইতে হয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারেও বিধবা-বিবাহ উচিত নয়। কেননা মাল্‌থস্ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, যথানিয়মে বংশবৃদ্ধি হইলে সকল লোকের খাদ্য সংকুলন হয় না। যে পরিমাণে বংশবৃদ্ধি হয়, খাদ্যবৃদ্ধি তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প হয়। এই জন্য বংশবৃদ্ধি না কমাইলে তাঁহার মতে আহারাভাবে মানুষ মরিয়া যাইবে। এক্ষণে ঐ কারণেই নিরত দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইতেছে। সুতরাং বিধবাবিবাহ প্রচলন

দ্বারা আরও প্রজা বৃদ্ধি করিয়া লোকের কষ্ট বৃদ্ধি করা কোনও মতেই উচিত নয়। একথা সত্য হইলে স্ত্রীজাতির পুনর্ব্বিবাহ দেওয়া দূরে থাকুক, পুরুষের পুনর্ব্বিবাহ রহিত করাই আবশ্যক। সেই জন্য আজি কালি দুরবস্থাপন্নদিগের বিবাহ রহিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। অতএব যাঁহারা বিধবাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বিধবাগণের বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কি কুমার কুমারীদিগের দুঃখে দুঃখিত হইবেন না? দুর্ভিক্ষ ও মহামারীপীড়িতদিগের ভয়ানক কষ্টে কি তাঁহাদের চিত্ত আর্দ্র হইবে না? অথবা গার্হস্থ্যধর্ম্মের শিথিলতা-নিবন্ধন ও দরিদ্রগৃহে জন্মহেতু মানবের দারিদ্র্য-দুঃখে ব্যথিত হইবেন না? তাঁহারা কি জানেন না যে, এক বিধবাদিগের রিপুচরিতার্থজনিত দুঃখ মোচন করিতে গেলে ঐ সমস্ত প্রকার দুঃখেরই বৃদ্ধি হইবে? বিশেষতঃ বিধবাদিগের বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকিলে পিতৃভক্তি, সোদরস্নেহ, বধূপ্রীতি, জ্ঞাতিগৌরব, প্রতিবেশীপ্রিয়তা, অতিথিসৎকার প্রভৃতি মানবীয় উচ্চগুণগুলির এককালেই পরিচালনা হয় না, মানব কেবল পশুর ন্যায় স্বার্থ-চিন্তায় রত থাকে। এমত জ্ঞানালোকসমুজ্জ্বল ও উচ্চ সভ্যতাসম্পন্ন য়ুরোপ কেবল ঐ দোষেই পশুস্বভাব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। স্বার্থের জন্য তাঁহারা নিয়তই মানবজাতির বিদ্রোহাচরণ করিতেছেন—প্রলোভন ও বল দ্বারা পরের ধন হরণ করিতেছেন।

বিধবাবিবাহে এই সকল ও অন্যবিধ অসুবিধা আছে বলিয়াই বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। নচেৎ পূর্ব্বকালে যখন ভারতে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল, তখন উহা রহিত

হইবার কারণ কি? ভারতীয় ঋষিগণ এত নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর ছিলেন না যে, কেবল আপনাদের সুখের জন্য বিধবাদিগকে এত কষ্ট দিয়াছেন। পুরুষের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা ও তাহাদের ব্যভিচারে তাদৃশ অনিষ্ট হয় না দেখিয়া অনেকে ঐরূপ বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পুরুষের পুনর্বিবাহে ঐ সকল দোষ লক্ষিত হয় না বলিয়াই পুরুষের পুনর্বিবাহ নিষেধ হয় নাই। প্রত্যুত পুরুষের পুনর্বিবাহ সত্বেও যখন কন্যার পাত্রের অসদ্ভাব, তখন পুরুষের পুনর্বিবাহ বন্ধ হইলে আরও পাত্রের অসদ্ভাব হইবে। তাহা হইলে উপযুক্ত পাত্রাভাবে আরও অনেক কন্যা অবিবাহিতা থাকিবে। এই কারণেই পুরুষের পুনর্ব্বিবাহ নিষেধ হয় নাই। কিন্তু তথাপি অধিক বয়সে ও উপযুক্ত পুত্রাদি বর্ত্তমানে পুরুষের পুনর্বিবাহ অনুচিত।

কি স্ত্রী, কি পুরুষ, উভয়েরই ব্যভিচার দোষাবহ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তবে যে স্ত্রীর ব্যভিচারে অধিক শাসন তাহার কারণ এই যে, স্ত্রীর ব্যভিচারে অন্যের সন্তান তাহার গর্ভে স্থান পায়। সেই পরকীয় দোষযুক্ত জারজ সন্তানের প্রতিপালনভার স্বামীর স্কন্ধে পড়ে, পুরুষের ব্যভিচারে সেরূপ কোন অন্যায় ভার স্ত্রীর স্কন্ধে পতিত হয় না, ও তদ্দারা দোষযুক্ত জারজ সন্তান সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া সমাজকে কলুষিত করিতে পারে না। এই জন্যই স্ত্রীর ব্যভিচারের এত শাসন, অযথা দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারবাসনার পরিতৃপ্তি বা পুরুষের স্বার্থ-সাধন উহার কারণ নহে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

জাতিভেদ।

পাশ্চাত্যসভ্যতানুরাগী ব্যক্তিগণ বৈষম্যদূষিত বলিয়া ভারতীয় জাতিভেদপ্রথার নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক উহা বৈষম্যদূষিত বা অনিষ্টকর নহে—প্রত্যুত, উহাই মানবজাতির সাম্য-সংস্থাপক ও সর্ব্ব প্রকার মঙ্গলের নিদান। জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত থাকিলে মানবগণ স্ব স্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে ও কার্য্যে সমধিক নিপুণতা লাভ করে, সুতরাং সকলের মনের শান্তি ও কার্য্যের সুশৃঙ্খলা সম্পাদিত হয়, ধর্ম্মোন্নতি ও সমাজশৃঙ্খলা সাধিত হয় এবং বল, বীর্য্য, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি ও বিদ্যাদির সমধিক উন্নতি হয়। ভারতে জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া ভারত যেরূপ সত্বর উন্নত হইয়াছিল,—ভারতে যেরূপ কৃষি, শিল্প, বীরত্ব, জ্ঞান ও ধর্ম্মাদির উন্নতি হইয়াছিল, পৃথিবীর আর কোনও দেশেই সেরূপ হয় নাই।

জাতিভেদ না থাকিলে মানবগণ শক্তি অনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু শক্তি সকলের সমান নহে। কাজেই মানবগণ পরস্পর অতিশয় বিষমাবস্থ হইয়া পড়ে, এমন কি অনেকেই আহারীয় পর্য্যন্ত পায় না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই ঋষিগণ জাতিভেদপ্রথার সৃষ্টি করিয়াছেন। অত্যাচার করিবার জন্য বলপূর্ব্বক এ প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন নাই।

স্বভাবের নিগূঢ় অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া কার্য্য-সৌকর্য্য ও সুখবিধান করিবার জন্ত এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

আদিম কালে যে মানবের যেরূপ শক্তি, অবস্থা ও রুচি ছিল, সে তদনুরূপ কার্য্য অবলম্বন করিয়াছিল। বলপূর্ব্বক কেহ কাহাকে কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত করায় নাই। যে ব্যক্তি যে কার্য্য অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার পুত্রের সেই কার্য্য করার সুবিধা ও প্রবৃত্তি হইবার অধিকতর সম্ভব হওয়াতে, পুত্রেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই পিত্রবলম্বিত কার্য্য অবলম্বন করিয়া তাহাতে পটুতা লাভ করিয়াছিল। চিরজীবন একবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে সে কার্য্যে যেরূপ পটুতা জন্মে, বংশানুক্রমিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে তদপেক্ষাও অধিক পটুতা জন্মিবার সম্ভব। কেননা পুত্র অতি শৈশবকাল হইতে পিতার চেষ্টিত কার্য্য সকল অবগত হইতে থাকে, বাল্যাবধি পিতার নিকট হইতে কার্য্য শিক্ষা করিতে পারে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পিতৃগুণ ও পিতৃনিপুণতা পুত্রে সংক্রামিত হওয়ায় স্বভাবতঃ পিতৃ-কার্য্যদক্ষতা জন্মে, অবলম্বিত কার্য্য স্থির থাকায় একমনে কার্য্য শিক্ষা করে, কার্য্যান্বেষণজন্ত সময় নাশ ও অসুবিধা ঘটে না এবং অভ্যাসের বিপরীত কার্য্যকরণজন্ত কষ্ট স্বীকার করিতে না হওয়ায় কার্য্যে দৃঢ় মনঃসংযোগ হয়। এই জন্ত ঢাকায় যেরূপ বস্ত্র ও কাশ্মীরে যেরূপ শাল প্রস্তুত হয়, এরূপ আর কোথাও হয় না—এই জন্ত কৃষকপুত্র যেরূপ কৃষিকার্য্য ও বাহকপুত্র যেরূপ বহনকার্য্যে পটু হয়, অন্যে সেরূপ হয় না এবং এই জন্ত ব্রাহ্মণ যেরূপ জ্ঞানী ও ক্ষত্রিয় যেরূপ বীর হয়, এরূপ আর কেহ হইতে পারে না।

বংশানুরূপ কার্য্য করিবার নিয়ম না থাকিলে, উক্ত প্রকার

বিচক্ষণতা জন্মান কঠিন। কেননা তাহা হইলে মানবগণ শিক্ষা-লাভের সুবিধা না পাইয়া ও কোন্ কার্য্য অবলম্বনে সুবিধা হইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া এবং ঈপ্সিত-কার্য্য প্রাপ্ত না হওয়ায় অনভ্যস্ত ও রুচি-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে বাধ্য হওয়ায় অনেকেরই কার্য্যে নিপুণতা জন্মে না, অথচ অনভ্যস্ত কষ্টকর কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া মহা ক্লেশ অনুভব করে। পিতা আপনার অবস্থার অনুরূপ অবস্থাতেই পুত্রদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। সুতরাং যাহার পিতার অবস্থা ভাল, সে বাল্য-কাল হইতে উত্তম অবস্থায় থাকে এবং যাহার পিতার অবস্থা মন্দ, সে বাল্যকাল হইতে মন্দ অবস্থায় থাকে। বাল্যকাল হইতে যে ব্যক্তি যে অবস্থায় থাকে, তাহা তাহার অভ্যাস হইয়া যায়, সে অবস্থা মন্দ হইলেও তাহার পক্ষে কষ্টকর হয় না। অবস্থার ব্যতিক্রম হইলে মানবের অত্যন্ত কষ্ট হয়। যে ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে রৌদ্রবাতাদিতে ভ্রমণ করে নাই, কষ্টকর কোন কার্য্য করে নাই এবং অপকৃষ্ট স্থানে বাস ও অপকৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করে নাই, তাহাকে যদি নিয়ত রৌদ্রবাতাদিতে ভ্রমণ, শ্রমকর কার্য্য সম্পাদন, অপকৃষ্ট স্থানে বাস ও অপকৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার কষ্টের সীমা থাকে না। কিন্তু যাহারা বাল্যকাল হইতে উক্তপ্রকার অবস্থায় অবস্থিত আছে, তাহারা উক্তরূপ বাতাদি হইতে কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করে না। অভ্যাসের এমনই আশ্চর্য্য শক্তি, যে, তৎপ্রভাবে নিম্ন অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের উচ্চ ব্যবহারও কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা স্বনাম বা পুত্রনামধন্য অর্থাৎ যাঁহারা স্বশক্তি বা পুত্রশক্তিপ্রভাবে নিম্ন অবস্থা হইতে উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য-

ব্যবহার দেখিলেই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐরূপ ব্যক্তিরা বাল্যাভ্যাসের বিপরীত উন্নতাবস্থায় থাকিতে লজ্জিত ও অসুখী বোধ করেন, এমন কি অনেকে উৎকৃষ্ট আহার ও উৎকৃষ্ট পরিধেয় ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন। বস্তুতঃ উন্নতাবস্থা হইতে নিম্নাবস্থায় পতিত হইলে মানবের যেরূপ কষ্ট হয়, নিম্নাবস্থা হইতে উচ্চাবস্থায় উত্থিত হইলে সেরূপ সুখ হয় না। অতএব যে নিয়ম অবলম্বন করিলে মানবের নিয়ত অবস্থা-বিপর্য্যয় না ঘটে, সেই নিয়মই উৎকৃষ্ট। কিন্তু যাহার যেরূপ ইচ্ছা, সে সেরূপ কার্য্য করিলে নিয়ত অবস্থাবিপর্য্যয় ঘটে, সুতরাং তাহা মানবের সমূহ দুঃখের কারণ। কেননা কৃষক-পুত্র যদি ব্রাহ্মণের কার্য্য করে, তবে ব্রাহ্মণপুত্রকে কৃষকের কার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হইবে, বাহকপুত্র যদি কুম্ভকারের কার্য্য করে, তবে কুম্ভকারপুত্রকে বাহকের কার্য্য করিতে হইবে, বিষ্ঠাবাহী যদি তন্তুবায় হয়, তবে তন্তুবায়পুত্রকে বিষ্ঠা-বহন কার্য্য করিতে হইবে। কেননা পৃথিবীতে যতবিধ ব্যবসায় আছে, তৎসমস্তই আবশ্যক, কোনও একটী কার্য্যের লোপ বা ন্যূনাধিক্য হইলে বিশ্বকার্য্য চলে না। সুতরাং কৃষকপুত্রেরা যদি ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহা হইলে কৃষকবৃত্তির অল্পতা ও ব্রাহ্মণবৃত্তির আধিক্য হয় ও ঐ ন্যূনাধিক্য দূর করিবার জন্য ব্রাহ্মণপুত্রদিগকে স্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে এবং ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন ব্যবসায়ীকে কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। কাজে কাজেই নিয়ত মানবের অবস্থা-পরিবর্ত্তন জন্য দুঃখ ঘটে। সুতরাং যাহাদের রৌদ্রবাতাদি সহ্য করিবার শক্তি নাই, তাহাদিগকে রৌদ্র বাতাদিতে ক্লিষ্ট ও

পীড়িত হইতে হয়, যাহাদিগের দুর্গন্ধ সহ্য করিবার শক্তি নাই; তাহাদিগকে বিষ্ঠাবহনরূপ নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কষ্টকর ও পীড়াজনক কার্য্য করিতে হয় ও যাহাদের বহন-কার্য্য ও হলচালনোপযোগী শরীরের দৃঢ়তা নাই, তাহাদিগকে ঐ সকল অসহ্য কষ্টকর কার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হয়। তাহাতে রোগ, দারিদ্র্য, নৈরাশ্য এবং কার্য্যে অনিচ্ছা ও অপটুতা জন্মে। কিন্তু মানব যদি বংশানুক্রমিক কার্য্যে রত থাকে, তাহা হইলে কাহাকেও অবস্থাবিপর্য্যয় জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। সকলেই স্ব স্ব অভ্যাসমত কার্য্য সম্পাদন করিয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করে। উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম না বলিয়াও কাহারও দুঃখ হয় না। যে যাহা চায় না বা যাহার আমোদ পায় নাই, তাহার অপ্রাপ্তিতে কখনও দুঃখ হয় না, যাহা চিরকাল পাইয়াছি, তাহা না পাইলেই দুঃখ হয়। অতএব বংশানুগত বৃত্তি-ব্যবস্থা অত্যন্ত হিতকর। এই জন্যই ভারতীয় ঋষিগণ জাতিভেদপ্রথায় দৃঢ়তা করিয়াছেন। উহা স্বভাবানুমোদিত, কৃত্রিম ও হিতকর, এইজন্য উহা সভ্যতার অনুমোদিতও বটে।

কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতানুরাগী ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত থাকিলে নিম্নশ্রেণীর বংশে যে সকল শক্তিসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের উন্নতি না হওয়ায় ও উচ্চবংশীয়ের অনুপযুক্ত সন্তানেরা অযথা শক্তির পরিচালনা করায় দেশের সমূহ অনিষ্ট হয় এবং শ্রেণীবিশেষে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকায় সকলে সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যসম্পাদনশক্তি ও সুখলাভ করিতে পারে না, প্রত্যুতঃ কেহ চিরকাল সুখে থাকে ও কেহ চিরকাল দুঃখ পায়। একথা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। কেননা

জাতিভেদপ্রথা প্রকৃত ক্ষমতাশালীর ক্ষমতা-প্রকাশে বাধা-প্রদান বা নির্গুণের অধঃপতন নিবারণ করেনা। যাহাতে বৃথা অবস্থা-পরিবর্তনজন্য মানবজাতির দুঃখ না হয়, তাহাই ইহার কার্য্য। নীচকুলে প্রকৃত শক্তিমানের উদ্ভব হইলে, ঐশীশক্তিবলে সে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া উন্নতি লাভ করে। এই জাতিভেদ-প্রধান ভারতবর্ষেও শূদ্রকবস ঋষি ও মহানন্দ সম্রাট হইয়াছিলেন এবং সূত লোমহর্ষণ পুরাণবক্তা ও ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। জাতিভেদপ্রথার ঐ দোষ স্বীকার করিলেও তদ্দ্বারা অতি অল্পলোকেরই উন্নতির বাধা ঘটে। কেননা পুত্র প্রায়ই পিতৃগুণপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে উচ্চশক্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্ভব নিতান্ত অল্প হয়। কাজেই অতি অল্প লোকেরই উন্নতির বাধা জন্মে। হিতের সহিত তুলনা করিলে ঐ সামান্য ক্ষতি ক্ষতিকরই নহে। জাতিভেদপ্রথা না থাকিলে বরং অনেকের উন্নতিরই বাধা ঘটে, কেননা তাহা হইলে অনেক অর্জন্ শক্তিসম্পন্ন নিম্নশ্রেণীর মনুষ্য অনেক উচ্চশ্রেণীর পুরুষকে দুরবস্থাপন্ন করিয়া শক্তি-প্রকাশে বাধা দেয়।

সকল কার্য্য বা একই নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি সকলেরই অবলম্বন মঙ্গলকর নহে। সকল কার্য্য করিবার চেষ্টা করিলে, কোন কার্য্যেই পটুতালাভ করিতে পারা যায় না। জাতিভেদ-প্রথার নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ব্রতী হইলে সকলেই সেই নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে পটুতালাভ করিয়া উন্নতিলাভ করিতে পারে ও অবসর পাইয়া অন্যান্য সকল প্রকার মানবীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া সুখী হইতে পারে। কৃষি, শিল্প, প্রভৃতি আবশ্যকীয় সমস্ত কার্য্য কেহ একাকী করিতে না পারাতেই পরস্পর কার্য্য

বিভাগ করিয়া লইয়াছে। ব্রাহ্মণ জ্ঞানচর্চ্চা করিতেছে, ক্ষত্রিয় দেশ রক্ষা করিতেছে, কৃষক শস্য বপন করিতেছে ও তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করিতেছে। কৃষক যেমন একাকী তণ্ডুল ভোজন করে না, তন্তুবায় যেমন একাকী বস্ত্র পরিধান করে না, ক্ষত্রিয় যেমন একাকী রক্ষিত হয় না, ব্রাহ্মণও সেইরূপ একাকী জ্ঞানলাভ করে না। কৃষক যেমন শস্যোৎপাদনের যত্ন কেবল নিজে করিয়াও তাহার ফল শস্য সকলকে প্রদান করে, ব্রাহ্মণও সেইরূপ জ্ঞান উপার্জ্জনের যত্ন কেবল নিজে করিয়াও তাহার ফলস্বরূপ জ্ঞান সকলকেই বিতরণ করে। সকল মনুষ্যই অন্ন বস্ত্রাদির ন্যায় জ্ঞানও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ জ্ঞান দিয়া তদ্বিনিময়ে কৃষকের নিকট হইতে তণ্ডুল লয়, এবং কৃষক তণ্ডুল দিয়া তদ্বিনিময়ে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে জ্ঞান লয়। ব্রাহ্মণ জ্ঞানোপার্জ্জনে যেরূপ পটু ও সুখী, কৃষক শস্য উৎপাদন করিতেও সেইরূপ পটু ও সুখী। ব্রাহ্মণ স্বয়ং শস্য উৎপাদন করিতে পারিতেছে না বলিয়া যেমন দুঃখ পায় না, কৃষকও সেইরূপ স্বয়ং জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারে না বলিয়া দুঃখ পায় না।

যদিও স্বীকার করা যায় যে, কার্য্য বিশেষে সুখ দুঃখ ভেদ আছে, কিন্তু যখন সমস্ত কার্য্যই ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট, তখন ঐ ভেদ অবশ্যই থাকিবে। মনে কর, হরি ব্রাহ্মণ ও রাম কৃষক। যদি হরির পুত্রকে কৃষক ও রামের পুত্রকে ব্রাহ্মণ করিয়া দিয়া সাম্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়, তাহাতে উদ্দেশ্য সফল হয় না। কেননা হরি সুখ পাইয়াছে বলিয়া তাহার পুত্রকে দুঃখ দিলে ঋণই পরিশোধ হইতে পারে না। এরূপ করিলে সাম্যরক্ষা না হইয়া বৈষম্যেরই উৎপত্তি হয়। কেননা সমান অবস্থার

নাম সাম্য নহে। যাহার যেরূপ আবশ্যক, তাহার সেইরূপ পাইলেই সাম্য রক্ষিত হয়। ধনীর লক্ষ লাভে যেরূপ আনন্দ, দরিদ্রের শত লাভেই সেই আনন্দ জন্মে। অতএব যে নিয়মে চলিলে ধনী ও দরিদ্র উভয়েরই লক্ষ বা শত লাভ হয়, তাহা সাম্যবিধায়ক নহে। যে নিয়মে চলিলে ধনী লক্ষ, দরিদ্র শত মুদ্রা পায়, তাহাই সাম্যবিধায়ক।

পাশ্চাত্য ব্যবহারশাস্ত্রে ধনী নির্ধন, ভদ্র অভদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, কাহারও কোনরূপ বিশেষ না করিয়া সমান অপরাধে যে সমান দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, তাহা বাস্তবিক সাম্যের পরিচায়ক নহে, বৈষম্যেরই পরিচায়ক। কেননা সকলের প্রতি এক প্রকার দণ্ড-বিধান করিলে সকলের সমান শাস্তি প্রদান করা হয় না। কারাদণ্ডে ধনী ও ভদ্রবংশীয়গণ যেরূপ কষ্ট অনুভব করেন, নির্ধন ও নীচকুলোদ্ভবগণ সেরূপ কষ্ট পায় না, এবং অর্থদণ্ডে দরিদ্রগণ যেরূপ কাতর হয়, ধনীগণ সেরূপ কাতর হয়েন না। নীচকুলোদ্ভবগণের কষ্ট করা অভ্যাস আছে, তাহারা অনায়াসে সেই অভ্যাসবশতঃ কারাযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে, ভদ্র সন্তান-গণের কষ্ট অভ্যাস নাই, তাহাদের কারাদণ্ডক্লেশ নিতান্ত অসহ্য বোধ হয়। ধনিগণের যথেষ্ট ধন আছে, সুতরাং তাহারা অনা-য়াসে অর্থদণ্ড প্রদান করিতে পারে; নির্ধনগণের অর্থ দিতে হইলে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। সুতরাং নির্বিশেষে একরূপ অপ-রাধে সকলকে সমান দণ্ড দিলে সকলের সমানরূপ শাসন হয় না। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্র-প্রণেতাগণ জাতি ও অবস্থাবিশেষে দণ্ডের ইতরবিশেষ করিয়া সকলকে সমানরূপ শাসিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নব্যগণ সাম্যতত্ত্বের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে না

পারিয়া তাঁহাদের এই সাম্য বিধানকে বিপরীতভাবে গ্রহণ করেন। একটী বিষয় বিবেচনা করিলে এই বিষয়ের সত্যতা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। অর্থাৎ হিন্দুশাস্ত্রপ্রণেতাগণ যেমন অবস্থা-বিশেষে নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের প্রতি উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের অপেক্ষা অধিক দণ্ডবিধান করিয়াছেন, তেমনই আবার অবস্থা বিশেষে উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের প্রতি অধিকতর দণ্ডবিধান করিয়াছেন। স্বজাতির প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা থাকায় নব্যগণ সে গুলি দেখিতে পান না। সেই জন্য মনুসংহিতা হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল।

কার্ষাপণং ভবেদ্দণ্ড্যো যত্রান্যঃ প্রাকৃতোজনঃ।
তত্র রাজা ভবেদ্দণ্ড্যঃ সহস্রমিতি ধারণা॥
অষ্টাপাদ্যন্তু শূদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিল্বিষং।
ষোড়শৈব তু বৈশ্যস্য দ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়স্য চ॥
ব্রাহ্মণস্য চতুঃষষ্টিঃ পূর্ণং বাপিশতং ভবেৎ।
দ্বিগুণা বা চতুঃষষ্টিস্তদ্দোষ গুণবিদ্ধি সঃ॥

অষ্টম অধ্যায় ৩৩৬—৩৩৮।

অর্থাৎ সাধারণতঃ যে অপরাধের যে অর্থদণ্ড বিহিত আছে, রাজা সে অপরাধ করিলে তাহার সহস্রগুণ দণ্ডিত হইবেন, এবং সাধারণতঃ যে অপরাধের যে দণ্ড বিহিত আছে, জ্ঞানি-দিগের তাহা অপেক্ষা অধিক অর্থাৎ জ্ঞানী শূদ্রের ৮ গুণ, বৈশ্যের ১৬ গুণ, ক্ষত্রিয়ের ৩২ গুণ এবং ব্রাহ্মণের ৬৪ গুণ। ব্রাহ্মণ অধিক জ্ঞানী হইলে জ্ঞানের পরিমাণানুসারে শতগুণ বা ১২৮ গুণ দণ্ডও হইবে। ইহারই নাম প্রকৃত সাম্য ও পক্ষপাতশূন্য ব্যবহার।

য়ুরোপ বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ নাই, ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই, শূদ্র নাই, সকলেরই সমান অধিকার। যিনি শক্তিপ্রকাশ করিতে পারিবেন, তিনি পদস্থ ও সুখী হইবেন। যিনি শক্তি প্রকাশ করিতে পারিবেন না, তিনি দুঃখে ভাসমান হইবেন। তুমি রাজপুত্র, কিন্তু কোনও কৃষকপুত্রের শক্তি যদি তোমা অপেক্ষা অধিক হয়, তবে তোমায় রাজ্য তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। তোমা দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে বটে, কিন্তু যখন ঐ কৃষকপুত্র তোমা অপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন, তখন কেন তুমি তাহাকে তোমার পদ ছাড়িয়া দিবে না? হে মন্ত্রণা-কুশল মহা-প্রাজ্ঞ মন্ত্রীপ্রধানের পুত্র! মানিলাম, তুমিও মন্ত্রণা কার্য্যে সামান্য পটু নহ, কিন্তু দেখিতেছি ঐ চর্ম্মকারপুত্র তোমা অপেক্ষাও অধিক ক্ষমতাবান, অধিকমন্ত্রণাকুশল, অতএব তুমি তোমার পিতৃপদ তাহাকে প্রদান করিবে না কেন? ওহে ভিক্ষুক! তুমি কেন দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া শক্তিসম্পন্ন কর্ম্মিষ্ঠ মনুষ্যগণকে বিরক্ত করিতেছ? যখন তোমার উপার্জ্জনের শক্তি নাই, তখন তুমি কিজন্য জীবিত থাকিয়া খাদ্যান্ন অক্রেয় করিতেছ? ওহে কেরাণি বাবু! তুমি গাত্রে হরিদ্রা লেপন করিতেছ কেন? বিবাহ করিবে নাকি? তুমি জাননা, তোমার আয় কি? ২০ টাকা মাত্র বেতন দ্বারা তুমি কি প্রকারে স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণ করিবে? তোমার সন্তানগণ যে 'চাকরি বা ভিক্ষা দেও' বলিয়া দেশের লোককে জ্বালাতন করিবে। যাহার শক্তি নাই তাহার আবার সুখের সাধ কেন?

এইরূপ য়ুরোপের সর্ব্বত্রই একমাত্র শক্তির উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। উহা নামে সাম্যবাদ, কিন্তু কার্য্যে উহা বিষম

শক্তিবাদ। এই জন্য তথায় পরীক্ষাপ্রণালীর এত ধুমধাম। কাহার শক্তি অধিক আছে, তাহা জানার জন্যই পরীক্ষার প্রয়োজন। যাহাদের বিদ্যাশিক্ষা করিবার সুবিধা, শরীর সচ্ছন্দ, স্বার্থ, পরিশ্রম করিবার প্রবৃত্তি ও সহায় প্রভৃতি আছে, তাহারাই পরীক্ষা দিয়া প্রধান হইতে পারে ও তাহাদেরই পদ, ধন ও মানলাভ হয়। যাহাদের ঐ সকল নাই, তাহাদিগের স্থান এ জগতে হইবে না। যে কোন প্রকারে হউক, আপন শক্তির উৎকর্ষতা লাভ করাই য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল নীতি। তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে মরিয়া যাউক, পৃথিবী রসাতলে যাউক, বিশ্বের ধ্বংস হউক তাহা দেখিতে হইবে না। আপনার উন্নতিই প্রধান লক্ষ্য। তাঁহারা মুখে বলেন, সকল মনুষ্যেরই অধিকার সমান, কিন্তু কার্য্যে দেখান, যাহাদের শক্তি ও সুবিধা আছে, তাহাদেরই অধিকার আছে; যাহাদের তাহা নাই, তাহারা কিছুরই অধিকারী নহে। তাঁহাদের সমানাধিকারপ্রদানবাক্য কেবল প্রতারণা মাত্র। ঐ মন্ত্রে সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত সুখসম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। অক্ষমেরা তাঁহাদের নিন্দা করিলে বা তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা চাহিলে, তাঁহারা এই বলিয়া তাহাদিগকে বিমুখ করেন, যে তোমাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সর্ব্ববিষয়ে সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু যখন তোমরা নিজ দোষে তাহার সুব্যবহার কর নাই, তখন তোমরা আমাদিগকে নিন্দা বা বিরক্ত করিতেছ কেন? বাস্তবিক তাহাদের নিজের সমস্ত দোষ নহে, কেননা মানবমাত্রেই অবস্থার দাস, অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে, এমন সাধ্য এ পৃথিবীতে কাহারও নাই। অবস্থা অনুসারে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অনেককেই পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ একের শক্তির অধিক উৎকর্ষ হইলে, অন্যের শক্তি খর্ব্ব হইতেই হইবে। কেননা কোনও শক্তিই নূতন সঞ্জাত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। কাহারও নিকট হইতে শক্তি অপহরণ করিয়া লইয়াই অধিক শক্তিমান হইতে হয়। অধিক ধনী হইতে হইলে, কতকগুলি লোককে নির্ধন না করিয়া কখনও তাহা সম্পন্ন হয় না। অধিক বলশালী হইতে হইলে বহু লোককে দুর্ব্বল করিতে হয়।

মাঞ্চেষ্টরের বণিক্‌গণ কি লক্ষ লক্ষ তন্তুবায়কে নির্ধন করিয়া ধনী হইতেছেন না? নীলকরেরা কি কৃষকদিগের ধন গ্রহণ করিয়া ধনী হইতেছেন না? যে রাজা বা জমিদার নিজ রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করেন, তিনি কি প্রজার ধন হরণ দ্বারা তাহা সম্পন্ন করেন না? যিনি নূতন জমিদারি ক্রয় করেন, তিনি কি পূর্ব্ব জমীদারকে নিঃস্ব না করিয়া তাহা করিতে পারেন? যিনি কোন উন্নত পদ বা চাকরি প্রাপ্ত হয়েন, তিনি কি পূর্ব্ববর্ত্তী পদারূঢ় ব্যক্তি বা অন্য কোন আশাবান ব্যক্তিকে বঞ্চিত করেন না? ইংলণ্ড যে এত ধনী হইয়াছেন, সে কি কোটি কোটি ব্যক্তি ও শত শত জাতিকে নির্ধন করিয়া নহে? এককালে গ্রীস্ ও রোম যে প্রবল বলসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাতে কি পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে নির্বীর্য্য করা হয় নাই? মুসলমানগণ যে ভারতের রাজা হইয়াছিলেন, তাহাতে কি ক্ষত্রিয়কুলকে নির্বীর্য্য করা হয় নাই? এখন বৃটন যে সিংহ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে কি ভারত মেষ আখ্যা প্রাপ্ত হয় নাই? এইরূপে দেখা যায়, যে কাহারও ক্ষতি না করিয়া কখনও আপনার উন্নতি

হইতে পারে না। সুতরাং অর্থের উন্নতি করিতে গেলেই অন্যের অনিষ্ট করিতে হইবে। তাহাতে কেবল পরস্পরের দুঃখই জন্মে।

উপার্জ্জন করিয়া কাহারও আশা মিটে না। কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রার অধিপতি হইলেও কাহারও উপার্জ্জনস্পৃহার হ্রাস হয় না, সুতরাং কেহই শান্তির সুশীতল ক্রোড়ে স্থান লাভ করিতে পারে না। উপার্জ্জনবিষয়ে সুনিয়মিত না হইলে কেহ পর্ব্বতপ্রমাণ ধনের অধিপতি হইয়া নানাপ্রকার কুকার্য্যে রত হয় ও কেহ নিতান্ত আবশ্যকীয় অন্নের অভাবে মৃতপ্রায় হয়; কেহ ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী শত শত লোকের শোণিত পান করিয়া স্থূলকায় হয় ও কত কত জাতি পরাধীনতাজনিত দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়; কেহ ভোগবিলাসে উন্মত্ত হয়, ও কেহ শীতবাতাদিতে ক্লান্ত ও পীড়িত হয়। সকল ব্যক্তিই নিয়ত দুঃখে ম্রিয়মাণ থাকে। কি ধনবান্, কি দরিদ্র সকলেই দিবানিশি উপার্জ্জনচিন্তায় মগ্ন; অন্য কোন মানবীয় বৃত্তি বিকসিত করিবার অবসর কাহারই থাকে না। ইতর, ভদ্র, বুদ্ধিমান, নির্ব্বোধ সকলেই কেবল উপার্জ্জন-জন্য ব্যস্ত। কেবল উপার্জ্জন-কৌশল—প্রতারণা-কৌশল ভাবিতে ভাবিতেই জনগণের জীবন অতিবাহিত হয়। এই সকল অসৎ উপায় চিন্তা করিতে করিতে মানব এমন অপদার্থ হইয়া পড়ে যে, সঞ্চিত ধনের ব্যয়-সাধনেও সক্ষম হয় না। সকলকে প্রতারণা করিয়া যে ধন উপার্জ্জিত হইল, এত যত্নসঞ্চিত সেই ধন কি পরের জন্য ব্যয় করা যায়? সুতরাং অতিথি সেবা দূরে থাকুক, কেহ ভিক্ষুককেও এক মুষ্টি চাউল দেন না; আত্মীয় বন্ধুর হিতসাধন করা দূরে থাকুক,

পিতা মাতারও সৎকার করেন না। কেবল আপনার ও প্রিয় পত্নীর ভোজন, পরিচ্ছদালঙ্কার ও ভোগ সুখের উপযোগী বিষয়েই অর্থ ব্যয় করেন।

জাতিভেদপ্রথার বশবর্ত্তী হইলে শিশু পিতামাতার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া স্বভাবতঃ পিত্রবলম্বিত কার্য্য করিবার উপযোগী শক্তিসম্পন্ন হয়, বাল্যকাল হইতে অনায়াসে পিতামাতার নিকট হইতে তদ্বিষয়ের শিক্ষা লাভ করিতে পারে এবং নিয়ত পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনকে সেই কার্য্য করিতে দেখিয়া অল্প আয়াসেই সেই কার্য্যে পটুতা লাভ করে, সুতরাং উপার্জ্জন-শক্তি লাভের জন্য এক্ষণকার ন্যায় রাত্রিজাগরণাদি দ্বারা শারীরিক এবং পরের উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা মানসিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিতে হয় না। কোন প্রতারণাকৌশল ভাবিয়াও মানবত্ব হারাইতে হয় না। প্রত্যুত সকলেই কর্ত্তব্যবোধে বাল্যকাল হইতে এক মনে নিপুণতা সহকারে নিষ্কামভাবে পিত্রবলম্বিত কার্য্য অবলম্বনে উপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পন্ন করে ও অবশিষ্ট সময়ে অন্যান্য মানবীয় বৃত্তির উপযোগী কার্য্য করিতে পারে। এইরূপে অল্পায়াসে অর্থ উপার্জ্জিত হওয়ায় কাহারও ধনের প্রতি তাদৃশী মমতা জন্মে না, সুতরাং অতিথি-সেবা, দরিদ্রদিগকে দান এবং পিতা মাতা ও আত্মীয়গণের পরিচর্য্যা প্রভৃতি কার্য্যে আবশ্যকমত ব্যয় করিয়া, কর্ত্তব্য-সম্পাদন ও মানবত্বরক্ষারূপ সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয়। কোন ব্যক্তিই কাহারও বৃত্তিনাশ করে না, সুতরাং উপার্জ্জন-অভাবে কেহই কষ্ট পায় না। প্রত্যুত সকল ব্যক্তিই আবশ্যক-মত উপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন এবং

দয়া, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি মানবীয় বৃত্তি সকলের ঔৎকর্ষ সাধন করিতে পারে। কি দরিদ্র, কি ধনী, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি বলবান্, কি দুর্ব্বল, সকলেই আবশ্যকমত ঈশ্বরদত্ত বৃত্তি সকলের পরিচালনা করিয়া মানবনাম সার্থক করিতে পারে—মানব নিষ্কাম কর্ম্মপরায়ণ হইয়া সুখী ও ধার্ম্মিক হয়।

জাতিভেদপ্রথার শিথিলতা হওয়াতে আজি কালি সকলেই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দাসত্ব-অনুরাগী হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মচর্চ্চা, ক্ষত্রিয় ব্যায়াম, বৈশ্য বাণিজ্য, কর্ম্মকার লৌহগঠন, স্বর্ণকার অলঙ্কার প্রস্তুত, কুম্ভকার প্রতিমা নির্ম্মাণ, তন্তুবায় বস্ত্রবয়ন ও কৃষক কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সকলেই একমনে দাসত্বের আশয়ে তদুপযোগী বিদ্যাশিক্ষায় মন দিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে ধর্ম্ম, বীরত্ব, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় সমাজরক্ষণোপযোগী কার্য্য সকল নষ্ট হইয়া বাবুগিরি ও চাকুরির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। একেত বিদেশীয় শিল্পবাণিজ্যের আধিক্যে আমাদের দেশের শিল্পবাণিজ্যের যতদূর ক্ষতি হইতে হয়, তাহা হইয়াছে, তাহার উপর এ অবস্থা অতিশয় ভয়ানক। আর কিছু দিন এরূপ ভাবে চলিলে ভারত এককালে উৎসন্ন হইবে। যদি সকলেই আপন আপন কার্য্যে রত থাকিত, তাহা হইলে ভারতীয় শিল্পাদির সঙ্গে সঙ্গে সুখ ও ধর্ম্মের উন্নতি হইত। যে ভারত কারুকার্য্যে ও ধর্ম্মভাবে জগদ্বিখ্যাত ছিল, সেই ভারত আজি সর্ব্ব বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী এবং নিতান্ত দরিদ্র ও পাপপরায়ণ। জাতিভেদের শিথিলতাই যে ইহার মূল কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অনেকে এরূপ বলিতে পারেন যে, যদিও বংশানুগত কার্য্য-

বিভাগ কল্যাণকর স্বীকার করা যায়, কিন্তু বিবাহ ও ভোজ্যান্নতাসম্বন্ধে জাতিভেদের প্রয়োজন কি? আমরা তাহার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। সবর্ণবিবাহে দম্পতীর পরস্পর যেরূপ মনোমিলন ও কার্য্য সুবিধা হইবার সম্ভব, অসবর্ণ বিবাহে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা অল্প। কেননা যত পরস্পরের অবস্থার মিলন হয়, ততই পরস্পরের মিত্রতা জন্মে এবং যত অবস্থার ভেদ হয়, ততই মনের অনৈক্য জন্মে। এক জাতীয় ব্যক্তি সমূহের মনোগত ও অবস্থাগত ভাব প্রায় একরূপই হয় অর্থাৎ তাহাদের ব্যবসা একবিধ হওয়ায় তাহাদের আশা, অভিলাষ, উদ্দেশ্য, আয়োজন, অবস্থা, ভোজনপ্রণালী ও আচারব্যবহার প্রায় একরূপই হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের মনোমিলন হইবার অধিক সম্ভাবনা। তাহারা পরস্পর বিবাহিত হইলে কার্য্য বিষয়েও পরস্পরের সাহায্য হইতে পারে; অর্থাৎ কুম্ভকার-কন্যা মৃত্তিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়া কুম্ভকারস্বামীর সহায়তা করিতে পারে ও তন্তুবায়-কন্যা সূত্রপারিপাট্য করিয়া দিয়া তন্তুবায়স্বামীর সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু কুম্ভকার-কন্যার সহিত তন্তুবায়পুত্রের ও তন্তুবায়কন্যার সহিত কুম্ভকারপুত্রের বিবাহ হইলে, তাহারা স্বামীর কার্য্যের সেরূপ সহায়তা করিতে পারে না। বিবাহ সম্বন্ধজাত কুটুম্বেরাও ভিন্নজাতি হইলে জামাতার কার্য্যসহায়তা করিতে পারে না। স্বজাতীয় যদি আত্মীয় হয়, তাহা হইলে সকলেই মিলিত হইয়া পরস্পর স্বজাতির উন্নতি চেষ্টা করিতে পারে, ধনিগণ স্বজাতীয় দরিদ্রের নানা প্রকারে হিতসাধন করিতে পারে। সবর্ণ বিবাহের আর একটী গুণ এই যে, পিতা ও মাতা যদি এক জাতীয় হয়

অর্থাৎ পিতা ও মাতা একবিধ গুণবিশিষ্ট হইলে তজ্জাত সন্তান পৈতৃক কার্য্যে অধিকতর নৈপুণ্য লাভ করিবার সম্ভব। কেননা তাহাতে পিতা ও মাতার একবিধ শক্তি সংক্রমিত হইয়া দ্বিগুণিত হয়। এই সকল কারণে সবর্ণ বিবাহ মানবের অত্যন্ত কল্যাণকর।

সবর্ণ ভোজন-বিধির উপকারিতা আছে কি না, তাহা উহার মূলানুসন্ধান করিলে বুঝা যাইবে। পূর্ব্বকালে কোনও দেশে জাতিভেদ ছিল না, পরে যখন কার্য্যভেদ হইয়া জাতিভেদের সৃষ্টি হইল, তখন কেবলমাত্র কার্য্য বংশানুক্রমিক হইবার ব্যবস্থা হইল। সে সময়ে পরস্পরের মধ্যে বিবাহ বা ভোজন নিষেধ হয় নাই। পূর্ব্বে ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতি মাত্র ছিল। ঐ চারি জাতির কেবল কার্য্য স্বতন্ত্র ছিল, কিন্তু পরস্পর সকলেই সকলের অন্নভোজন করিত ও পরস্পরে পরস্পরের কন্যা বিবাহ করিত। পরে সবর্ণ বিবাহের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া অসবর্ণ বিবাহ নিষেধ হইয়াছে। এবং আমাদের বোধ হয় অসবর্ণ অন্ন ভোজন নিষেধের মূল কারণ, সামাজিক শাসন। কেননা সমাজ-মধ্যে কেহ দুষ্কর্ম্ম করিলে পূর্ব্বকাল হইতে এদেশে তাহাকে সমাজচ্যুত করার নিয়ম আছে, অর্থাৎ কুকর্ম্মশালীকে কেহ কন্যাদান করে না ও তাহার সহিত কেহ ভোজন করে না। এখনও এদেশে ঐ কারণে অনেক দলাদলী হইয়া থাকে। এক্ষণে এদেশে যত জাতি দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই প্রায় বর্ণসঙ্কর। মূল জাতীয় ব্যক্তি-বিশেষের সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যবহারই বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপাদনের কারণ। সুতরাং যে ব্যক্তি ঐ অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল, তাহার

সহিত ভোজ্যান্নতা বন্ধ হওয়াতেই পরস্পর জাতিসকলের অন্ন ভোজন নিষেধ হইয়াছে। কুকর্ম্মদমন যখন পরস্পরের অন্ন ভোজন নিষেধের কারণ, তখন কি প্রকারে উক্ত প্রথাকে মন্দ বলা যায়? আর এক কথা,—মনুষ্যেরা উৎসবসময়ে আত্মীয় বন্ধুদিগকে ভোজন করাইয়া থাকে; বৃত্তি বংশানুগত হইলে আত্মীয়সকল সমব্যবসায়ী বা সমজাতীয় হয়, সুতরাং ভোজের ব্যাপার স্বজাতিমধ্যেই আবদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণ চিরকাল শ্রেষ্ঠ ও মূল জাতি, এ জন্য ব্রাহ্মণের অন্ন সকলেই গ্রহণ করে, কিন্তু অন্য সকলে সামাজিক রীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ অন্য কাহারও অন্ন ভোজন করেন না। এই কারণে কালে অন্নভোজন শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক হওয়াতে অসবর্ণ অন্নভোজনের এত দৃঢ়তা হইয়াছে।

এই নিয়ম থাকায় সকল মনুষ্যেরই সমাজে কিছু না কিছু শক্তি থাকে ও নিতান্ত দরিদ্রগণও বড় লোকের নিকট হইতে আদর অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হয়। কেননা অতি দরিদ্রও যদি সমাজস্থ কাহারও দোষ দেখাইয়া তাহার সহিত আহার করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে সমাজ সেই দরিদ্রের মতানুযায়ী অতি বড় ধনীকেও ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং মহা প্রতাপান্বিত ব্যক্তিকেও সজাতীয় নিতান্ত অক্ষমের সহিত মিলিয়া থাকিতে হয়; কাজেই দরিদ্রের অধিকার ধনীর সহিত সমান। যদি ভোজনব্যাপার সমাজবদ্ধ না হইত, তাহা হইলে ইংলণ্ডাদি দেশের ন্যায় ধনিগণ কেবল ধনিদিগকে এবং নির্ধনগণ কেবল নির্ধনদিগকেই ভোজনে নিমন্ত্রণ করিত। কাজেই ধনি-দিগের উপর দরিদ্রের কোন প্রকার শক্তি চালনা করিবার অধি-

কার থাকিত না। দরিদ্রগণ কোন সময়েই ধনিজনসুলভ উৎকৃষ্ট ভোজ্য ভোজনসুখও লাভ করিতে পারিত না। জাতিভেদপ্রথার কল্যাণে অতি দরিদ্র ও ইতরগণও মধ্যে মধ্যে ধনীদিগের ন্যায় উপাদেয়-ভোজ্য ভোজন, ভদ্রজনোচিত পরিচ্ছদধারণ ও দান-ধ্যানাদি জ্ঞানিজনোচিত কার্য্য করিতে পারে। কেননা সকল প্রকার ব্যবসায়ীর মধ্যেই কতকগুলি করিয়া ধনী ব্যক্তি থাকেন। জাতিভেদপ্রথা থাকিলে ধনী জ্ঞানী সকলকেই নির্বিশেষে সমস্ত সজাতীরাই নিমন্ত্রণ করিতে বাধ্য হয়েন। দরিদ্র ও মূর্খগণ মধ্যে মধ্যে ধনী ও জ্ঞানীদিগের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট ভোজনাদি প্রাপ্ত হয় ও তাহাদের সহিত আলাপ, একত্র উপবেশনভোজনাদি ও তাহাদের নিকট হইতে যথানির্দ্দিষ্ট রূপ সম্মান লাভ করিয়া তাহাদের গুণের অনুকরণ করিবার জন্য যত্নশীল হয়। সেই জন্য ভারতের সকল লোকই দানশীল, পিতৃমাতৃভক্ত, আতিথেয় ও ধর্ম্ম-পরায়ণ এবং য়ুরোপের নিম্ন-শ্রেণীর মনুষ্যগণ প্রায়ই অমানুষপ্রকৃতিসম্পন্ন হয়।

উপসংহার।

আমরা মানবতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য যে সমস্ত আলোচনা করিলাম, তদ্দ্বারা কি অবগত হইলাম? যাহা অবগত হইলাম, তাহাতে কি আমাদের তৃপ্তি জন্মিয়াছে, না তৎসমস্তকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে? কখনই না। কেননা মানবের সত্য নির্ণয় করিবার শক্তি নিতান্ত অল্প। মানবের যে সমস্ত শক্তি আছে, তদ্দ্বারা মানব আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইতে পারে না। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ হইবার শক্তি এই বিশ্ব মধ্যে কাহারও নাই। কেননা আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব একই কথা। পূর্ণ ঈশ্বর ব্যতীত বিশ্ব-মধ্যে সমস্ত পদার্থই অপূর্ণ। অপূর্ণশক্তির আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মিতে পারিলে পূর্ণ ও অপূর্ণ শক্তির প্রভেদ থাকে না। এই জন্য আর্য্যসুধীগণ কহিয়াছেন, আত্মাতে ও ব্রহ্মে অভেদ-জ্ঞান জন্মিলে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় ও ঐরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মপদবাচ্য হয়েন। কিন্তু মানব কি সেরূপ হইতে পারে? কখনই না। তাহা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে এত দিন অবশ্য মানব ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হইতে পারিত। মানব-জাতি ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য একালপর্য্যন্ত কত যত্ন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু তাহা হইতে কি ফল প্রাপ্ত হইয়াছে? আমরা দেখিতেছি, ঐ চেষ্টা দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হওয়া দূরে থাকুক, নাস্তিত্বই মানবের প্রতীতির বিষয় হইতেছে।

নাস্তিকতা ঈশ্বরানভিজ্ঞতারই নামান্তর। মানব যখন নানা চেষ্টা করিয়া ঈশ্বরের মর্ম্ম ও উদ্দেশ্যের বিষয় কিছুই বুঝিতে

পারিল না, তখন বিবেচনা করিল, ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর থাকিলে অবশ্যই তিনি মানবের জ্ঞানের বিষয় হইতেন্। কোনও পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, মানব ঈশ্বর বুঝিবে কি, তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারই কোটী কোট্যংশ পদার্থের মর্ম্ম বুঝিবার শক্তি মানবের নাই। যাঁহার কার্য্য বুঝিবার শক্তি নাই, মানব তাঁহাকে কি প্রকারে বুঝিবে? এইজন্য একালপর্য্যন্ত কেহই ঈশ্বরজ্ঞ হইতে পারেন নাই, কোনও জ্ঞানেই মানবের সম্পূর্ণ তৃপ্তি জন্মে নাই, এবং পৃথিবীর কাহারও নির্ণীত তত্ত্বে মানবের সম্যক্ বিশ্বাস জন্মে নাই। চিরকালই দেখা যাইতেছে যে, কোনও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে কেহ তাহাকে সত্য ও কেহ তাহাকে মিথ্যা বলিয়া থাকে। সকলকে একমনে কোনও তত্ত্বকেই সত্য বলিয়া সম্পূর্ণ আদর করিতে দেখা যায় না। এই জন্য পৃথিবীতে নিয়ত নূতন ধর্ম্ম ও নূতন দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হইতেছে। কোনও ধর্ম্ম বা দর্শনশাস্ত্রের প্রতি সমগ্র মানবের প্রীতি বা বিশ্বাস জন্মে নাই। এই জন্যই বলিতেছি, আমাদের মানবতত্ত্বেরও ঐ দশা হইবে। ইহাতে অনেকে বলিতে পারেন, তবে মানবতত্ত্ব আলোচনার প্রয়াস কেন? মানব যে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারে না, এবং মানবের আবিষ্কৃত তত্ত্বসকল যে সম্পূর্ণ সত্য নহে, তাহাই জানাইবার জন্য আমাদের এই মানবতত্ত্ব আলোচনার প্রয়াস—আজি কালি আমাদের দেশস্থ নব্য ও প্রাচীন সম্প্রদায়ের মানবগণের ভ্রান্ত বিশ্বাস-হেতু দেশে যে সকল ভয়ানক অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহাই দেখাইবার জন্য আমাদের এই প্রয়াস। ঈশ্বরনিরূপণ বা ঈশ্বরের নাস্তিত্ব-প্রতিপাদন উদ্দেশে মানবতত্ত্বের আবির্ভাব হয় নাই।

এক্ষণকার যুবক-সম্প্রদায়ের সাধারণ মত এই যে, তাঁহারা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাই সম্পূর্ণ সত্য ও পিত্রাদি প্রাচীনদিগের অবলম্বিত মত নিতান্ত ভ্রান্ত। এই জন্য তাঁহারা প্রাচীন রীতিনীতি, প্রাচীন আচারব্যবহার ও প্রাচীন ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া সমস্তই আপানাদের মনোমত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা একবারও বিবেচনা করেন না যে, তাঁহারা (যুবকগণ) কতদিন পৃথিবীতে আসিয়াছেন ও তাঁহাদের জনক ও গুরু প্রভৃতিরাই বা কতদিন আসিয়াছেন; যদি তাঁহারা প্রাচীনদিগের অপেক্ষা অভিজ্ঞ হইতে পারেন, তবে বালকেরাও তাঁহাদের (যুবকদিগের) অপেক্ষা জ্ঞানী হইবে; তাঁহারা যদি প্রাচীনদিগকে ভ্রান্ত বলিতে পারেন, তবে বালকেরাও তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিতে পারে। কিন্তু প্রাচীনেরা যেরূপ যুবকদিগের স্বাধীনতার বিরোধী, তাঁহারাও ত সেইরূপ বালকদিগের স্বাধীনতার বিরোধী। বালকদিগের যথেচ্ছ ব্যবহারকে যদি তাঁহারা অমঙ্গলকর মনে করেন, তবে তাঁহাদের যথেচ্ছাচারকে বৃদ্ধেরা কেন অমঙ্গলকর মনে করিবেন না? জানার নাম যখন জ্ঞান, তখন বহুজ্ঞ প্রাচীনেরা যে অল্পজ্ঞ যুবকদিগের অপেক্ষা অভিজ্ঞ হইবেন এবং বহুদর্শী প্রাচীনদিগের, কার্য্য যে অল্পদর্শী যুবকদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে প্রাচীন যদি নিতান্ত মূর্খ ও যুবা বিলক্ষণ পণ্ডিত হয়েন, ও যুবকগণ বিচারিত মনে কার্য্য চিন্তা করেন, প্রাচীনেরা তাহা না করেন, তাহা হইলে যুবাদিগের কার্য্য প্রাচীনদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে পারে।

বাস্তবিক ঐ অভিমানেই আধুনিক যুবকগণ প্রাচীনদিগের

অবলম্বিত মত ও প্রাচীনদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, কয়জন যুবা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ হইয়া কার্য্যে রত হয়েন, এবং কয়জনেরই বা তদ্রূপ শক্তি আছে? এক্ষণে নবযুবক-মাত্রেই জ্ঞানাভিমানী। দুই একখানি ইংরাজি বা বাঙ্গালা স্কুল-পাঠ্য পুস্তক পড়িয়া তাঁহারা ঈশ্বরের ও বিশ্বব্যাপারের সূক্ষ্মতম সমস্ত তত্ত্বই অবগত হয়েন। যে সকল তত্ত্ব প্রাচীন মহাপণ্ডিতগণ নিবিষ্ট চিত্তে বহুকাল চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা দুই পৃষ্ঠার জ্ঞানে ভ্রান্ত স্থির করেন। তাঁহারা জ্ঞানাতীত ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, ও অসীম ব্রহ্মাণ্ডকে স্বীয় করতলস্থ দেখেন। কিন্তু হে নব যুবকগণ! তোমরা কোন্ বলে এত বলীয়ান্ হইরাছ, তোমাদের এমত কি বিদ্যা জন্মিয়াছে, যে তাহার বলে মহা প্রজ্ঞাশালী প্রাচীন ঋষিগণকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা কর? তোমাদের ইষ্টদেবতা, শ্বেতদ্বৈপায়ন ইংরাজ ও বেদ-ইংরাজি ২।৪ খানি ভাষাশিক্ষা মাত্রের উপযোগী পুস্তক। কিন্তু তোমরা কি জাননা যে, প্রাচীন আর্য্যদিগের তুলনায় তোমাদের শিক্ষাগুরু বৃটনজাতি নিতান্ত শিশু! তোমরা কি জাননা যে, প্রাচীন আর্য্যজাতি পক্বকেশ বৃদ্ধ ও নব্য বৃটন অজাতশ্মশ্রু বালক! যখন ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় বিজ্ঞান ও ভারতীয় জ্যোতিষ, দর্শন, শিল্প, বাণিজ্য, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতিতে জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তখন্ তোমাদের বৃটন্ জাতি কালগর্ভে বিলীন ছিল। বৃটন সভ্যতার কি শিখিয়াছে যে, তোমরা সেই আজতশ্মশ্রু বালক বৃটনের কথায় প্রাচীন আর্য্যদিগের অমূল্যরত্ন পরিত্যাগ করিতে বসিয়াছ? "কাচ মূল্যেন বিক্রীতোহহন্ত চিন্তামণির্ম্ময়া"!

তোমরা কি মনে করিয়াছ, "ভারতীয় সভ্যতার নিকট পাশ্চাত্য সভ্যতা দণ্ডায়মান হইতে পারে? যদি এইরূপ ভাবিয়া থাক, তাহা হইলে তোমাদের নিতান্ত ভ্রান্তি হইয়াছে। কেননা বৃটনের এখনও সে দিনের অনেক বাকী, যে দিন বৃটন ভারতীয় সভ্যতার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে।

হে ভারত-সন্তানগণ! তোমরা কি ভুলিয়া গিয়াছ যে তোমরা কাহার সন্তান! তোমরা কি ভাব না যে, সিংহশিশু হইয়া শৃগালের নিকট বীরত্ব শিক্ষা করিতে যাইতেছ? যে আর্য্য-জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে ঈশ্বরচিন্তায় ও ঈশ্বরধ্যানে চিরজীবন অতিবাহন করিয়াছেন, যে আর্য্য জাতি, বেদ, বেদান্ত ও দর্শনাদি দ্বারা আস্তিকতা, নাস্তিকতা, দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ, সাকার ও নিরাকারবাদ, প্রভৃতি ঈশ্বরের যাবতীয় ভাবের চূড়ান্ত পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের জন্য—পরকালের জন্য—ধর্ম্মের জন্য, ঐহিক সমস্ত সুখই পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা ধর্ম্মের এমত পথই নাই, যাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে বাকী রাখিয়াছেন, তাঁহাদের সন্তান হইয়া, যাহারা চিরজীবন ঐহিক সুখ সাধনের জন্য লালায়িত ও মত্ত, তাহাদের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইতে যাও! ইহাতে কি তোমাদের সাগর পরিত্যাগ করিয়া গোষ্পদে পিপাসা নিবারণের চেষ্টা করা হইতেছে না? সত্য বটে, ইংরাজ জাতি আজি কালি সৌভাগ্যসম্পন্ন ও ভারতসন্তানগণ নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হইয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন ভারতের সহিত তুলনায় এখনও পাশ্চাত্যগণ অনেক নিকৃষ্ট রহিয়াছেন। ইংরাজগণ বহির্জ্জগতের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও অন্তর্জ্জগতের কিছুই অবগত হইতে পারেন

নাই। ভারতসন্তানগণ বহির্জ্জগৎসম্বন্ধে অনেক বিষয় য়ুরোপীয় দিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে পারেন বটে, কিন্তু অন্তর্জ্জগৎ-শিক্ষার জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র ভারত পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য ভূমিতে যাওয়া তাঁহাদের নিতান্ত মূর্খতা। এক্ষণে নবযুবকেরা স্বজাতিগৌরব কিছু মাত্র বুঝিতে না পারিয়া সর্ব্ববিষয়ে য়ুরোপীয় শিক্ষার অধীন হইয়াছেন। বিশেষআক্ষেপের বিষয় এই যে, তাঁহারা য়ুরোপীয় দিগের নিকট হইতে কেবল দোষভাগ শিক্ষা করিতেছেন, গুণ কিছুই শিক্ষা করিবার যত্ন করিতেছেন না। য়ুরোপীয়দিগের ঐহিক উন্নতির উপায়ীভূত ঐক্য, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, সাহস, বীরত্ব, পরিশ্রম, সময়জ্ঞতা প্রভৃতি গুণাবলী শিক্ষা করিবার প্রয়াস একবারও করেন না, কেবল সুরাপান, স্বেচ্ছাচারিতা,প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দোষাবলী এবং ভাক্তসাম্য, অন্যায় উদারতা প্রভৃতি, যাহা য়ুরোপীয়েরা মুখে মাত্র উদ্ঘোষণ করেন, কার্য্যে যাহার বিপরীতানুষ্ঠান করেন, তাহারই অনুষ্ঠানে নিতান্ত সযত্ন হইয়াছেন। শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি প্রকৃত হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে একবারও তাঁহারা অনুরাগ প্রকাশ করেন না, দাসত্ব-ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা লাভের জন্য যাহা আবশ্যক, কেবল তাহারই অনুষ্ঠানে যত্নবান। যত ভাল করিয়া ইংরাজি ভাষা শিক্ষা হইবে, ততই বড় চাকরি মিলিবে, যত সাহেবদিগের সহিত মিলিত হইতে পারা যাইবে, ততই সাহেবদের অনুগ্রহ লাভ হইবে ও মহাপ্রসাদস্বরূপ উত্তম দাসত্ব মিলিবে, এই আশায় তাঁহারা ইংরাজি ভাষা শিক্ষা, ইংরাজি বেশ পরিধান, ইংলণ্ডীয় ভোজ্য ভোজন ও ইংলণ্ডীয় আচারব্যবহারের অনুকরণে নিয়ত যত্নবান। বাঙ্গালা লিখিয়া পড়িয়া বা বঙ্গভাষায় কথোপকথন

করিয়া যে সময় নষ্ট হয়, তাহা যদি ইংরাজী লিখিয়া পড়িয়া ও ইংরাজীতে কথোপকথনে ব্যয় করা যায়, তাহা হইলে ইংরাজী ভাষায় অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ হইবে বিবেচনায় তাঁহারা বঙ্গভাষায় পত্র লেখা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন। অধিক কি, আজি কালি বঙ্গীয় যুবকগণ ইংরাজিতে চিন্তা করিবারও প্রয়াস করিয়া থাকেন। কিন্তু হে যুবকগণ! তোমরা কি ভাবিয়াছ যে, কেবল দাসত্ব করিলে তোমাদের উন্নতি হইবে? কেবল স্ববৃত্তি হইতেই তোমাদের সমস্ত অভাব ও সমস্ত দুঃখ দূরিত হইবে? যদি তাহাই স্থির নিশ্চয় করিয়া থাক, তবে ইহাও কি ভাব না যে, দাসত্ব পদ কতগুলি ও উহার প্রার্থী তোমাদের সংখ্যা কত?

আজি কালি দেশের এমনই দুরবস্থা হইয়াছে যে, যাঁহারা মনোমত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিয়া মহাসুখে বিচরণ করেন ও যাঁহারা উক্ত প্রসাদ হইতে বঞ্চিত, তাঁহারা এককালে অকর্ম্মণ্য হইয়া যান। ঐ প্রসাদ-বঞ্চিত যুবকগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া কেহ কুকর্ম্মশালী ও কেহ কেহ দেশহিতৈষী হয়েন। দেশহিতৈষিগণের মধ্যে কেহ নাটকাভিনয় করিয়া, কেহ নাটক বা গ্রন্থবিশেষের অর্থ পুস্তক লিখিয়া, কেহ সভা ও বক্তৃতা করিয়া দেশের হিতানুষ্ঠান করেন। বাস্তবিক গ্রন্থকর্ত্তা ও সংবাদপত্রপ্রণেতাদিগের মধ্যে অধিকাংশই ঐ শ্রেণীর লোক থাকাতেই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বা উৎকৃষ্ট সংবাদপত্র এদেশে প্রকাশিত হয় না। যে দেশে গুণবান ও শক্তিশালী ব্যক্তিগণ দাসত্বব্যবসায় অবলম্বন করেন ও অক্ষম নির্গুণেরা গ্রন্থকর্ত্তা, সম্বাদপত্র-সম্পাদক ও দেশহিতৈষী হয়েন, সে দেশের প্রকৃত মঙ্গল কি প্রকারে হইবে? যাঁহাদের উপযুক্ত

বিদ্যা নাই, চিন্তাশক্তি নাই, এবং আশাভঙ্গ হইয়া যাঁহারা ভগ্ন-হৃদয় হইয়াছেন, তাঁহাদের গবেষণা শক্তি কি প্রকারে হইবে? সুতরাং নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে না পারিয়া তাঁহারা সর্ব্ব বিষয়ে য়ুরোপীয়দিগের মুখাপেক্ষী হয়েন। এইজন্য আমাদের আত্মপরিচয়ও সাহেবদিগের নিকট শিখিতে হইতেছে। যদি য়ুরোপীয়েরা শিখাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে আমরা পিতৃ-গৌরবও কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিতাম না এবং তাহা হইলে আমরা নিতান্ত অসভ্য, এ বিশ্বাস আমাদের কিছুতেই অপনোদন হইত না। আমরা য়ুরোপীয়দিগের গবেষণাফলেই ভারতকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্যদেশ বলিয়া জানিয়াছি; তাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াই আমরা কালিদাসকে শ্রেষ্ঠ কবি, ঋগ্বেদকে সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ, সংস্কৃতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষা এবং গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন, চিকিৎসা ও শিল্পাদি বিষয়ে ভারতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিয়াছি। নিজ যত্নে বঙ্গীয় যুবকগণ কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই; তাঁহারা কেবল য়ুরোপীয়-দিগের ধুয়া গাইতে পটু।

মহাত্মা টড্ বহুতর অনুসন্ধান দ্বারা রাজস্থানের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া ক্ষত্রিয় জাতির অদ্ভুত বীরত্ব ও সতীত্বের যশ জগতে প্রচার করিলেন, বঙ্গীয় যুবকগণ ঐ রাজস্থানের ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া অজস্র নাটক লিখিতে বসিলেন। মোক্ষমুলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নানা প্রকার গবেষণা ও কল্পনার সাহায্যে ভারতীয় ব্রাহ্মণদিগের সহিত য়ুরোপীয়দিগের জ্ঞাতিত্ব প্রতি-পাদন করিলেন, বঙ্গবাসিগণ সেই ধুয়া লইয়া আর্য্যশব্দের ঢক্কা-ধ্বনিতে বঙ্গগগন বিদীর্ণ করিলেন। ইংরাজ বলিলেন, ভূত

মিথ্যা, অমনি বাঙ্গালী "ভূত নাই, ভূত নাই" বলিয়া গগন কম্পিত করিলেন। আবার যেমন ইংরাজ বিলাতি ভূতের সৃষ্টি করিলেন, অমনি তাঁহারা চতুর্দ্দিক হইতে "ভূত ভূত" করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ইংরাজ বলিলেন, যোগ-প্রণালী নিতান্ত অবিশ্বাস্য ও অশ্রদ্ধেয়, বাঙ্গালী তাহাই বিশ্বাস করিলেন; আবার যেমন অলকট্ প্রভৃতি সাহেবগণ যোগমাহাত্ম্য প্রচারে যত্নশীল হইলেন, অমনি বঙ্গবাসিগণ আস্ফালন করিয়া ভারতীয় যোগিগণের গুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ য়ুরোপীয়েরা যখন যে বিষয় প্রচার করেন, তখনই বঙ্গবাসিগণ সেই ধুয়া গাইতে থাকেন; কেহই কখনও য়ুরোপীয়দিগের কোনও বিষয়ের প্রতিবাদ বা কোন নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিবার যত্ন করেন না। সকলেই একমনে দাসত্ব লাভের জন্য লালায়িত।

বঙ্গবাসিগণ দাসত্বের জন্য যেরূপ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। উহার জন্য বঙ্গবাসী সাগর-পারে গমন করিতেছে, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছে, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয় ও বন্ধুগণের আশা ত্যাগ করিতেছে, সমাজের ও জাতীয়তার মস্তকে পদাঘাত করিতেছে, অধিক কি, সর্ব্বমূলাধার স্বীয় জীবনের প্রতিও হতাদর হইয়াছে। দাসত্বের উপযোগী বিদ্যাশিক্ষার জন্য বঙ্গীয়গণ এরূপ রাত্রি জাগরণ করেন যে, তাহাতে স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষা হইবে কি না, তাহাও একবার চিন্তা করেন না। হে বঙ্গবাসি! ইহা দেখিয়া কে বলিবে, তোমার দৃঢ়তা নাই, ও কে তোমাকে ঘরো বাঙ্গালী বলিয়া কলঙ্ক দেয়? তবে তোমার অধ্যবসায় কেবল দাসত্ব লাভের জন্য। যদি তুমি অন্য বিষয়ে

এই রূপ যত্ন কর, তাহা হইলে কি তাহাতে ফললাভ করিতে পার না? অবশ্যই পার। তাহা হইলে দাসত্ব-কার্য্যে যেরূপ ফললাভ করিতেছ, তাহা হইতেও ভালরূপ ফললাভ করিতে পার। কেননা বঙ্গবাসীকে উচ্চ পদ প্রদান করিতে রাজজাতি তত ইচ্ছুক নহেন। তুমি নিতান্ত উপযুক্ত হইলেও তাঁহারা তোমাকে উচ্চপদসকল প্রদান করেন না। কিন্তু শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে সেরূপ বাধা নাই। তুমি যত ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারিবে, ততই ঐ সকল কার্য্যে তোমার উন্নতি হইবে। বিশেষতঃ ঐ সকল কার্য্য করিবার জন্য কাহারও উপাসনার প্রয়োজন হয় না, আপন ভাষা, আপন ধর্ম্ম, আপন আচার ব্যবহার, আপন জাতীয়তা ও আপন সমাজ পরিত্যাগ করিতে হয় না এবং উহার অনুষ্ঠানে দাসত্ব-স্বভাব-সুলভ লঘু-চিত্ততার পরিবর্ত্তে তেজস্বিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও মানব-নাম-ধারণ সফল হয়। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, ঐ সকল বিষয়ে বঙ্গবাসীর কিছুমাত্র যত্ন নাই।

এক্ষণে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বঙ্গবাসীর এরূপ দাসত্ব-প্রিয়তার কারণ কি? কি জন্য সমস্ত বঙ্গবাসী ঐ এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে? কেন বঙ্গবাসীরা শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে মনোযোগী হয় না? আমরা বোধ করি, পাশ্চাত্য সভ্যতার অযথা অনুকরণই ইহার মূল কারণ। অনেক দিন হইতে বঙ্গের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, ক্রমাগত ৭।৮ শত বৎসর বিদেশীয়দিগের অধীন থাকিয়া বাঙ্গালীর তেজস্বিতা প্রভৃতি উচ্চ গুণসকল একবারে খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। যবনজাতির প্রবল অত্যাচারসময়ে যখন য়ুরোপীয়গণ এদেশে

আসিলেন, তখন তাঁহাদিগের শান্তমূর্ত্তি ও কার্য্যশক্তি দেখিয়া বঙ্গবাসিগণ তাঁহাদিগের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। য়ুরোপীয়গণও বঙ্গবাসীর প্রতি বিলক্ষণ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। সে সময়ে যাঁহারা য়ুরোপীয়দিগের অধীনে কার্য্য করিতেন, তাঁহারা বিলক্ষণ সুখী ও ধনশালীও হইতেন। তদবধি ইংরাজের দাসত্বই আয়ের প্রধান উপায় বলিয়া বঙ্গীয়গণের বিশ্বাস জন্মিল। বিশেষতঃ ঐ দাসত্বলাভের জন্য বিশেষ বিদ্যারও আবশ্যক ছিল না। ইংরাজি ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার থাকিলেই লোকে ঐ কার্য্য প্রাপ্ত হইত। এত অল্প আয়াসে এত অপরিমিত ধনোপার্জ্জন হয় দেখিয়া সকলেই ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতে ও ইংরাজদিগের অধীনে কার্য্য করিতে যত্নশীল হইলেন। য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে জাতিভেদপ্রথা নাই, সুতরাং তাঁহারা ভারতীয়গণকে জাতিনির্ব্বিশেষে তাঁহাদের অধীনে কার্য্য করিতে দিতেন। তদ্দৃষ্টে ভারতীয় সকলজাতিই তাঁহাদের দাসত্ব আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বণিক, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর, তন্তুবায় সকলেই আপন আপন পৈতৃক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দাসত্ব-প্রার্থী হইল। ক্রমে বিদ্যাশিক্ষার যে পদ্ধতি প্রচারিত হইল, তাহাও ঐ কার্য্যের সহায় হইয়া উঠিল, অর্থাৎ যিনি বিদ্যা শিখিবেন, তিনি ঐ একই নিয়মে কয়েকখানি ইংরাজি সাহিত্য, কিছু ভূগোল, কিছু ইতিহাস, ও কিছু গণিত শিক্ষা করিয়া দাসত্বের উপযোগী পরীক্ষা দিয়া দাসত্ব আরম্ভ করিতে লাগিলেন। দাসত্ব-লাভই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল অর্থাৎ দাসত্ব-প্রাপ্তি হইলেই শিক্ষার সফলতা সম্পাদিত হয়, এই সাধারণ বিশ্বাস বঙ্গবাসীর মনে দৃঢ়বদ্ধ হইল।

জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই শিল্পবাণিজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া ঐ উপায়ে দাসত্বলাভের চেষ্টায় রত হইল। যদি জাতি বা কার্য্যভেদপ্রথার এরূপ শিথিলতা না হইত, যদি বিদ্যাশিক্ষার একই প্রকার নিয়ম না হইয়া অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে এরূপে সকলেই দাসত্বপ্রত্যাশী ও দাসত্বের উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইত না। তাহা হইলে কেহ দাসত্ব, কেহ শিল্প, কেহ বাণিজ্য ও কেহ প্রকৃত জ্ঞান লাভের উপযোগী বিদ্যাশিক্ষা করিতে যত্নবান হইত এবং তাহা হইলে, বিজ্ঞান ও শিল্পবাণিজ্যাদির যথেষ্ট উন্নতি হইত। তাহা হইলে পাশ্চাত্যবিদ্যার অনুকরণে চিত্রকর চিত্রবিদ্যার উন্নতি করিত, তন্তুবায় বস্ত্রবয়নযন্ত্র নির্ম্মাণের চেষ্টা করিত, কর্ম্মকার বিলাতি অস্ত্রাদির ন্যায় অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারিত, সূত্রধরগণ পরিপাটীরূপে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিত এবং বণিকগণ বাণিজ্যের প্রকৃত উন্নতি করিতে চেষ্টা করিত। তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মবিদ্যা, জ্যোতিস্তত্ত্ব ও পদার্থ-বিজ্ঞানে সমধিক ব্যুৎপন্ন এবং মন্ত্রণা, ব্যবহার ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিতেন, বৈদ্যেরা চিকিৎসাশাস্ত্র, শারীরবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান ও প্রাণীতত্ত্বে পণ্ডিত হইতেন এবং বঙ্গের ক্ষত্রিয়-স্থানীয় কায়স্থগণ বলবীর্য্য ও রাজকার্য্যে পটুতা লাভ করিতে পারিতেন। তাহা হইলেই বঙ্গের প্রকৃত হিত সাধিত হইত, অন্নাভাবে বঙ্গবাসী এরূপ কাতর ও ইতরপ্রকৃতি হইত না।

বঙ্গীয় শিল্পাদি ব্যবসায়িগণ যদি জানিত যে, দাসত্ব তাহাদের জীবিকা নহে, যদি জানিত যে শিল্পাদির উন্নতি করিতে

পারিলে সুখী হইতে পারা যায়, এবং যদি শিল্পাদি শিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয় থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই লোকে শিক্ষা করিয়া সে সকলের উন্নতি চেষ্টা করিত, সকলে বাবু হইয়া অধঃপাতে যাইত না। এক্ষণে দাসত্বের এরূপ দুর্দশা হইয়াছে, তথাপি লোকের মন উহা হইতে বিচলিত হয় নাই। তাহারও কারণ ঐ জাতিভেদপ্রথার শিথিলতা। কেননা, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের চিরকাল নিম্ন অবস্থায় থাকা অভ্যাস আছে, সুতরাং সামান্য দশটাকা বেতনের চাকরিতে যে তাহাদের কষ্ট হইবে না, তাহাতে আর বিচিত্র কি? উহাতে তাহাদের অবস্থার উন্নতি না হউক, কোনরূপ চাকরি পাইলে, তাহারা যে ভদ্রোচিত বেশভূষা পরিধান করিতে পারিবে ও ভদ্রলোকদিগের সহিত সমান ভাবে একত্র অবস্থিতি করিয়া ভদ্র বলিয়া পরিগণিত ও বাবু নামে অভিহিত হইতে পারিবে, তাহাই তাহারা যথেষ্ট বলিয়া মানিয়া লয়। এদিকে উচ্চ জাতীয়েরা কখনও কোনও কষ্টকর কার্য্য করেন নাই, তাঁহাদিগকে নিম্নশ্রেণীর অবলম্বনীয় কোন কার্য্য করিতে হইলে সমাজে অবমানিত হইতে হয়, এবং অভ্যাস না থাকায় সে সকল কার্য্য করিবার শক্তিও তাঁহাদের নাই, সুতরাং তাঁহারাও ঐরূপ সামান্য বেতনের দাসত্ব অবলম্বনে কোনও প্রকারে বাহ্যিক মানরক্ষা ও শারীরিক কষ্টের দায় হইতে উদ্ধার হইবার চেষ্টা করেন। সহস্র অভাব ও মনোদুঃখজনিত কষ্ট সামাজিক নিন্দা ও শারীরিক কষ্টের নিকট অকিঞ্চিৎকর। মানব অন্য অনেক প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে পারে, কিন্তু শারীরিক কষ্ট ও সামাজিক পদাভাবজনিতদুঃখ কোন মতেই সহ্য করিতে পারেনা। এই জন্য উচ্চ জাতীয়েরা

প্রাণান্তেও নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না। যদিও কেহ কেহ অভিমান পরিত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া তদ্রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাতে তাঁহার উন্নতি হয় না। কেননা তাঁহাদের ঐ সকল কার্য্যে পটুতা নাই। যে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে সে বিষয়ের কোন উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন নাই, পিতৃপুরুষেরা কখনও সে কার্য্য করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের নিকট হইতেও সে বিষয়ের পটুতালাভের উপযোগী কোন শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। পটুতার অভাবে কার্য্য বিশৃঙ্খলা জন্মে ও পরিশেষে মূলধনপর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। দৈবাৎ দুই একজন ভিন্ন প্রায় কেহই অনভ্যস্ত কার্য্যের ফললাভ করিতে পারেন না। এই জন্যই "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে" প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সকল কারণে আজি কালি বঙ্গসমাজ দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়াছে। আজি কালি, কি ইতর, কি ভদ্র, কাহারও মনে কিছুমাত্র সুখ নাই। সকলেই জীবনকে দুর্বহ ভার বিবেচনা করিয়া জগৎপাতার নিন্দা করেন। দুঃখ-ভাবে বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটাতে সকলেই হিতদর্শনশক্তি-হীন হইয়াছেন। বঙ্গবাসীরা এরূপ অন্ধ হইয়াছেন যে, অন্যে প্রকৃত হিতের পথ দেখাইয়া দিলেও তাঁহারা তাহা দেখিতে পান না। সম্প্রতি রাজপুরুষগণ নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি পদ সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরা ভিন্ন অন্যে পাইবেন না বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন, বঙ্গবাসিগণ একস্বরে তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। পাছে জাতিভেদপ্রথারশিথিলতার কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূনতা হয়, এই ভয়েই আধুনিক বঙ্গবাসিগণ উহার এত প্রতিবাদ করিতেছেন। যে জাতিভেদপ্রথার শিথিলতাহেতু বঙ্গের এত

অহিত হইয়াছে, বঙ্গবাসী এখনও তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। য়ুরোপীয়দিগের নিকট সাম্য ও উন্নতি দুইটী শব্দ শিক্ষা করিয়াছেন, কেবল তাহাই বলিয়া নিয়ত চীৎকার করিতেছেন, তাহার অর্থ কি, তাহা একবারও হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করেন না। সাম্য-প্রচারকারী য়ুরোপীয়গণ সেই সাম্যের কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহাও একবার দেখেন না। তাঁহারা কি জানেন না যে, কোনও উচ্চ বংশীয় সাহেব কোনও নীচ বংশীয় সাহেবের সহিত একত্র ভোজন বা উপবেশন করেন না এবং সাহেব-মাত্রই বাঙ্গালীদিগকে এরূপ ঘৃণা করেন যে, বাঙ্গালীর সহিত এক গাড়ীতে যাইতেও সাহেবেরা ঘৃণা বোধ করেন? দুই মাসের জন্য রমেশচন্দ্র মিত্র চিফজষ্টিস্ হইয়াছিলেন, ঐ দুই মাস সাহেবদিগকে বাঙ্গালীর অধীনে কার্য্য করিতে হইবে ভাবিয়া সাহেবমণ্ডলী কিরূপ চীৎকার করিয়াছিলেন, তাহা কি তাঁহারা শুনেন নাই? সৌরাষ্ট্রে সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর জজ হইলে সকল সাহেব এক যোগ হইয়া তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া দিয়াছিল, তাহাও কি তাঁহারা অবগত নহেন? এবং সম্প্রতি দেশীয়বিচারক দ্বারা য়ুরোপীয় দিগের বিচার-কার্য্য সম্পাদিত হইবে বলিয়া যে বিধি হইবার কথা হইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে বিলাতপর্য্যন্ত সাহেবেরা কি করিতেছেন, তাহাও কি তাঁহারা কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না? এই কি সাম্যতন্ত্র-শিক্ষাগুরু য়ুরোপীয়দিগের সাম্যের পরিচয়? নির্ব্বোধ বাঙ্গালী ইহাতেও কি সাম্যবাদের সারবত্তা বুঝিতে পার না?

বঙ্গবাসিগণ ঐ সাম্যমন্ত্রে মোহিত হইয়া জাতিভেদরহিতের ন্যায় পাশ্চাত্যমতে স্ত্রীশিক্ষা ও সর্ব্বসাধারণের শিক্ষাবিধানে মহা-

যত্নশীল হইয়াছেন। তাঁহারা ভাবিয়াছেন, স্ত্রীজাতি ও সর্ব্বসাধারণ শিক্ষা পাইলেই দেশ মহোন্নতি লাভ করিবে। কিন্তু তাঁহারা কি জানেন না যে, যে অগ্নি ও জল আমাদের মহা হিতকারী, ও যে অন্ন ভোজন আমাদের জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়, অযথা প্রযুক্ত হইলে তাহাই মানবের মহা অনিষ্ট সাধন করে; শিক্ষাও ঐরূপ অযথারূপে প্রযুক্ত হইলে মহাঅনিষ্টকর হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এক্ষণে প্রকৃত শিক্ষাকে শিক্ষা বলা হয় না, দাসত্বের উপযোগী শিক্ষাই শিক্ষাপদবাচ্য হইয়াছে। এরূপ শিক্ষালাভে মানবের উপকার হইবার সম্ভব কোথায়? সকলেই কি দাসত্ব ব্যবসায় অবলম্বন করিবে? স্ত্রীজাতিও কি অন্যের দাসীত্ব স্বীকার করিবে? হে বঙ্গবাসি—একথা মনে করিতেও কি তোমাদের হৃদয় বিক্ষোভিত হয় না? শিক্ষা সকলেরই আবশ্যক বটে, কিন্তু যেমন সকল ব্যক্তি সকল কার্য্য করেনা, সেইরূপ সকলের সকল প্রকার শিক্ষার আবশ্যক নাই। যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্য করিবে, তাহার সেইরূপ শিক্ষা করা উচিত। নচেৎ শিক্ষা দ্বারা উপকার না হইয়া অপকার হয়। শিক্ষার জন্য আমাদের কার্য্য নহে, কার্য্যের জন্যই শিক্ষা। সুতরাং যাহার যেরূপ কার্য্য করিতে হইবে, তাহার তদনুরূপ শিক্ষালাভ করাই উচিত। নচেৎ যে যে কার্য্য করিবে না তাহার তদনুরূপ শিক্ষালাভ হইলে, শিক্ষানুরূপ কার্য্যের চেষ্টা করিতে হয় ও তাহাতে মহান্ অনর্থ ঘটে। এক্ষণে ঐ কারণেই শিক্ষিত মাত্রেই দাসত্বানুরাগী। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতি সমস্তই বিলোড়িত করিয়া ফেলিয়াছে। স্ত্রীজাতি ও সমস্ত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এরূপ শিক্ষার অধীন হইলে আর এদেশের জাতীয়তা,

ধর্ম্ম প্রভৃতির চিহ্নমাত্র থাকিবে না। স্ত্রীজাতি ঐরূপ শিক্ষিত হয় নাই বলিয়াই অদ্যাপি আমাদের জাতীয় চিহ্ন সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। নচেৎ এতদিনে ভারত ফিরিঙ্গীপরিপূর্ণ হইত, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা বিলুপ্ত হইত, হিন্দুধর্ম্ম পৃথিবীচ্যুত হইত এবং প্রাচীন ঋষিদিগের নাম বিস্মৃতির অগাধ সলিলে নিমগ্ন হইত। হে বঙ্গসন্তানগণ! আমেরিকা যেরূপ পশ্চিম ইণ্ডিয়া নামে খ্যাত ও য়ুরোপীয়পূর্ণ হইয়াছে, ভারতকে কি সেইরূপ পূর্ব্বইণ্ডিয়া নামে খ্যাত ও ফিরিঙ্গিপূর্ণ করিতে তোমাদিগের ইচ্ছা হইয়াছে? বাস্তবিক এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা প্রচলিত হইলে নিশ্চয়ই ঐরূপ অবস্থা ঘটিবে। এই জন্য বলি, যাবৎ ভারতে জাতীয়ত্ব, ধর্ম্ম ও সাধারণ মতের স্থিরতা না হয়, তাবৎ নারীকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। "দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল।" যে শিক্ষায় উপকার অপেক্ষা অপকারের ভাগ অধিক, সে শিক্ষা না দেওয়াই উচিত। যদি ঐরূপ দোষস্পর্শ না হইয়া রমণীগণ গার্হস্থ্যপ্রণালী ও সন্তান-পালনাদি করিবার উপযোগী বিদ্যাভ্যাস করিতে পারেন, তাহা ভাল বটে, কিন্তু সেরূপ শিক্ষা এক্ষণে হইবার উপায় আছে, এমত আমাদের বোধ হয় না। কেননা, যেরূপ পিতা ও স্বামীর, সুবিবেচনায় উক্ত রূপ শিক্ষা হইতে পারে, সেরূপ যোগ্য পিতা ও স্বামী এক্ষণে আছেন, আমাদের বোধ হয় না। আজি কালি সকলেই পাশ্চাত্যশিক্ষায় ভ্রান্ত হইয়াছেন।

ভারতসন্তানগণ আজি কালি আর একটী ভারি গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে, যে ভারতীয় হিন্দুধর্ম্ম নিতান্ত ভ্রান্ত ও য়ুরোপীয় ধর্ম্ম সত্য। ঐ

বিশ্বাসানুসারে পূর্ব্বে অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন ও এক্ষণে তদনুরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাই ভারতীয়গণের এরূপ বিশ্বাসের মূল কারণ। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের বিষয় কিছুই অবগত না হইয়া কেবলমাত্র খ্রীষ্ট উপাসকদিগের মুখে হিন্দুধর্ম্মের দোষোদ্ঘোষণ ও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রশংসা শুনিয়া মত স্থাপন করেন। তাঁহারা জানেন না যে, হিন্দুধর্ম্মের তুল্য উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর নাই। আমরা উহার সম্পূর্ণ আলোচনা এই গ্রন্থে করিতাম, কিন্তু পুস্তক-বাহুল্য ভয়ে নিরস্ত হইলাম। উহার একটীমাত্র প্রকৃতির আলোচনা করিয়াই আমরা উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছি। মৎপ্রণীত ধর্ম্ম-বিজ্ঞানে ইহার বিস্তৃত আলোচনা দেখিবেন।

পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে, তৎসমস্তেরই মত এই যে, তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে না চলিলে মনুষ্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারী হয়, তাহাদের ধর্ম্মমতই ঈশ্বরের প্রকৃত মত, অন্য ধর্ম্ম সমস্তই ভ্রান্ত। সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ীরই মতে ঈশ্বর কেবল সেই জাতিরই প্রিয়, তিনি কেবল সেই জাতিরই জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও পরিত্রাণের উপায় করিয়াছেন, অন্য কাহারও জন্য কোনও উপায় করেন নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা বলেন, খ্রীষ্ট ভিন্ন মানবের পরিত্রাণের উপায় নাই। কিন্তু যখন ঈশ্বর সকল দেশে খ্রীষ্টকে প্রেরণ করেন নাই এবং যখন পৃথিবীর আদিম কালে খ্রীষ্ট আবির্ভূত হয়েন নাই, তখন পৃথিবীর আদিম লোকদিগের ও খ্রীষ্ট-জন্মস্থানেতরদেশবাসীদিগের পরিত্রাণের উপায় কি? ঈশ্বর কি কেবল কয়েকজনমাত্র মানবকে পরিত্রাণ করিবেন? অবশিষ্ট সমস্ত লোকই তাঁহার বিরাগভাজন হইবে? তিনি কি সকলের

ঈশ্বর নহেন, কয়েকজনমাত্রের ঈশ্বর? অতএব খ্রীষ্টানদিগের এই ক্ষুদ্র মত অতি অকিঞ্চিৎকর। ব্রাহ্মধর্ম্মেরও ঐরূপ মত, অর্থাৎ ঐ ধর্ম্মানুরাগীদিগের মতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে মানবের নিস্তার নাই। মুসলমানদিগের মতে মহম্মদের শরণভিন্ন মানবের পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। এইরূপে দেখা যায় যে, পৃথিবীস্থ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ীরাই ঈশ্বরকে কেবল তাহাদেরই মনে করে। এই সকল মত কি নিতান্ত ক্ষুদ্র ও ঘৃণাকর নহে? ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা কি ঈশ্বরের মহিমার কিঞ্চিন্মাত্রও বুঝিয়াছেন? কখনই না। কিন্তু দেখ, হিন্দুধর্ম্মের মত এ বিষয়ে কত প্রশস্ত! তাঁহারা বলিয়া থাকেন, নদী সকল যেমন যে পথেই কেন গমন করুক না, পরিশেষে সমস্তই সাগরে মিলিত হয়, মানবগণও সেইরূপ যে ভাবে ও যাহাকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর উপাসনা করুক না, তৎসমস্তই ঈশ্বরে অর্পিত হয়।

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।" মহিম্নস্তব

তাঁহার নিকট দেশ, কাল, অবস্থা বা জাতিভেদ নাই। কিরাত, যবন, খস, পুলিন্দ সকলকেই ঈশ্বর উদ্ধার করেন।

কিরাতহূনান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কসা আবীর কঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেন্যেচপাপাযদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুদ্ধন্তিতস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ
শ্রীমদ্ভাগবত।

তবে কার্য্যসুবিধার জন্য আর্য্যঋষিগণ বলিয়াছেন যে, সকলেরই আপন পৈতৃক ধর্ম্মে থাকা উচিত, পরধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত নয়। ইহার মূল কারণ এই যে, যে দেশ যেরূপ উন্নত ও যে

দেশে যেরূপ কার্য্য হিতকর, সেই দেশবাসী পণ্ডিতগণ সেইরূপ কার্য্যকে কর্ত্তব্য ও ঈশ্বরাদিষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং তদনুসারে কার্য্যকরা সকলেরই উচিত। অসভ্যগণের ধারণাশক্তি অল্প, তাহাদের ঈশ্বরোপাসনাপ্রণালীও সরল, ভারতীয়গণের ধারণাশক্তি উচ্চ, তাহাদের উপাসনাপ্রণালীও গভীর। ইংলণ্ডে মাংস ভক্ষণ যেরূপ আবশ্যক, আমাদের দেশে সেরূপ নয়, বরং নিয়ত মাংস ভক্ষণ, আমাদের অপকারক; মদ্য আমাদের যত অপকারক, ইংলণ্ডীয়দের তত নহে। এইরূপ দেশের প্রকৃতি অনুসারে, যে কার্য্য ইংলণ্ডে অকর্ত্তব্য, তাহা এখানে কর্ত্তব্য এবং যাহা এখানে অকর্ত্তব্য, তাহা ইংলণ্ডে কর্ত্তব্য। সুতরাং তাহাদের কর্ত্তব্য আমরা করিলে ও আমাদের কর্ত্তব্য তাহারা করিলে অনেক সময়ে অপকার হইবার সম্ভব। এইজন্য এবং পুনঃ পুনঃ রুচিঅনুসারে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে ধর্ম্মের দৃঢ়তা থাকে না বলিয়া আর্য্যঋষিগণ বলিয়াছেন "**স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ো পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।**" বাস্তবিক আর্য্যঋষিরা বুঝিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর কোনও ব্যক্তির, কোনও দেশের, কোনও জাতির বা কোনও কালের অনুগত নহেন, সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের সকল ব্যক্তিই ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র। কি সাকারবাদী, কি নিরাকারবাদী, কি দ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী, কি আস্তিক, কি নাস্তিক সকলকেই তিনি সমান চক্ষে দর্শন করেন ও সকলকেই সমানরূপ উদ্ধার করেন। তিনি এক্ষণে যেমন জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল সভ্যদিগকে ভাল বাসেন ও উদ্ধার করেন, অতি পূর্ব্ব বন্যকালে যখন মানব ঈশ্বরের ভাবমাত্র পরিগ্রহ করিতে পারে নাই, তখনকার বন্যদিগকেও সেইরূপ ভাল বাসিতেন ও উদ্ধার করিতেন।

তাহা না হইলে তাঁহার ঈশ্বর নাম ব্যর্থ হয়। তিনি নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে তাঁহার উপাসনার নিয়ম করিয়াছেন, অথচ তাহা মনুষ্যকে জানাইয়া দিবার কোনও উপায় করেন নাই, একথা নিতান্ত অসম্ভব। আর্য্যঋষিগণ ঈশ্বরের উদার ভাব অবগত হইয়াই বলিয়াছেন, পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মই সত্য ও ঈশ্বরাভিপ্রেত; যে ধর্ম্ম আলোচনা করা যায়, তাহাতেই মুক্তি হইবে। তুমি "বিষ্ণায় নম" বল বা "বিষ্ণবে নম বল," সকলই তাঁহার কর্ণে সমান প্রবিষ্ট হইবে। বিজ্ঞবর কেশবচন্দ্র সেন আর্য্যঋষিগণের মতাবলম্বনেই নববিধান প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার নববিধান নববিধান নহে, উহা অতি প্রাচীন বিধান। ভারতের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে ওতঃপ্রোত ভাবে ঐ বিধান প্রচারিত রহিয়াছে এবং সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয় ঐ ভাবে পরিপূর্ণ। কেশব বাবু অন্য দেশে ঐ বিধানকে নূতন বলিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু ভারতে তদ্রূপ বলিলে তাঁহাকে নিতান্ত উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। অতএব হে ভারতসন্তানগণ! বুঝিয়া দেখ, হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় উদার ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর নাই। প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব কেবল আর্য্যঋষিরা বুঝিয়াছিলেন।

হিন্দুধর্ম্ম কেবল এই গুণে উৎকৃষ্ট নহে। উহা যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। হিন্দুধর্ম্মের নাম সনাতনধর্ম্ম, উহা বৌদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদীয় প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রসকলের ন্যায় কাহারও নামানুসারে অভিহিত হয় না। কেননা ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্র যেমন একই ব্যক্তির হৃদয়জাত সম্পত্তি, হিন্দুধর্ম্ম সেরূপ নহে। হিন্দুধর্ম্ম অসংখ্য ঋষি ও জ্ঞানীর মস্তিষ্ক হইতে সঞ্জাত হইয়াছে। খৃষ্ট-

ধর্ম্মাবলম্বিগণ যেরূপ খৃষ্ট ভিন্ন অন্য কাহারও বাক্য গ্রহণ করেন না, মুসলমানগণ যেরূপ মহম্মদ ভিন্ন অন্য কাহারও শিষ্যত্ব স্বীকার করেন না, হিন্দুধর্ম্ম সেরূপ নহে। উহা ব্যক্তিবিশেষের কৃত ধর্ম্ম নহে। যে কোন ঋষি যে কোন সারগর্ভ বাক্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই হিন্দুধর্ম্ম সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে নাই, এমত মত পৃথিবীর কোনও ধর্ম্মে নাই। দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, সাকার-নিরাকারবাদ, হিংসা অহিংসা, স্বার্থপরতা স্বার্থত্যাগ, জ্ঞান অজ্ঞান, গার্হস্থ্য সন্ন্যাস, কামনা নিষ্কামতা, ইহকাল পরকাল যাহা কিছু মনুষ্যের অবস্থাবিশেষে আবশ্যক ও হিতকর, তৎসমস্তেরই বিধান হিন্দুধর্ম্মমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পৃথিবীর কোনও ধর্ম্মে এরূপ উদার ও অবশ্যম্ভাবী অবস্থোচিত ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্য এই ধর্ম্ম অতি প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ হইয়া এতকাল অক্ষুণ্ণভাবে প্রচলিত রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীর অর্দ্ধেকেরও অধিক লোকের ধর্ম্মনাশ করিল, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের কিছুই করিতে পারে নাই; মুসলমানগণ সমধিক বলপ্রয়োগ ও বিবিধ অত্যাচার করিয়াও ইহার কিছুই অনিষ্ট করিতে পারেন নাই; খৃষ্ট উপাসকগণ সহস্র সহস্র প্রচারক প্রেরণ করিয়া ও নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শন করিয়াও ইহার বিনাশ সাধন করিতে পারেন নাই এবং ব্রাহ্মগণ বড় বড় সমাজ করিয়া ও পথে পথে নৃত্য ও গান করিয়া ইহার অঙ্গস্পর্শও করিতে পারেন নাই। এ পৃথিবীতে কাহারও সাধ্য নাই যে, হিন্দুধর্ম্মের কেশস্পর্শ করিতে পারে। অবোধ নব্য ভারতসন্তানগণ আপনাদের ধর্ম্মের মর্ম্ম কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া, অন্যধর্ম্মের বাহ্যিক চাকচিক্যে মোহিত হইয়া কিছুদিন ধর্ম্মান্তরের

পক্ষপাতী হয়েন বটে, কিন্তু যখন হিন্দুধর্ম্মরূপ মহাসাগরের মধ্য-গত মহার্ঘ রত্ন সকল দেখিতে পান, তখন অন্যধর্ম্মরূপ গোষ্পদে তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা থাকে না।

হিন্দুধর্ম্মের তুল্য প্রাচীন ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর নাই। উহার ভিত্তি এরূপ সুদৃঢ় ও উহার গঠনোপকরণ এরূপ সারবান যে, কিছুতেই উহা ধ্বংস হইবার নহে। আমরা সগর্ব্বে বলিতে পারি, পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের কখনও বিনাশ হইবে না। উহার সনাতন নাম নিরর্থক নহে। অতএব হে বঙ্গীয় যুবকগণ! বৃথা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া আপনাদিগকে নিতান্ত হাস্যাস্পদ ও মানবনামের অযোগ্য করিও না। তোমরা এমনই অসার হইয়াছ যে, বৃদ্ধকালে বালচাপল্য প্রদর্শন করিতে তোমাদের কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হয় না। জপ, তপ, যোগ, ধ্যান প্রভৃতি গম্ভীর উচ্চ ভাবসকল পরিত্যাগ করিয়া তোমরা বালকের ন্যায় খোলের বাদ্যের সহিত পথে পথে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছ! বৃদ্ধের কি নৃত্য সাজে? নৃত্য বালকেরই শোভা পায়। যাহাদিগের গাম্ভীর্য্য হয় নাই, যাহারা ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও সংযম শিক্ষা করে নাই, সেই অর্ব্বাচীন বালকেরাই দুঃখ হইলে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করে ও আনন্দ হইলে বাহু তুলিয়া নৃত্য করে। তোমাদের কি বালকত্ব প্রদ-র্শন করিতে লজ্জা বোধ হয় না? য়ুরোপীয়গণ এখনও প্রকৃত সভ্য হইতে পারেন নাই, এখনও তাঁহাদের প্রকৃত গাম্ভীর্য্য জন্মে নাই, এখনও তাঁহাদের বালকত্ব পরিহার হয় নাই, সেই জন্য তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে মিলিত হইয়া আনন্দে নৃত্য (Ball) করেন। ভারতীয়গণের কি এই প্রাচীন বয়সে নৃত্য শোভা পায়!

যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ নিমিলিত নেত্রে পরাৎপর ব্রহ্মের ভাব হৃদয়স্থ করিয়া বিমলানন্দে হৃদয় নাচাইতেন, তাঁহারা হৃদয়-নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া তামসিক নৃত্যে মত্ত হয়েন, ইহা কি সামান্য হাস্যাস্পদ! যাঁহারা পৌত্তলিকতাঅপবাদে হিন্দুধর্ম্মের দোষাদ্‌ঘোষ করেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম বা ঈশ্বরারাধনার মর্ম্ম কিছুমাত্র অবগত হয়েন নাই। কেননা হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিক ধর্ম্ম নহে, যদি বাস্তবিক অপৌত্তলিক ধর্ম্ম পৃথিবীতে থাকে, তবে সে হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মই পৌত্তলিক। কি খৃষ্টান, কি মুসলমান সমস্ত ধর্ম্মই পৌত্তলিক। আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মও সম্পূর্ণরূপ পৌত্তলিকতাময়।

মানবীয় ভাব ঈশ্বরে আরোপিত করার নাম পৌত্তলিকতা। কিন্তু মানবীয় ধর্ম্ম ঈশ্বরে আরোপিত না হইলে, ঈশ্বরের উপাসনা করা যায় না, তাঁহার নিয়মানুসারে চলিবার আবশ্যক বোধ হয় না, পাপপুণ্যের প্রভেদ জ্ঞান হয় না, অধিক কি, ঈশ্বরের ভাবও হৃদয়ে ধারণা করিতে পারা যায় না; সেই জন্যই ব্রহ্মবিৎ ঋষিগণ পৌত্তলিকতার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা ব্রহ্মের অবিকৃত ভাব অবগত হইয়া যখন বুঝিলেন যে, সে ভাব অল্প লোকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তখন তাঁহারা সাধকগণের হিতের জন্য ঈশ্বরের মানবীয় ভাব কল্পনা করিলেন। জমদগ্নি বলিয়াছেন,—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ॥
রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিককল্পনা ॥

বাস্তবিক পৌত্তলিকতা প্রচার না হইলে এত ধর্ম্মভাব প্রচারিত হইত না। ভারত যে ধর্ম্মভাবে এত ব্যাপ্ত, পৌত্তলিকতাই

তাহার প্রধান কারণ। ভারতীয়গণের হৃদয় ঈশ্বরভাবে এমত পরিপূর্ণ হইয়াছে, যে তাঁহারা সমস্ত কার্য্যই ঈশ্বরের নামে করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে কোন কার্য্য করেন, তাহার পূর্ব্বে ঈশ্বর স্মরণ করিয়া থাকেন। ভোজন, শয়ন, গমন, চিন্তন প্রভৃতি যে সকল কার্য্য নিয়ত আবশ্যক, তাহাও ঈশ্বর স্মরণ না করিয়া সম্পন্ন করেন না। সামান্য পত্র লিখিবার সময়েও তাঁহারা অগ্রে ঈশ্বরের নাম লিখিয়া থাকেন। অধিক কি, তাঁহারা যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহার ফল পর্য্যন্তও ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া থাকেন। পৌত্তলিকতার আর এক চমৎকার গুণ এই যে, পৌত্তলিক উপাসকগণ যেরূপ ঈশ্বরারাধনার বিমলানন্দ প্রাপ্ত হয়েন, নিরাকার উপাসকগণ তাহার শতাংশও প্রাপ্ত হয়েন না। হিন্দুগণ ঈশ্বরকে সম্মুখে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া যখন ভক্তিগদ্‌গদ্‌-চিত্তে প্রণাম করেন, যখন ঈশ্বরের ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া অমৃত-সেবন-তুল্য তৃপ্তি লাভ করেন, যখন সম্মুখস্থ দেবতার নিকট আপনার সমস্ত দুঃখ বিজ্ঞাপন করিয়া অভয় প্রার্থনা করেন, তখন হিন্দু সাধকের মনে কি আনন্দ, আশা ও অভয় জন্মে, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। হে বঙ্গ-যুবকগণ! একবার বাল্যকালের কথা স্মরণ করিয়া দেখ, যদি অল্প বয়সেই, অবিশ্বাস আসিয়া তোমাদের সেই সুখ নষ্ট না করিয়া থাকে, তবে স্মরণ করিয়া দেখ যে, সম্মুখস্থ দেবপ্রতিমা তোমাদিগকে কিরূপ অভয় প্রদান করিতেন। সে সুখের তুল্য সুখ কি পৃথিবীতে আর আছে? কখনই না। সেইজন্য বলি, বঙ্গীয় যুবকগণ! পৌত্তলিকতা ঘৃণা করিও না। যে দিন পৌত্তলিকতা পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবে, সেই দিন হইতে মানবের মন

হইতে ঈশ্বরভাব এককালে দূরীভূত হইবে। অতএব যদি ঈশ্বরোপাসনায় সুখ ও উপকার আছে, বিবেচনা থাকে, যদি ধর্ম্মভাবের পবিত্রতা ও আবশ্যকতা থাকে, তবে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিও না।

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রসকল পাঠ ও হিন্দু রীতিনীতি সকলের মর্ম্ম অবগত হইবার চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র য়ুরোপীয়দের উপদেশ শ্রবণ ও য়ুরোপীয়দিগের গ্রন্থ পড়িয়া মীমাংসা করিবার চেষ্টা করাতেই তোমাদের হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু রীতিনীতির প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। যদি তোমরা আংশিক দর্শনে ভ্রান্ত না হইয়া সমীচীন-দর্শন-চেষ্টা করিতে, তাহা হইলে কখনই তোমাদের এরূপ ভাব হইত না। আংশিক দর্শনে যে কত ভ্রম জন্মিতে পারে, তাহা তোমাদের নিজের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে বুঝিতে পারিবে। দেখ, কিছুদিন পূর্ব্বে তোমরা ফলিত জ্যোতিষ্ শাস্ত্রকে উন্মত্ত প্রলাপ মনে করিতে, প্রেততত্ত্ববিশ্বাসীদিগকে নিতান্ত ভ্রান্ত মনে করিতে ও যোগসাধনপ্রণালীকে সম্পূর্ণ কুসংস্কারাত্মক বিবেচনা করিতে। কিন্তু এক্ষণে তৎসমস্তকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে তোমাদের মন ধাবিত হইয়াছে। এমন কি, তোমাদের মধ্যে অনেকে সে সকলের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যাহা কিছু তোমাদের জ্ঞানাতীত ছিল, তাহাকেই তোমরা অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব বলিয়া হাঁসিয়া উড়াইয়া দিতে, কিন্তু এক্ষণে তোমাদের সে সাহসের অল্পতা হইয়াছে। কেন হইয়াছে, তাহা কি তোমরা বুঝিতে পার নাই? সমীচীন-দর্শন না করিয়া সিদ্ধান্ত করাই উহার কারণ। যখন লৌহবর্ত্ম আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন কে বিশ্বাস করিত যে

কোনও প্রাণীর সাহায্যব্যতিরেকে কেবল জল ও অগ্নির বলে সহস্র সহস্র আরোহী ও সহস্র সহস্র মণ দ্রব্য লইয়া ঘোটক অপেক্ষা চতুর্গুণ বেগে রথ চালিতে হইবে? যখন তাড়িতের আবিষ্কার হয় নাই, তখন কে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, সামান্য জড়পদার্থ লৌহতারসংযোগে সহস্রাধিক ক্রোশের সংবাদ মুহূর্ত্ত-মধ্যে লইয়া যাইবে? যখন আলোক-চিত্র-যন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই, তখন কে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, কেবল যন্ত্রবলে অবিকল চিত্র সকল অঙ্কিত হইতে পারে? কিন্তু যখন মানব ঐ সকল প্রত্যক্ষ দেখিল, তখন তাহাকে পদার্থের অসীম শক্তি স্বীকার করিতে হইল, অর্থাৎ পদার্থসংযোগে যে অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, এ বিশ্বাস মানব-মনে দৃঢ়বদ্ধ হইল। তদনুসারে তাহারা স্থির করিল যে, যে পদার্থের যে শক্তি, সেই পদার্থ যত অধিক প্রযুক্ত হইবে, ততই তাহার ক্রিয়াধিক্য হইবে ও যত অল্প প্রযুক্ত হইবে ততই ক্রিয়ার অল্পতা হইবে। এই জন্য পাঁচ রতি কুই-নাইনে জ্বর না ছাড়িলে দশরতি কুইনাইন দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু হোমিওপ্যাথি মতের আবির্ভাব হইয়া, ঐ মতের বিপরীত সপ্রমাণ হইল। হোমিওপ্যাথগণ দেখাইয়া দিলেন, যে, ঔষধের মাত্রা অল্প হইলে গুণাধিক্য হয়। হে পদার্থবিদ্! তুমি প্রথমে কি উহা বিশ্বাস্য ও সম্ভব মনে করিয়াছিলে? কখনই না। কিন্তু এক্ষণে কার্য্য দেখিয়া তোমাকে তাহা বিশ্বাস করিতে হইতেছে। সুতরাং পদার্থতত্ত্ব বুঝিয়াছ বলিয়া তোমার যে অভিমান হইয়াছিল, তাহা দূর হইল। তুমি জড়পদার্থভিন্ন আর কিছু মান না, কিন্তু তুমি হোসেনখাঁর বাজি দেখিলে, ডেবন-পোট ব্রাদারের আশ্চর্য্য ক্রীড়াসকল দর্শন করিলে, আমেরিকার

প্রেততত্ত্ববাদীদিগের অদ্ভুত কার্য্যসকল দেখিলে বা শুনিলে অলকট সাহেবের যোগবল নিরীক্ষণ করিলে, গণকবিশেষের ভবিষ্যৎ গণনার ফল পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তোমাকে বুঝিতে হইল, জড়াতিরিক্ত অন্য কিছু আছে। তাহা সত্য কি মিথ্যা বুঝিবার শক্তি তোমার নাই। তুমি যাহা দেখ ও যাহা শুন, তাহাই বিশ্বাস কর, সুতরাং তোমাকে হতবুদ্ধির ন্যায় বলিতে হইল, এই বিশ্বের রহস্য ভেদ করা অত্যন্ত কঠিন। তোমার এত কালের প্রোষিত মত মুহূর্ত্তমধ্যে বিনষ্ট হইল। কিন্তু এরূপ পুনঃ পুনঃ মত পরিবর্ত্তন করা কি নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা ও বাল-চাপল্য নহে? সেই জন্য বলিতেছি, যুবকগণ! সমীচীন-দর্শন না করিয়া প্রচলিত মতের বিরুদ্ধাচারী হইও না। একাল-পর্য্যন্ত মহাপণ্ডিতগণ নিয়ত চিন্তা করিয়া যে সকল কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছেন তাহা এত ভ্রান্ত নহে যে, চক্ষু নিক্ষেপ-মাত্রেই তুমি তাহার ভ্রান্তি দেখিতে পাও।

যদি ভারতবাসীর স্বজাতিগৌরব ও আত্মপ্রত্যয় থাকিত, তাহা হইলে কখনই তাঁহাদের এরূপ মতিচ্ছন্ন ঘটিত না। আত্মপ্রত্যয়শূন্য হইয়া তাঁহারা এরূপ অসার ও অপদার্থ হইয়াছেন যে, স্বজাতীয় অতি উৎকৃষ্ট প্রথাকেও অপকৃষ্ট ও য়ুরোপীয়-দিগের অতি অপকৃষ্ট প্রথাকেও উৎকৃষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করেন। প্রস্রাব ত্যাগ করিবার সময় জল গ্রহণ করিলে দুর্গন্ধ দূর হয় ও স্বাস্থ্য ভাল থাকে, পাশ্চাত্য যুক্তি-অনুসরণ করিলেও এ কথা সত্য বোধ হয়, তথাপি উহা জাতীয় প্রথা বলিয়া যুবকগণ তদবলম্বনে কুণ্ঠিত হয়েন। অধিক কি, আর্য্যদিগের জাতিসাধারণ দানশীলতা, আতিথেয়তা, উপচিকীর্ষা, নিষ্কামতা, পিতৃমাতৃ-

ক্ত ও দাম্পত্যপ্রেম প্রভৃতি অসাধারণ গুণ সকল তাঁহাদের কট অপকৃষ্ট ও য়ুরোপীয়দিগের স্বার্থপরতামূলক স্বজন-ভুপালনবিরতি প্রভৃতিকে অতি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করেন।

ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয় যে, যে জাতি পরকাল, ও ঈশ্বরের জন্য আপনাদের প্রাণপর্য্যন্ত প্রদান করে, জাতি সকল প্রাণীকে আপনার ন্যায় দেখে, যে জাতি খের অন্ন দিয়া অতিথিসেবা করে, যে জাতি প্রত্যেক ৎসব-কার্য্যে দরিদ্রদিগকে অর্থ ও ভোজন প্রদান করে এবং প্রত্যহ অগণিত ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান করে, যে জাতির একজন ঙ্গতিসম্পন্ন হইলে অতি দূরস্থ আত্মীয়বর্গও তদাশ্রয়ে প্রতি-পালিত হয়, এবং যে জাতি পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুর জন্য না করিতে পারে, এমত কার্য্যই নাই, অধিক কি, যে জাতি যুদ্ধ-কালেও অস্ত্রহীন শত্রুর প্রতি অস্ত্র ত্যাগ করে না, সেই জাতি— যে জাতির অর্থই এক মাত্র ভদ্রতা ও উন্নতির পরিচায়ক, যে জাতি ঐহিক উন্নতিকেই প্রকৃত উন্নতি বলে, অর্থ ভিন্ন যে জাতির ব্যবহারজীবিগণ পরামর্শমাত্র ও চিকিৎসকগণ ব্যবস্থা-মাত্র প্রদান করেন না, যে জাতীয় মানবগণ কার্য্যক্ষতি হইবে বলিয়া অভ্যাগতের সহিত আলাপ করেন না, সেই জাতীয় লোকের নিকট হইতে নীতি শিক্ষার চেষ্টা করে। এ সকল কি আত্মতত্ত্ব ও জাতীয় গৌরব-অনভিজ্ঞতার কারণ নহে? যদি ভারতীয়গণ বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহারা য়ুরোপীয়দিগের নির্দ্দেশমত অসভ্য কি অর্দ্ধ সভ্য নহেন, যদি তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহাদের ধর্ম্ম ও রীতিনীতি য়ুরোপীয়দিগের অপেক্ষা উৎ-কৃষ্ট, তাহা হইলে কি তাঁহারা এরূপ য়ুরোপীয়দিগের অনুকরণ-

প্রিয় হইতেন ? না তাহা হইলে আজি ভারতের এরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হইত ? কখনই না। বাস্তবিক আভিজাত্য, আত্মগৌরব ও আত্মপ্রত্যয় না থাকিলে মানবের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। আত্মপ্রত্যয় না থাকিলে মানবের উন্নতির কার্য্যে প্রবৃত্তিই হয় না। আমি সক্ষম, আমার পিতৃপুরুষেরা বিপুল কীর্ত্তিকর কার্য্য করিয়াছেন, আমি যখন তাঁহাদের সন্তান তখন অবশ্যই সঙ্কল্পিত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিব, এই বিশ্বাস থাকিলে মানব যেরূপ উদ্যমশীল হইতে পারে, আমি নিতান্ত অক্ষম, আমা দ্বারা এরূপ কার্য্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, এরূপ বিশ্বাস থাকিলে কি সেরূপ হইতে পারে ? কখনই না। আত্ম প্রত্যয় ও আত্মগৌরববলে মহারাণা প্রতাপসিংহ রাজ্যচ্যুত, বনবাসী ও নিতান্ত নিঃস্ব হইয়াও প্রবলপরাক্রান্ত আকবর বাদসাহের সহিত নিয়ত যুদ্ধ করিয়া আপনার সমস্ত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন এবং আত্মপ্রত্যয় ও আত্মগৌরব না থাকাতে বঙ্গাধিপতি লাক্ষণ্যসেন নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় বিনাযুদ্ধে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। অতএব হে বঙ্গযুবকগণ! আত্মতত্ত্ব ও স্বজাতিগৌরব অবগত হইয়া আত্মগৌরব ও জাতীয় উন্নতিলাভের যত্ন কর। নচেৎ শ্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়া সাহেবদিগের অনুকরণ করিলে কিছুই হইবে না। যত দিন আত্মতত্ত্ব ও জাতীয় গৌরব অবগত হইয়া কার্য্যানুষ্ঠাননিরত না হইবে, ততদিন সহস্র সহস্র সভা স্থাপন কর, লক্ষ লক্ষ পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশ কর, অবিশ্রান্ত গৃহে গৃহে পথে পথে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কর, কিছুতেই তোমাদের অভীপ্সিত উন্নতি হস্তগত হইবে না।